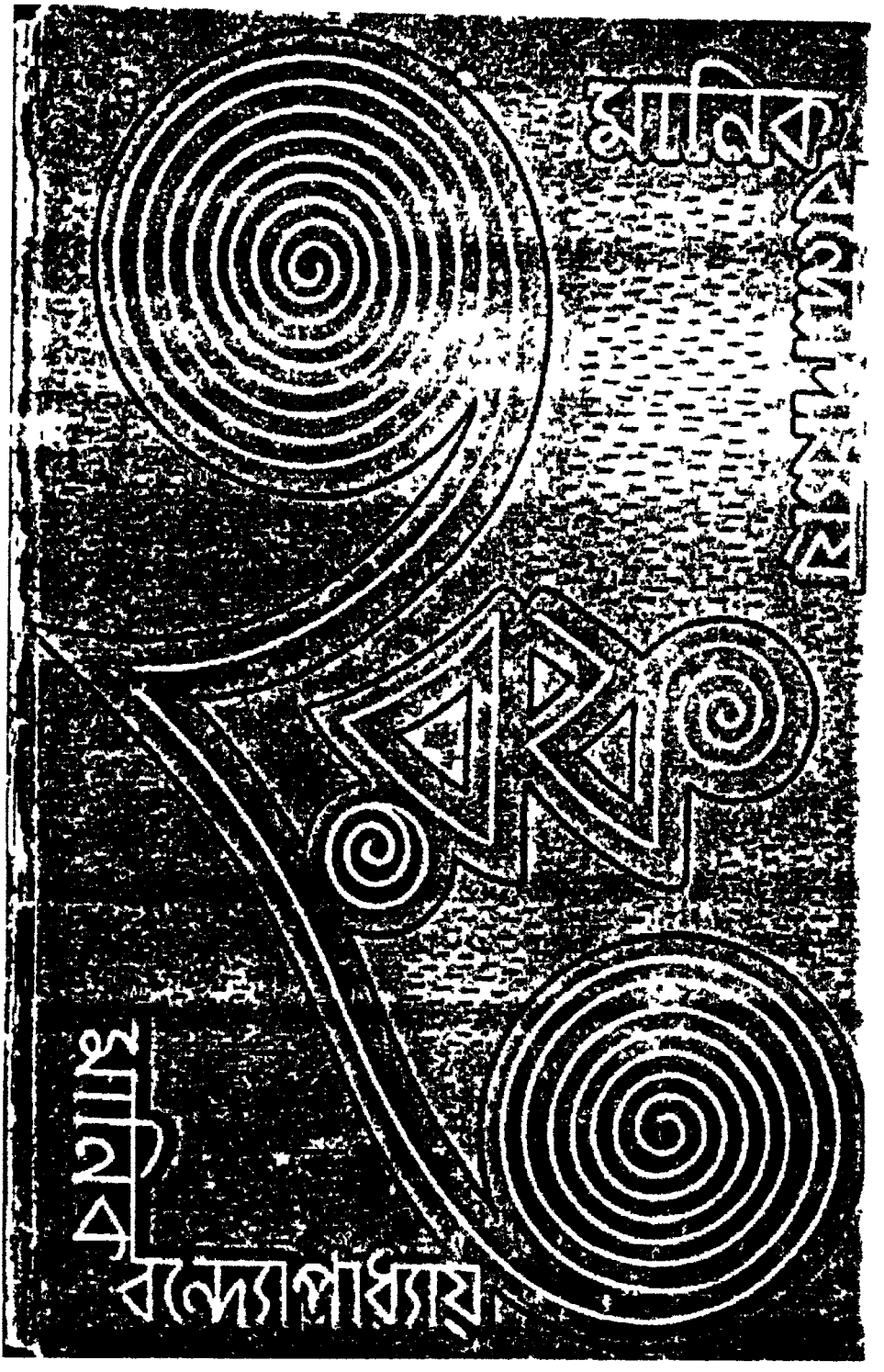

হুবহু প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

১

কলম আর চলতে চায় না।

অচল হয়ে আসা কলমটাকে জোর করে চালাতেও, মনপ্রাণ সতেজে বিদ্রোহ করে ওঠে।

কলম রেখে নিজের পেটটাকে দুবার থাপড়ে দিয়ে পেটটাকে উদ্দেশ্য করেই মানব বলে, কেন বাবা গোল বাধাচ্ছ ? নিজের ক্ষতি নিজে করছ ? আর ঘণ্টা দু-তিন চুপচাপ থাকলে লেখাটাও শেষ হত, আজ রাতে তোমায় খুশি করার ব্যবস্থাও হত !

নিজের পেটের উপরেই যেন একটু অনুকম্পার হাসি হেসে, মুখ বাঁকিয়ে মানব একটা বিড়ি ধরায়। মস্ত একটা হাই তুলে ধোঁয়া ছাড়ে।

সকালে রবির দোকানে বসে খেয়েছিল দুখানা টোস্ট আর দু-কাপ চা। আরও কিছু খাওয়া যেত অনায়াসেই। রবি তাকে ধার দেয় না, আগের পাওনাটা শোধ হয়নি। কিন্তু ক-দিন নগদ পয়সায় চা টোস্ট খেয়েছে—আজও রবি ধার দিয়েছিল, খেয়ে উঠে দামটা নগদ মিটিয়ে দেবে ভেবে।

আবার বাকি রাখছে শুনে রবি অপমানের সুরে যেভাবে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল, আর কিছু বেশি খেলেও সেইভাবেই বলত : আগে না জানিয়ে, ধারে খাবেন না মানুবাবু !

তবু সে আরও কিছু খাওয়ার লোভটা সম্বরণ করেছে—সারাদিন আর কিছু জুটবে কি না, জানা না থাকলেও করেছে।

একবারে বেশি বোঝাই নিয়ে লাভ নেই। খিদে যথাসময়ে তার পাবেই। বেশি খেলে লাভের মধ্যে, শুধু লেখার ধারটা তার একটু ভোঁতা হয়ে যাবে—হয়তো কলম বন্ধই রাখতে হবে কিছুক্ষণ।

দুপুরে খেয়েছে পুরো চার পয়সার মুড়ি-মুড়কি। অলিকে পর্যন্ত একটু ভাগ না দিয়ে রসিয়ে রসিয়ে, চিবিয়ে চিবিয়ে, একলা খেয়েছে। তেল আছে প্রায় আধশিশি—আজ দুদিন চারবেলা, সে রান্না করেনি।

আলস্য করে নয়। চাল ডাল তরকারি কয়লা কাঠ, কিছুই ঘরে নেই, ও সব কিনে-কেটে রাঁধতে গেলে, একবেলাতেই হাতের পয়সা ক-টা ফুরিয়ে যেত বলেও বটে—রান্না করার সময়টা লেখাটার পিছনে ঢালতে পারবে বলেও বটে।

অলি টের পেয়ে ঘরে এসে দামি ছেঁড়া তোশকের বিছানাটা ঝেড়ে দিয়েছিল, ময়লা কুটকুট্টি চাদরটা তুলে নিয়ে বলেছিল, সাবান দাও না, কেচে আনি ? বড্ড ময়লা হয়েছে।

অলি জানত, তার সাবানও নেই, সাবান কেনার পয়সাও নেই—তবু বলেছিল।

একমুঠো কিন্তু তাকে সে ভাগ দেয়নি। সে জানত কম করে হলেও খেসারির ডাল আর পুঁই চচ্চড়ি দিয়ে অলি ঘণ্টাখানেক আগে ভাত খেয়েছে।

দিঘল জোরালো দেহের পেটের ক্ষুধার দেবতা, পুরো চার পয়সার মুড়ি-মুড়কি ভোগ পেয়ে খুশি হয়নি। বেলা পড়ে আসতে আসতে সতেজে গুড়গুড় করে ডেকে উঠেছে।

তবু কাজ এগিয়ে চলছিল। উপোসি পেটের তেজি খিদেয় আরও সাফ হয়ে গিয়েছিল মাথা, আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল কল্পনা।

এতক্ষণে খিদে খতম করেছে কলম চালানো।

পেটে হাত বুলিয়ে যেন আদর করেই মানব বলে, আমার কলম তুমি একেবারে থামাতে পারবে না বাছাধন। এত চেষ্টায় মাথায় ঝিমঝিম শুরু করিয়েছ, আস্তে আস্তে তুমিই আবার ঝিমিয়ে

যাবে। আবার আমি কলম চালাব জোরসে ! দু-ঘণ্টা লেখা থামিয়ে নিজের পুজোয়, নিজেই তুমি বাবা বাদ সাধলে।

অনেক বন্ধু আছে মানবের। ঠিক বন্ধু বলতে মানুষ যা বোঝে এবং সমাজ-সংসারে, যে মানে মানা হয়।

নিয়মনীতি সেই সনাতন।

যার কাছে মানুষের আবরু দরকার হয় না।

না দেহের, না মনের।

বউ নেই।

বউ সে পাবে কোথায় ? এই খোলার ঘরের বস্তিতেই দেহী হিসাবে বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে পাঁচ-ছটা। মানব ঘটক পাঠালেও তারা তার কাছে মেয়ে দিতে রাজি হবে না !

ওরা জেনে গিয়েছে। না জেনে ওদের চলে না। ওরা জানে সে ইচ্ছা করলেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে ফিরে যেতে পাবে তার মামার বাড়িতে, দিদির প্রাসাদে কিংবা তার গন্ডা দুই কাকা-জ্যাঠা-মামা-মেসোর, দোতলা একতলা পোড়া ইটের পাকাবাড়িতে।

লাঞ্ছনা দেবে, গঞ্জনা দেবে, ভদ্রভাবে অপমান করবে, বাড়ির স্কুলে-পড়া ছোটো ছেলেটা পর্যন্ত—কিন্তু খেতে দেবে মাছ-দুধ-ভাত।

বাড়িতে যে আছে সে আপন হোক অতিথি হোক—নিজেরা যা খাবে তাকেও তার সমান ভাগ দেবে, এ নীতি আজও অচল হয়নি।

ওরা জানে না যে তাকে বাড়িতে রাখতে তার আত্মীয়স্বজনের কত ভয়। তাকে ভয় নয়, তার জন্য ভয়।

কে জানে কখন পুলিশ আসে !

উমাকান্তই বোধ হয় সব চেয়ে বেশি মেলামেশা করে তার সঙ্গে, খালেকের চেয়ে বেশি।

বন্ধু সে নিশ্চয় নয়, কারণ বয়সে অনেক বড়ো, গুরুর মতো বেশ খানিকটা শ্রদ্ধা আছে—মাঝে মাঝে মনে হয় যে, ভক্তিও বুঝি আছে। সমানে সমানে ছাড়া খাঁটি বন্ধুত্ব হয় না, এ তো জানা কথাই। উমাকান্ত অনুযোগ দিয়ে বলে, তুমি একগুঁয়ে পাগল। অধিকার নিয়ে বড়ো বড়ো কথা বলবে, কাজে পিছু হটবে। তোমার অধিকার নেই আপনজনের ঘাড় ভেঙে খাবার ? খেতে দিক, নয় রোজগারের ব্যবস্থা করে দিক ! তা তুমি যাবে না। তোমার মতো হাবা দেখিনি আমি আর।

সেই সকালটি চিরদিন স্মরণীয় থাকবে।

ভোরে কাকা এল।

অপরাধীর মতো।

নইলে এত কষ্ট করে এত ভোরে কেন আসবে ?

বস্তি অবশ্য তার অনেক আগেই জেগে গেছে।

কলের ভোঁ শুনতে হবে তো, আট ঘণ্টার জন্য, ওভারটাইমের জন্য ঘর ছাড়ার আয়োজন করতে হবে তো, খাটতে যেতে হবেই তো !

কাকা এসে প্রথম কথাই বলছিল, বস্তির নামমাত্র উঠানে, সামনাসামনি দাঁড়িয়ে : বড়ো হবার চেষ্টা করছ, করো। বিপ্লব করছ করো। আমার কিছুই বলার নেই। জ্যৈষ্ঠ মাসের সাতাশ তারিখে আশালতার বিয়ে দিচ্ছি। তোমার ইচ্ছে হলে যেয়ো, ইচ্ছে না হলে যেয়ো না। কোনো হাঙ্গামায় জড়িয়ে বুড়ো কাকাকে ঝঞ্ঝাটে ফেলো না।

মানব শুধু শুনেছিল। কথা কয়নি।

সাময়িকভাবে তার কলম থেমে গেছে।

কম্পোজিটর কালাচাঁদের মেয়ে আত্তি তাকে দেখাতে আসে, বাপের কলম চালাবার নমুনা।

কলম নয়, পেনসিল।

প্রুফ তোলা একখণ্ড কাগজে লেখা, কয়েক লাইন ছড়া।

ভোরবেলা নাকি ঝগড়া বেধেছিল, আত্তির মা আর কালাচাঁদের মধ্যে—ভোর মানে এক রকম শেষ রাত্রে।

খানিকক্ষণ গুম খেয়ে থেকে, প্রদীপ জ্বেলে নিজের মনে চুপচাপ কাগজে আঁচড় কেটে গেছে কাজে যাবার বেলা পর্যন্ত।

আত্তি হেসে বলে, বাবাকে একটু লিখতে শেখাও না মানুবাবু? বাবার এমন লেখার শখ।

কাটাকুটির অন্ত নেই, তবে মোটামুটি পড়া যায়। কালাচাঁদের হাতের লেখা, গোটা গোটা

কান্তবাবুর গল্প কম্পোজ করিতে করিতে একটি স্থান, কৃষ্ণের বড়ো ভালো লাগিল। গয়নার জন্য বউ আবদার ধরিয়া ঝগড়া করিতেছিল, প্রসন্ন তাহাকে বলিল যে তুমি অসতী, সতীত্বের পরীক্ষায় তুমি ফেল করিয়াছ। শ্রীরামের সঙ্গে বনবাসে গিয়া, সীতাদেবী কি কোনোদিন শাড়ি গয়না চাহিয়া স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছিল।

প্রহ্লাদকে ডাকিয়া কৃষ্ণ বলিল কান্তবাবু এবার গল্পে খুব দামি কথা লিখিয়াছেন খুব খাঁটি কথা। কিন্তু কথাটা খোলসা করেন নাই।

জায়গাটা কৃষ্ণ পড়িয়া শোনাইল। তারপর বলিল, সকলেই জানে সীতাদেবীর সতীত্বের পরীক্ষা হইল অগ্নিপরীক্ষা। তাহা সত্য নয়। বসন ভূষণ সব ত্যাগ করিয়া, স্বামীর সহিত তিনি বনে গিয়াছিলেন কোনোদিন কিছু চাহি [illegible] শান্তি করেন নাই। ইহাই আসল পরীক্ষা। কান্তবাবু ইহা খোলসা করেন নাই লোকে বুঝিবে না।

প্রহ্লাদ হাসিয়া বলিল কান্তবাবু ইহা বলিতে চাহেন নাই, ইহা তোমার মনগড়া কথা। বউদিদি কাপড় গয়না চাহিয়া ঝগড়া করিয়াছে বুঝি?

মানব জিজ্ঞাসা করে কালাচাঁদ কদ্দুর পড়েছে জানো?

হ্যাঁ, জানি বইকী। বাবা কতবার গল্প শুনিয়েছে। ইশকুল থেকে বেরোবার পরীক্ষাটা, না? সেটাতে ফেল মেরেছিল। বাবা বলে, ফেল মারব না? তোর ঠাকুদ্দাদা রোগে ভুগল আট মাস, সব ঝঞ্ঝাট আমি পোয়াইনি? খেতে না পাওয়ার অবস্থা— বলতে বলতে বাবার মুখ-চোখ কী রকম হয়ে যায়, যদি দেখতে মানুবাবু।

বুঝেছি। তারপর?

ঠাকুদ্দা কাকে ধরে বাবাকে পরীক্ষা দেওয়ালে। বাবা ফেল মেরে গেল। ঠাকুদ্দা বাবাকে ছাপাখানার কাজ শিখতে ঢুকিয়ে দিলে।

আত্তি সগর্বে বলে, ঠাকুদ্দা ছাপাখানার হেড ছিল, জানো?

ছাপাখানার হেড বলতে ঠিক কী বুঝায় আত্তির ধারণা নেই। কিন্তু মানব জানে ছাপাখানায় যারা হরফ চালে আর সাজায়, তাদেরই হেড ছিল কালাচাঁদের বাবা।

তোর বাবা যদি সুযোগ সুবিধা পেত আত্তি—

রোগা কিন্তু এত বড়ো ঢ্যাঙা মেয়ে কালাচাঁদ যে যার তার কাছে পার না করে ঘরে রেখেছে, এটাও একটা জ্যান্ত প্রমাণ বইকী যে, সুযোগ-সুবিধা পেলে কালাচাঁদ অনেক কিছু করতে পারত।

কালাচাঁদেরও লেখার শখ?

অনেকের হঠাৎ ঝোঁক চাপে—লেখক হব। কিন্তু খেয়াল থাকে না লেখক হতে হলে শিখতে হয়, লিখতে হয়।

লিখতে শিখতে হয়।

লিখতে শেখাটাই ভয়ংকর কষ্টকর ব্যাপার। গোড়ার দিকে আরও বেশি।

মনের গাছে, লেখক হবার ঝোঁকের ফুলটাই ঝরে যায় অনেকের।

অনেকের ঝরে যায় অঙ্কুরে।

অনেকের কচিফল বোঁটা শুকিয়ে খসে পড়ে।

কয়েকজন ফল ফলায়। ফল ফলিয়েও, ফল পাকানোর ধৈর্য আর কষ্ট তাদের সকলের সয় না। সাহিত্যে সফলতা অর্জনের দাম নিতে এদিক-ওদিক ছিটকে যায়।

দাম তার পায়।

টাকার দাম।

তাই দিয়ে তারা, আত্মীয়বন্ধু পাড়ার লোকের কাছে, বিশেষ ব্যক্তি হয়ে থাকে—বিশেষ ব্যক্তিরা তাদের সাহিত্যিক প্রতিভার নিষ্ফল পরিণতি পয়সা দিয়ে কিনে নেয়। বেশ মোটা টাকা দেয় সস্তা সিনেমায় লাগাতে পারলে।

এ সব তো গোড়ায় খেয়াল ছিল না তারও। কেন তবে ঝোঁকটা তার কেটে যায় না, সাধটা ভোঁতা হয়ে যায় না ? কেন সে সহজ পথ বেছে নিতে পারে না লেখক হবার ?

লেখা সম্পর্কে কারও সঙ্গে কোনো রকম আপস করার কথা ভাবলে কেন তার গা ঘিনঘিন করে, মনে হয় তার চেয়ে মরাও ভালো ?

অনায়াসে যেতে পারে ভূপতির আপিসে কিংবা বাড়িতে। দু-চার পয়সার মুড়ি-চিড়ে খেয়ে দিন কাটাবার অবস্থা যাতে না হয়, বা দু-চারআনা ট্রাম-বাসের পয়সার অভাব না ঘটে, সে কায়দা না শিখেই সে এই বয়সে লেখক হিসেবে নাম করতে পেরেছে।

একবার গিয়েছিল ভূপতির আপিসে।

কীভাবে সে তার লেখকত্ব গুণটা কিনতে চায় তারই নিয়মকানুন জানার জন্য।

সবকিছু না জানলে না বুঝলে, কি লেখক হওয়া যায় ?

বিষ কী না জেনে, শুধু অমৃত পান করে কেউ লেখক হয় ? বিষ বর্জন করে শুধু অমৃত নিয়ে মেতে থেকে, জগতে আজ পর্যন্ত কোনো লেখক জগৎকে ফাঁকি দিতে পারেনি।

সব জানতে হবে লেখককে। বস্তির ড্রেন থেকে রাজপ্রাসাদের ড্রইংরুম পর্যন্ত।

মাঝখানেরও সমস্ত কিছু।

ভূপতি বলেছিল, খেতে পাচ্ছ না ? তোমায় তো আগেই বলেছি আমি ! কাব্যি-রোগ সারিয়ে আমার আপিসে ঢুকে পড়ো। ভালো পোস্ট—দেড়শো টাকা মাইনে।

একুশ বছর বয়েস।

গল্প তার পৌঁছে দিতে হয় না সব মাসিকপত্রে—দুটো সেরা মাসিকপত্র থেকে তার গল্প চাওয়া হয়—গল্প দিলেই দাম !

বইও বেরিয়েছে দুটো। প্রকাশক নিজের খরচে ছাপাবে, তাই খুশি না হয়েও একজনকে নগদ একশো, আর আরেকজনকে দেড়শো টাকায় বই দুটো বিক্রি করেছে !

গল্পের জন্য নগদ নয়—কিন্তু দাম তো ! গল্প বেরোবার পর নগদ দাম—দশ টাকা থেকে পনেরো টাকা।

কী উদারতা সাহিত্যিক কর্ণধারদের মোটা টাকা দিয়ে, মাসিকপত্রের কর্ণধার করা খ্যাতনামা পুরুষদের ! মহাপুরুষ—তাই ভুলে যায় তাদেরও একদিন অল্পবয়স ছিল, বাপ-দাদা খাতিরের লোক

হলেও সাত রাত্রি জেগে লেখা গল্পটার জন্য দশটা টাকা পেয়েছিল—প্রিয়তমাকে এক দিনের বেশি সিনেমায় নিতে পারিনি, সাত দিনের দিবারাত্রি খেটে রোজগার করা দশটা টাকায় !

ভেবে-চিন্তে মানব তার ঘনিষ্ঠতম সম্পাদক, মহেশের বাড়ি যায়।

মানব বলে, ও বেলা আপিসে গেলে সব টাকাটা আগাম হবে ?

নিশ্বাস ফেলাটা মানব শুনতে পায়।

সেদিন কি আছে রে ভাই ?

স্নেহ আর জ্বালা-মেশানো অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সেদিন যে আর নেই, মানবই যেন সে জন্য দায়ি। সেদিন মানে বছর পাঁচেক আগের কথা—মানব যখন গল্প লেখা শুরু করে।

নতুন প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট ধরিয়ে মহেশ উদারভাবে বলে, যাকগে। আমার দুঃখের কথা শুনে তোমার পেট ভরবে না। বাড়িতে এলে, চা দিলাম না, খাবার দিলাম না—কী করি বলো ভাই ? একজোড়া শাড়ির জন্য খেপে আছে, এককাপ চায়ের কথা বলতে গেলেই আরও খেপে গিয়ে কামড়ে দেবে।

একটু থেমে বলে, সিগ্রেটটা ধরাও।

ধরাব !

মহেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলে। ভিতর থেকে নিশ্চয় শোনা যায়।

দু-কাপ ধোঁয়াটে পানীয় আসে বিনা হুকুমে !

চা দিয়ে চন্দ্রা উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে, আমি এঁর নতুন গল্পটা পড়েছি বাবা। ওঁর গল্পটা যে ভালো তুমি ঠিক ধরেছ। তুমি ছাড়া আর কেউ সাহস করে ছাপাতো ? ছাই ছাপাতো !

চা খায়।

এ কথা ও কথা বলে, পকেট থেকে তিনটে টাকা বার করে মহেশ বলে, পকেট থেকেই দিলাম ভাই, কবি কী ! তোমারও তো অচল অবস্থা। বিল পাশ হলেই আমরা মাইনে পাব, তুমিও তোমার বাকি টাকাটা পাবে।

ঘরে শুয়ে বসে সাদা কাগজের বুকে কলমের আঁচড়ে অক্ষর সাজিয়ে যাওয়া, আর প্রেসে সারাদিন শুধু বসে থেকে ছক-কাটা ঘরগুলি থেকে অক্ষর আর সাংকেতিক চিহ্ন বেছে বেছে সাজিয়ে যাওয়া।

সোজা, বাঁকা, টানা—নানারকম হাতের লেখার পাণ্ডুলিপির দিকে চোখ রেখে।

এতগুলি অক্ষর !

স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, দাঁড়ি, কমা, কোলন, সেমিকোলন ইত্যাদি।

ভাবতে হয় না, খুঁজতে হয় না—যন্ত্রের মতো হাত গিয়ে টপটপ তুলে এনে, সাজিয়ে যায় সিসার অক্ষর।

গোড়ায় কালাচাঁদ পাণ্ডুলিপির প্রতিটি বাক্যের মানে খানিকটা বুঝবার চেষ্টা করত—

কাজ এগোত না একদম।

তবে ভুল অনেক কম হত।

আজকাল চোখ-কান বুজে যন্ত্রের মতো অক্ষর সাজিয়ে সে যা গাঁথে—ফার্স্ট প্রুফের রূপ নিয়ে সস্তা কাগজে ছাপা হয়ে, সেটা ফিরে আসে অসংখ্য সংশোধনে কণ্টকিত হয়ে।

তাকেই আবার মিলিয়ে মিলিয়ে সংশোধন করে আবার নতুন করে অক্ষর সাজাতে হয়।

আগে হাতে লেখা কপি পড়ে মানে বুঝে অক্ষর সাজাবার সময়, এখনকার চেয়ে ফার্স্ট প্রুফে তিন-চারভাগেরও কম ভুল থাকত—বেশি কপি সাবাড় করতে না পারলেও, তার কম্পোজ করা ম্যাটারে দুবারের বেশি প্রুফ তোলার দরকার হত না।

কিন্তু তাড়াতাড়ি কপি শেষ না করলে তো চলবে না, দৈনিক যত বেশি গেলি প্রুফ তুলে দিতে পারবে কপি খতম করে, তত বেশি সে বিবেচিত হবে কাজের লোক বলে।

চোখ-কান বুজে তাই আজ তাকে অক্ষর সাজাতে হয় দ্রুতগতিতে।

পাণ্ডুলিপির শব্দগুলি শুধু দেখবার চেষ্টা করে।

বুঝতে না পারলে, যেমন মনে হয় তেমনি সাজিয়ে যায়।

উমাকান্তের লেখা প্যাঁচালো প্যাঁচালো—এমন সরল মানুষটার এমন প্যাঁচালো হাতের লেখা !

শিক্ষিত সাহিত্য-রসিক কম্পোজিটার বলে তাকেই দেওয়া হয় উমাকান্তের বইয়ের কপি।

মলাটে রাজপুত বীরের ছবি-আঁকা, লাইনটানা ছেলেমেয়েদের স্কুলে ব্যবহার্য দুআনা দামের বিশ-পঁচিশটা খাতায় কালির আঁচড়ে ভর্তি করা কপি।

উমাকান্তের নিজেরই সংশোধিত ফার্স্ট প্রুফ ফিরে এলে আজও এমন হাসি পায় কালাচাঁদের !

উমাকান্ত লিখেছিল 'মহা মহিমামণ্ডিত মানুষ'—অক্ষর সাজিয়ে সে ফার্স্ট প্রুফে ওটাকে দাঁড় করিয়েছিল 'মদ মেয়েমানুষ বর্জিত কানাই' !

এ রকম আরও যে কত হাস্যকর ভুল সে করে !

উমাকান্ত প্রেসে আসে।

কী রকম প্রুফ দিচ্ছেন ? আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিচ্ছেন নাকি ?

ধনদাস সবিনয়েই জবাব দেয়, যতটা পারছি দিচ্ছি। একটু যদি স্পষ্ট করে লেখেন, একটু যদি কম তাড়াতাড়ি কম জড়িয়ে লেখেন—

সে অমায়িকভাবে হাসে।

আমিই আপনার লেখা পড়তে পারি না—মুখ্যু কম্পোজিটারদের সাধ্য কী বলুন ?

উমাকান্তের রাগত মুখ দেখেও হেসে আবার বলে, একটা কাজ করেন না কেন ? একটা লেখা ছাপিয়ে দেবার জন্য কত ছোকরা কত বুড়ো তো আপনাকে জ্বালিয়ে মারছে। ওদের কাউকে দিয়ে লেখাটার একটা ফেয়ার কপি যদি করিয়ে দেন —

উমাকান্ত নিশ্বাস ফেলে।

উমাকান্ত সস্তা একটা সিগারেট ধরায়।

এক পয়সা দাম।

উমাকান্ত গোটা তিনেক হাই তোলে। বলে, ফেয়ার কপি করতে দিলে ফেরত পাব বইটা ? নিজের শালাকে চারশো পাতার একটা উপন্যাসের ফেয়ার কপি করতে দিয়েছিলাম—বলেছিলাম, অন্তত তোমার দুটো গল্প, দুটো ভালো কাগজে ছাপিয়ে দেব। আজ চার বছর পাত্তা পাচ্ছি না, হারামজাদা শালাটার।

ধনদাস আমোদ বোধ করে বলে, কলেজি ছাত্র—রোজগার করে না। শ্বশুরবাড়ি গিয়েও পাত্তা পান না শালাটার ?

পাই না।

সে কী কথা ? রাত নটা-দশটায় একবার গেলেই হয় !

গিয়েছি না ? কড়া নাড়লাম—দু-চারবার কে কে বলার পর দুয়ার খুলে শালি খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল—জামাইবাবু এসেছেন, জামাইবাবু !

তারপর ?

বৈঠকখানায় শালাটা পড়ছিল, চোখের সামনে গিয়ে তুরুক করে দোতলায় উঠে গেল। সোজাসুজি তো চোর বলতে পারি না, নিজের বউয়ের মায়ের পেটের ভাইকে—দোকান থেকে আনা দামি খাবার মুখে দিতে দিতে শুধোলাম, নন্দকে দেখছি না !

কোথায় গেছে, আসবে এখুনি।

দোতলায় পালিয়ে গেল, দেখলাম যেন ?

কই না তো !

সহধর্মিণী এগিয়ে এলেন। বললেন, দুদিনের জন্য বাপের বাড়ি এসেছি, ফিরে গিয়ে তোমার হাঁড়ি ঠেলব—বাপের বাড়ি এসেও যদি আমার ভাইকে নিয়ে গোলমাল করো—ভাইয়ের কাছ থেকেই পটাসিয়াম সাইনাইড চেয়ে খেয়ে সব জ্বালা জুড়িয়ে দেব বলে রাখছি !

হরদম এ রকম কথাবার্তা শুনেও কালাচাঁদের লেখার সাধ জাগে।

মাঝে মাঝে সাধ ঝিমিয়ে যায় মিলিয়ে যায়।

ছোটোবড়ো কত লেখকের কত টুকরো টুকরো লেখা পড়ছে আজ কত কাল ধরে—কেটে কেটে পড়ছে। হরফে, চিহ্নে, ভাগ করে করে পড়ছে। তবু মাঝে মাঝে চোখে পড়ে গেছে দু-চারটে ভাবী মজার লাইন, অদ্ভুত আশ্চর্য লাইন, খাপছাড়া উদ্ভট লাইন ! কম্পোজ বন্ধ করে তখন পড়বার সময় নয়—কাজের শেষে ঘরে নিয়ে গেছে হাতের লেখা কাগজ ক-টা, আগাগোড়া পড়েছে।

জেগেছে কৌতূহল।

বই ছাপা হবার পর, বাঁধাই হয়ে বাজারে বেরোবার আগে—ছাপা ফর্মাগুলি এক সেট কালাচাঁদ ঘরে নিয়ে গেছে, শ্রান্তি ক্লান্তির আক্রমণ ঠেলে তার ডিবরির আকারের ছোটো টেবল ল্যাম্পটার আলোয় রাত জেগে পড়ে শেষ করেছে—না কাটা, না সাজানো, ফর্মাগুলি।

কাটার উপায় নেই, বই না হোক—প্যামফ্লেটের আকারে এক একটা ফর্মা যে পড়বে সে উপায় নেই।

যেমন ছিল তেমনি অবস্থায় ফর্মাগুলি ফেরত দিতে হবে।

ভাজ খুলে ঢাউস কাগজটার উলটো-পালটা করে সাজানো নম্বর দেওয়া পৃষ্ঠাগুলি, তাই উলটিয়ে পালটিয়ে পড়তে হয়।

উলটো-পালটা কিন্তু এলোমেলো নয়। নিখুঁত হিসাব করেই কাগজটার দু-পৃষ্ঠায় এমনভাবে সাজানো যে ভাঁজ করলে বইয়ের ষোলোখানা পাতা, পরপর সাজানো হয়ে যাবে।

ডিবরির মতো ছোটো ল্যাম্পটাতেও আলো জ্বলে না সব দিন, তেল থাকে না।

মানবের ঘরে সসংকোচে গিয়ে দাঁড়ায়।

পেটে খাওয়ার পয়সায় টান পড়লেও মানব উজ্জ্বল আলো জ্বালে।

কম আলোতে মানবের দৃষ্টি নাকি ঝাপসা হয়ে যায়।

চশমা দরকার, কেনার পয়সা নেই। আলোটাই তাই সে উজ্জ্বল করে, কয়েক আনার কেরোসিন কিনে।

এসে বসে পড়ছি—আপনার লেখার অসুবিধা হবে না তো মানুবাবু ?

তুমি চুপচাপ পড়বে—লেখার অসুবিধা হবে কেন ?

মানব হাসে।

বলে, আমার কি শখের লেখা, লোকের প্রাণে সুড়সুড়ি দেবার লেখা ? আমি হাটেবাজারে বসে লিখতে পারি। তুমি একটা লোক চুপচাপ বসে পড়বে, তাতেই আমার লেখার ব্যাঘাত হবে !

২

কবে প্রথম জেগেছিল লেখার সাধ ! আত্তির মা-কে বিয়ে করার আগে না পরে ! কিছুই মনে নেই কালাচাঁদের।

সাধটা অনেক দিনের এইটুকুই তার খেয়াল আছে।

সাধটা মনে মনে কয়েক বছর পুষে রাখবার পর, বোধ হয় তার প্রথম চেষ্টা শুরু হয়েছিল লিখবার।

নতুন কেনা দোয়াত-কলম দিয়ে উমাকান্তের মতো একটা নতুন কেনা পাতলা খাতার, লাইন-টানা পাতায়। সে লেখা আজও সযত্নে তোলা আছে।

নিজে লেখার কথা ভাবা স্বপ্ন, তার কাজ শুধু হরফ সাজানো, উমাকান্তের লেখা কপি কম্পোজ করার সময় যন্ত্রের মতো করে যায়।

তাছাড়া উপায় নেই।

হাতে লেখা কপির মানে বুঝে অক্ষর সাজাতে গেলেই হয়ে যাবে কম্পোজিটারের দফারফা।

কাজের সময় চিন্তাশক্তিকে কুণ্ডলীপাকানো যান্ত্রিক ঘুম থেকে একটু জাগালেই, হয়ে যাবে ঘণ্টা হিসাবে খেটে মোট হিসাবের গেলি তুলে দিতে না পারা।

মোট গেলির মোট পরিমাণ সিসার অক্ষরাদি, তাকে সাজিয়ে গেঁথে দিতেই হবে মোট সময়ের মধ্যে—

নইলে জরিমানা, মজুরি আটকানো, বরখাস্ত।

উমাকান্তের কপি ঘরে নিয়ে গিয়ে হরফ কষা বাদ দিয়ে, বিশ্রী বাঁকা হস্তাক্ষরের লেখা কপিগুলো ঘরে নিয়ে গিয়ে, যে প্রাণপণ চেষ্টায় শব্দ ধরে ধরে, কথা ধরে ধরে, এগিয়ে খানিকটা বুঝবে মোট কথাটা কী আছে, কীভাবে লিখেছে, তারও উপায় নেই।

প্রুফের সঙ্গে গেঁথে ফিরিয়ে দিতে হয় হাতে লেখা কপি। সে কপি আর ফেরত আসে না।

হাতে লেখা কপি সযত্নে স্টিল ট্রাংকের দুর্গে তুলে রাখবে—ভবিষ্যতের হিসাব কষে।

কে জানে হয়তো একখানি তার হস্তলিখিত ম্যানাস্ক্রিপ্টের দাম হাজার টাকা, দশ হাজার টাকা—

কত রকমের লেখক আর কবির যে আবির্ভাব ঘটে ছাপাখানায় !

শখের কবি, শখের বই ছাপতে আসে। মহেশ উপদেশ দিয়ে কালাচাঁদকে প্রস্তুত করে রাখে। কারণ, কবি নিজে কম্পোজিটারকে বুঝিয়ে দিতে ভালোবাসে, কীভাবে তার বইটি ছাপা হবে। শুধু প্রুফ দেখে বুঝিয়ে তার স্বস্তি নেই। আলাপ করে বুঝিয়ে দিতে হবে। তালিম দিয়ে মহেশ বলে, যা বলেন মন দিয়ে শুনবে, কাজ বন্ধ রেখে।

কালাচাঁদ আগে তৈরি করা খৈনিটুকু কাগজ থেকেই মুখে ঢেলে জিব দিয়ে নীচের ঠোঁটের ফাঁকে ঠেলে দেয়।

হরফ বেছে, সিসার হরফ সাজানোর হাতে খৈনি তুলে মুখে দিতে সাহস হয় না—কে জানে একটু সিসা ভিতরে গেলে কীভাবে ফেটে বেরোবে ফোঁড়ায় ফোঁড়ায়, নয়তো চর্মরোগে !

কালাচাঁদ আরেকবার তাকায় মহেশের দিকে।

মহেশ আরেকবার শ্রান্তমুখে মাথা হেলিয়ে তাকে জানায়—কাজ বন্ধ করে আলাপ করবে মানুষটার সঙ্গে, বুঝলে ? নইলে বাবু চটবেন !

এ হুকুম নতুন নয়। প্রেসে যারা কাজ জোগায়, পয়সা দেবার কারণস্বরূপ হয়, মনের খুঁতখুঁতানি থেকে তারা এসে কাজের ক্ষতি করিয়ে কম্পোজিটারকে খুঁটিনাটি নিয়ে অনাবশ্যক ও অকেজো উপদেশ দিতে চাইলে উপায় কী !

ঢালাও হুকুম দেওয়াই আছে যে এ ক্ষেত্রে ভদ্রভাবে নম্রভাবে সবিনয়ে কথা বলাটাই কম্পোজিটারের কাজ।

ছাপার ব্যাপারে যত অজ্ঞ হোক, যত হাস্যকর উপদেশ ঝাড়ুক, পাকা কম্পোজিটারের বিদ্যা ফলানো চলবে না। এমনভাবে তাকে প্রকারান্তরে কাজটা করার কথা বলতে হবে যেন অভিমানে ঘা না লাগে।

ভাগ্যে এ রকম লেখক কবির সংখ্যা বেশি নয় !

ভাগ্যে তারা অধিকাংশই ছাপার ব্যাপারে মহেশের সঙ্গে কথা বলেই সন্তুষ্ট থাকে !

নইলে কালাচাঁদের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। কারণ, খুঁতখুঁতে ওই সব বাবু লেখক কবিদের সঙ্গে কারবার চালাতে হয় তাকেই।

কিন্তু চালু হুকুম আজ আবার এমন বিশেষভাবে জোর দিয়ে জারি করা হল কেন ?

বেশ একটু কৌতূহলের সঙ্গেই কালাচাঁদ কবির প্রতীক্ষা করে।

জহর এলে সে সত্যই আশ্চর্য হয়ে যায়। চেহারা পোশাক চালচলনে জহর একেবারেই তাদের মতো নয়, এত কাল নানা বয়সের নানা ধরনের যে সব কবির এই প্রেসে পদার্পণ ঘটেছে।

নিখুঁত চেহারা, নিখুঁত বেশ, সৌম্য শান্ত ভাব।

পুরু ঘন নীলাভ প্যাডের কাগজে কবিতাগুলি লেখা হয়েছে যেন হরফের আলপনা কেটে, ছবির মতো হরফ সাজানো ছবি এঁকে।

কী করে টের পায় কে জানে, ধনদাস তার কাঠের ঘুঘলি থেকে বেরিয়ে আসে।

হাসিমুখে বলে, এলেন তবে সত্যি !

জহর বলে, হ্যাঁ, এলাম। ছোটো প্রেসেই ছাপাব বইটা।

ছোটো প্রেস বলছেন ? বছরে প্রায় হাজার দুই ফর্মা মেকআপ হয়।

প্রথম বইটা যে প্রেসে ছাপিয়েছিলাম সেখানে একটা ফর্মাই পঞ্চাশ হাজার থেকে দু-তিন লাখ ছাপে।

ধনদাস জহরকে অপদস্থ করে না। বুঝিয়ে দেবার চেষ্টাও করে না যে ফর্মা কত রকমের হয় এবং বাংলা গল্প কবিতার ফর্মা পঞ্চাশ হাজার ছাপার কল্পনা পাগলেও করে না !

সে হেসে বলে, চাইলে আপনার বইটা পঞ্চাশ হাজার ছাপতে কি অরাজি আছি ! আপনি নিজেই বললেন দেড় ফর্মার বই, দেড় হাজার ছাপবেন। পঞ্চাশ হাজার ছাপুন না, দেখুন, কী রকম সস্তা হয়ে গেছে ছাপা খরচ !

লেখক গ্রাহকদের বসার জন্য মহেশের টেবিল-ঘেরা চেয়ারগুলির মধ্যে সব চেয়ে ভাঙা, সব চেয়ে জোড়াতালি দেওয়া চেয়ারটাতে ধনদাস বসেছিল। বসেই টের পেয়েছিল চেয়ারের অবস্থাটা।

কত সতর্ক হয়ে কত সাবধানে নিজের প্রেসের ছাপার কাজের এবং নিজের কাগজের সম্পাদকীয় দপ্তরের চেয়ারটাতে সে যে বসেছে সকলেই সেটা টের পায়।

এ রকম চেয়ার যে তার ছাপাখানায় থাকে সে জন্য সে কাউকে দোষী করতে পারবে না, কারণ নতুন চেয়ারের কথা তাকে বারবার বলা হয়েছে। কাল হয়তো ব্যবস্থা হবে।

জোড়াতালি ব্যবস্থা। তার বেশি কিছু নয়।

জহরের মুখের ভাব দেখে ধনদাস হালকা হাসি হাসে। বলে, এ সব হল ব্যাবসার কথা, প্রচারের কথা। আপনি হলেন কবি মানুষ, এ সব নিয়ে আপনার মাথা ঘামিয়ে কী দরকার মশায় ? কবিতা লিখবেন, অর্ডার দেবেন, যেমন বলবেন তেমনি ছাপিয়ে দেব। আমাদের কাজটাই তো তাই, আপনাদের প্রচার সহজ করা।

বলেই সে ডাকে, কালাচাঁদ !

কালাচাঁদ হরফ সাজানো ফেলে ধীরে ধীরে উঠে এসে নীরবে দাঁড়ায়, মুখে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব ফুটিয়ে রাখে।

ধনদাস বলে, কপিটা ওর হাতে দিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবেন যান। দেখবেন, যেমন কপি দিয়েছেন তেমনি প্রুফ গিয়েছে। একটু এদিক-ওদিক পাবেন না।

সিল্কের ফিতায় জড়ানো কবিতা লেখা দামি নীলাভ কাগজগুলি কালাচাঁদের হাতে দিয়ে জহর প্রায় ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করে, যেমন দিয়েছি ঠিক সেই রকম পারবে তো সাজাতে ?

আগে দেখি !

সন্তর্পণে কালাচাঁদ জহরের হাতে লেখা কবিতার স্লিপগুলি এক এক পাতা করে উলটে যায়— কবিতাগুলি না পড়ে এবং না বুঝেই হিসাব করে যায়, কীভাবে ছাপানো সম্ভব, এই ছবি করে করে এঁকে লেখা হরফে বচিত দেড় ফর্মা দু-ফর্মার মতো কবিতার বইটা !

প্রায় দশ মিনিট সময় লাগায়। সবাই অধীর হয়ে ফেটে পড়তে চেয়েও অগত্যা চুপ করে থাকে।

শেষ পাতা উলটে সে মাথা নেড়ে বলে, টাইপে এ রকম হবে না, ব্লক করতে হবে।

ধনদাস জহরকে বলে, সে আমরাই সব করে দেব, ভাববেন না। তবে কিনা খরচটা—

কাজ বন্ধ করে কালাচাঁদের সঙ্গে কথা বলতে হলেও মানব রাগে না, বিরক্তিও বোধ করে না।

জিজ্ঞাসা করে, তোমার নাকি গল্প উপন্যাস কম্পোজ করার ঝোঁক বেশি ? অন্য বই ধরলে কাজ সুবিধে হয় না ?

কালাচাঁদ প্রায় সলাজ হাসি হেসে বলে, কেমন একটা বদ অভ্যেস জন্মে গেছে। ও সব বই নীরস খটমট লাগে, তেমন হাত চলে না।

এখন কী চালাচ্ছ ?

কালাচাঁদ বেশ রসিয়েই জহরের কবিতার বইয়ের গল্প শোনায়, বলে, ছেলেখেলার লেখা কবিতা—একটা লাইনের মানে বোঝা দায় !

মানব বলে, মানুষের নিজের লেখা সন্তানের মতো দামি।

তাই তো দেখলাম। কোন পাতায় হেডিং দেওয়ার পর কতটা ফাঁক যাবে, কোন লাইন ভেঙে ভেঙে বেঁকে বেঁকে চলবে—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার ! আদ্দেকের বেশি ব্লক হবে।

বাদ দাও। বাবুকে সিরিয়াস কোন কাজ দিতে বলো।

কী করে বাদ দেব ? স্পেশাল ডিউটি। কর্তা বলেছেন, একটা কমা সেমিকোলন এদিক-ওদিক হলে, একটা হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ই গোলমাল হলে আমাকে বিদায় করে দেবেন।

সাহিত্য কম্পোজ করার ঝোঁক চাপার মুশকিলটা দেখলে তো ? যারা প্রাণ দিয়ে লেখে, বাজে শখের লেখা নিয়ে তাদের যে কী ঝামেলা ! ঠিক মেথরের মতো জঞ্জাল সাফ করতে করতে লেখা চালিয়ে যেতে হয়। যে লেখাটা নিয়ে তোমার স্পেশাল ডিউটি, এগুলিই সব চেয়ে বিশ্রী জঞ্জাল।

লেখার শখটা খারাপ নাকি মানুবাবু ? শখ না হলে এত কষ্ট করে সবাই আপনারা লেখেন কেন ? কেউ তো বলেনি যে লিখতে হবেই ! অন্য কাজ করলে হয়।

স্বাধীনতার জন্য দেশের কত লোক প্রাণ দিয়েছে, কত লোক জেল খেটেছে জানো তো ? কী দরকার পড়ে তাদের জেল খাটায়, প্রাণ দেবার ? অন্য কাজ করে নিজে বেঁচে বাপের নাম বজায় রেখে গেলেই হত !

কথাগুলির তাৎপর্য অনুভব করে কিন্তু স্পষ্ট মানে ঠিক ধরতে পারে না বলে কালাচাঁদ চুপ করে চেয়ে থাকে।

মানব হেসে বলে, ধরো আমি একজন সত্যিকারের লেখক। আমি কি শখের জন্য লিখি ? আমি লিখি প্রাণের তাগিদে। না লিখে উপায় নেই বলে লিখি। কত লোকের কত শখ তো মেটে না। লেখাটা শখের ব্যাপার হলে কেউ এত কষ্টও করত না, জগতে সাহিত্য বলে কিছু সৃষ্টিও হত না।

কালাচাঁদ অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে চুপচাপ ভাবে।

তারপর গভীর হতাশার সুরে বলে, মুখ্যু হওয়া কি অভিশাপ মানুবাবু—অল্প একটু বিদ্যের স্বাদ পাওয়া ! শখের এত রাবিশ লেখা ছাপা হচ্ছে—

শুধু শখের লেখা নয় কালাচাঁদ, লেখার বাজারে মুদি দোকানির মালেব মতো লেখাও ঢেব ছাপা হচ্ছে পয়সার জন্য।

মনে হয়, কিছু জানি না, কিছুই বুঝি না, বৃথাই মোদের জন্ম।

তোমাদের জন্ম বৃথা হয়ে থাকলে, আমাদের লেখাও বৃথা হয়েছে কালাচাঁদ। মুখ্যু তোমাদের জন্ম বৃথা ধরে নিয়ে, পণ্ডিত আমরা যারা লিখতে চাই, তাদের জন্মও বৃথা হয়ে যায়।

বটে নাকি ?

তবে কী ? তোমাদের বাদ দিয়ে স্বাধীনতার জন্য জেলখাটা প্রাণ দেওয়া পর্যন্ত বাতিল হয়ে গেছে। তোমাদের বাদ দিয়ে লেখক হবার ফ্যাশনও গেছে শেষ হয়ে। তোমরা দেশের সাধারণ মানুষ, বেশিব ভাগ মানুষ, তেমরাই তো আসল দেশ।

আত্তির তীক্ষ্ণ গলা শোনা যায়, মা বলছে, কাজে যাবে না বাবা ?

মানবের সস্তা পুরানো টাইমপিসটার বিবর্ণ ডায়েলের দিকে একনজর তাকিয়েই কালাচাঁদ যেন আঁতকে ওঠে !

হায় সব্বোনাশ ! এমনিতে লেট হবে, সরোজবাবু ও দিকে এসে বসে থাকবে। কর্তা আজ তাড়াবেই আমাকে।

মানব তাকে অভয় দিয়ে বলে, ঘড়িটা বিশ মিনিট ফাস্ট চলছে—ভয় পেয়ো না। সূর্য কোথায় দেখে বেলা আঁচ করে আত্তি রোজ তোমায় যেমন তাগিদ দেয়—আজও তাই দিয়েছে। তুমি এ ঘরে আছ, শুনতে পাবে কি পাবে না ভেবে গলাটা আকাশে চড়িয়ে দিয়েছে।

মিনিট দশেক আরও তবে বসে যাই ?

অনায়াসে। আত্তি তিনবার তাগিদ দিলে তবে তো রোজ তুমি নাইতে যাও ? আত্তি ঠিক আরও দুবার চেঁচাবে।

কালাচাঁদ আনমনে বলে, ভারী চালাক চতুর হয়েছে মেয়েটা। যার তার হাতে দিতে মন চায় না। তবে না দিয়ে উপায় নেই আর। বয়েসের আন্দাজে বড্ড বেশি বেড়ে গিয়েছে।

মানব টের পায় আত্তির কথা কালাচাঁদ আনমনে বলেছে, সে বলতে চায় অন্য কথা। মানব নীরবে প্রতীক্ষা করে।

খানিক উশখুশ করে কালাচাঁদ কাঁচুমাচু করে বলে, অল্প লেখাপড়া শেখা কেউ যদি চেষ্টা করে, আপনাদের মতো লিখতে পারবে ?

নাঃ।

একটা নিশ্বাস ফেলে কালাচাঁদ।

ব্যাপারটা বুঝে চেষ্টা করলে তুমি কিন্তু লিখতে পারো ভাই, পেটে তোমার যতই কম বিদ্যা থাক।

কালাচাঁদ নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসে।

বড়ো বড়ো বিদ্বান লেখকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লিখতে চাইলে কিন্তু পারবে না, চেষ্টা করতে গেলে দু-একবছরে টি বি জন্মে যাবে, ছ-মাস আট মাসে মরবে।

তবে—?

কালাচাঁদের উৎসুক চোখে উৎসাহ যেন জ্বলজ্বল করে !

তবে, তোমার চেয়েও যারা মুখ্যু, তুমি যেটুকু জানো তার হাজার অংশও যারা জানে না বোঝে না, তাদের জন্য যদি লেখো—তবে কম বিদ্যা নিয়েও লিখতে পারবে।

মানব হঠাৎ হেসে ওঠে।

নোবেল প্রাইজ পাবার জন্য যাবা লেখে তুমি মাথা ঘামিয়ে তাদের সঙ্গে পাল্লা দেবার কথা ভাবছ নাকি ?—

ধাতস্থ হয়ে কালাচাঁদও হেসে বলে, মুখ্যু বলে কি আমি অমন মুখ্যু মানুবাবু !

মানব একটু সর্দির ভাব টের পেয়েছিল—গা ম্যাজম্যাজ করার ভাবটাও।

উপবাসে উপকার হবারই কথা।

কিন্তু একদিনেই দাঁড়িয়েছিল নিদাবুণ সর্দিকাশিতে। নাক বন্ধ মগজটা পর্যন্ত যেন সর্দিতে টসটস করছে। চোখ মেলে চাইতে গেলে চোখ টনটন করে। মুখ দিয়ে নিশ্বাস নিতে নিতে হাঁপধরা টুসটুসে ফুসফুসটা নেতিয়ে ঝিমিয়ে পড়তে চায়।

কোন ফাঁকে আত্তি এক মগ চা নিয়ে এসে হাজির হয়েছে সে টেরও পায়নি।

আদার রস মেশানো গবম চা।

যেচে আদা-চা দিতে আসার আগে জড়ানো শাড়িটা যথাসম্ভব ঢিল করেছে আত্তি। শ্রান্তিতে মুখ-চোখ যেন প্রতিবাদের ছবির মতো হয়েছে। অন্য দিনের মতোই মুখ—দেহটা খেটে খেটে সারা হযে গেলে যেমন মুখ হয়। লুকিয়ে চুপিচুপি আদা-চা এনে দিয়েছে কিন্তু চোখ-মুখে তার এতটুকু ভাবান্তর নেই।

তার সর্দি হয়েছে এটা জানতে হয়, আদা-চা করে আনতে হয, উপায় কী !

সে যেন গ্রাহ্যও করে না এই হিসাব যে, মানবের নিদারুণ সর্দিকাশি হয়েছে এ সংবাদ জানতেও কেউ তাকে বলেনি, সংবাদ জেনে আদা-চা তৈরি করে এনে দিতেও কেউ তাকে বলেনি !

আত্তি প্রায় আদেশের সুরে বলে, ধীরে ধীরে গরম গরম চুমুক চুমুক খান। বেশি খাবেন না একেবারে, জিভ পুড়ে যাবে, লাভ হবে নাকো। ধীরে ধীরে খান—একটু একটু চুমুক দিযে গরম সইয়ে খান।

মানব এক হাতে চায়ের মগটা নেয়, অন্য হাতে আত্তির হাত ধরে।

মগটা নামিয়ে রেখে আত্তিকে সে বুকে টেনে নেয়।

আত্তি নড়ে না, সাড়াও দেয় না, প্রতিবাদও জানায় না। কাঠ হয়ে থাকে।

মানবও কয়েক মুহূর্ত নির্বাক নিষ্কম্প হয়ে থেকে আত্তিকে ছেড়ে দিয়ে চায়ের মগটা তুলে নিয়ে চৌকিতে বসে।

আত্তি নীরবে বেরিয়ে যায়।

মানব ভাবে কেন পারলাম না ?

মায়া করে বলেই কি ? মায়া কাটিয়ে যতই নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচারী হয়ে উঠতে সাধ হোক না কেন, মায়া তাকে চরমে উঠতে দেয় না !

ভীতা ব্যথিতার নীরব প্রতিবাদ তাকে কাবু করে দেয় ! কী করে পারা যাবে এদের সঙ্গে ! যারা এত নরম, অথচ এমন কঠিন !

সারাদিন ছটফট করে মানব সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, আত্তির কাছে তাকে ক্ষমা চাইতে হবে।

হোক বস্তিবাসী গরিব কম্পোজিটারের মেয়ে ! অসভ্যতা করার জন্য তার ক্ষমাপ্রার্থনা ওর পাওনা হয়েছে।

প্রায় তখন সন্ধ্যা।

আত্তির মা রাত্রি সাড়ে তিনটে নাগাদ উনান ধরিয়ে বেঁধে ফেলে দুবেলার রান্না—পচা চাল, পচা আটা, ঘাসপাতা যা কিছু জোটে দুবেলার মতো। নইলে একবেলাই খায়।

মানব ভেবেছিল, আত্তির কাছে ব্যাপার শুনে সবাই রেগে টং হযে আছে, মুখ সকলের অন্ধকার দেখবে।

সে ফিরলেই আত্তির মা ছেঁড়া ময়লা শাড়ির আঁচল কোমবে জড়িয়ে তাকে গাল দিতে আর শাপ-মন্দ করতে শুরু করবে।

আত্তি বোয়াকে বসে আটা চালছিল। তার মানে ও বেলা দুবেলাব রান্না হযনি, আটা জোগাড় কবে এ বেলার জন্য রুটি পাকানো হচ্ছে।

আত্তি একগাল হেসে নীরব অভ্যর্থনা জানায়।

কী ঝকঝকে তকতকে দাঁতগুলি তাব !

হেসে কিন্তু আত্তি আড়ালে পালায় !

লাবণ্যহীন চর্বিবিহীন কী আঁটোসাটো গড়ন ! কতবার দেখেছে তবু আজ যেন আবাব প্রথম চোখে পড়ল।

কাল হাত ধবে বুকে টানার সময়ও খেয়াল ছিল না। ভালো খেতে না পেয়েও তার দেহটা এত সুন্দর কী করে হল ?

শুধু দেহ সুন্দব নয, কী করে এত পবিষ্কার হল তার মন ?

আত্তির মা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, তাড়াতাড়ি চটের টুকরোটা পেতে তাকে বসতে দেয়।

আসন হিসাবেই ভাঁজ করে রাখা হয়েছিল ছেঁড়া চটের টুকবোটা।

অপরাধীর মতো সে বসতেই আত্তির মা বলে, এত বোকাহাবা হয়েছে মেয়েটা ! নষ্ট হাবামজাদিদেব মতো। আপনজন একটু বেশি আদব করলেই দফা নিকেশ। মানুষের আদর চেনে না। চিনবেই বা কী করে ? বাপের সঙ্গে তো দেখা সাক্ষাৎ দু-চারমিনিটের—

বলতে বলতে সে হাঁকে, আত্তি ! মুখপুড়ি !

আত্তি এলে বলে, পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম কর মুখ্যু মেয়ে !

মানব হাসিমুখে বলে, আদর কবছিলাম বুঝতে পারনি কেন বলো দিকি আমায় ?

অমন আদব ভালো লাগে না। আলতো আদব সবাই কবতে চায়।

৩

উমাকান্ত ভোরে ওঠে।

লিখতে গিয়েই দেখা গেল, কলমটা চরম ধর্মঘট ঘোষণা কবেছে। কাগজে একটা আঁচড় কাটতে রাজি নয়।

পেনটার পেটে জবরদস্তি কালি ভরে, নিবটাকে জবরদস্তি ঠিকঠাক করে সৃষ্টির প্রেরণায় গদ-গদ আনন্দের প্রসব বেদনাকে চরমে ফাঁপিয়ে তুলে লেখার তাগিদে লিখতে গিয়ে দেখা গেল, কলমের

কালি-ভরা মোটা পেট আর দামি ধাতু দিয়ে গড়া নিবের সূক্ষ্ম মুখের মধ্যে ঘটে গিয়েছে সাংঘাতিক এক বিরোধ আর অসহযোগিতা !

কলম মাথা খুঁড়ে মরতে চাইছে সাদা কাগজের প্রশস্ত বুকে, ওই কাগজের বুকে ঘুরে ঘুরে শোষিত হয়ে নিজেকে ক্ষয় করে ফেলতে চাইছে নিবের সূক্ষ্ম মাথা, কিন্তু পেটের আর মাথার অসহযোগিতায় একটা আঁচড় টানা যাচ্ছে না !

নূতন একটা কলম কিনতেই হবে।

সস্তায় বেশ ভালো রকম একটা কলম। গল্প লিখতে যে কলম সহায় হবে, বাধা হবে না।

পুতুল শুনে আকাশ থেকে পড়ে !

লেখা হয়নি গল্পটা ? টাকা দিয়ে নিয়ে যায়নি লেখাটা ? টাকা দিয়ে যাবে না আজকালের মধ্যেই? খোকনটা তবে মরবে ঠিক করেছ তো ?

আমায় দোষ দিচ্ছ কেন ?

দায় নিয়েছ তুমি, দোষ দেব কাকে ?

সব দায় আমার ? তোমার কোনো দায় নেই ?

আমার দায় তো আমি পালন করছিই। রাঁধছি, বাড়ছি, খাওয়াচ্ছি পরাচ্ছি, জামাকাপড় কাচছি, বার্লি করছি, ওষুধ খাওয়াচ্ছি, গরম জল করে সেঁক দিচ্ছি, ঘায়ে মলম লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছি, তোমার আদরের কুকুরটাকে পর্যন্ত খেতে দিচ্ছি—

পুতুল কেঁদে ফেলে।

কেঁদে ফেলেনি দেখাবার জন্য হেঁচে কেশে আঁচলে মুখ মুছবার ছলে একটু আড়ালে সরে যায়।

পরস্পরের সংঘাতে প্রেম সৃষ্টি করার মজায় মজে থাকা যায় না পাঁচ মিনিটের বেশি।

লেখার ব্যবস্থা করতেই হবে—ভাবতে হবে কী ব্যবস্থা করা যায় ! উমাকান্ত বসে বসে ভাবে।

ওদিকে ছেলেমেয়ে ক-টা আর্ত চিৎকারে জগৎ ফাটিয়ে দিচ্ছে।

তার কলম ভাঙার রাগে তার সঙ্গে ঝগড়া করে পুতুল ওদের কোন অজুহাতে পিটিয়ে দিয়েছে কে জানে !

পুতুল আবার আসে।

গায়ে তার অলংকার বলতে প্রায় নেই।

কানের ফুটোটা কানপাশার ভারে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল বলে সেটাও পুতুল বাক্সে তুলে রেখে দিয়েছিল। সেই কানপাশা সামনে ধরে তেজের সঙ্গে বলে, যাও, বিক্রি করে কিনে নিয়ে এসো দামি একটা কলম। লেখো তোমার গল্প। সোমবার রেশন না আনলে হাঁড়ি চড়বে না এ কথাটা দয়া করে মনে রেখো।

উনানে হাঁড়ি চড়াবার জন্য আমি গল্প লিখি নাকি ?

হাঁড়িই যদি না চলবে তবে মিছে কলম চালানো কেন ?

হাজার হাজার ঘরে হাঁড়ি চড়ে না বলে, ওদের নিয়ে গল্প লিখব বলে।

কী হয় ওদের নিয়ে গল্প না লিখলে ? কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছে ওদের নিয়ে গল্প লেখার জন্য ? নিজের ঘরে হাঁড়ি চড়ে না, যাদের হাঁড়ি চড়ে না তাদের নিয়ে গল্প লেখার শখ !

উমাকান্ত আর তর্ক করে না। পুতুলের সঙ্গে ভাগাভাগি করে দেড় কাপ চা খায়।

কী চরমে যে উঠে গেছে পুতুলের চা খাবার নেশা !

তার লেখার নেশার সঙ্গে যেন পাল্লা দিয়ে চালাতে চাইছে চা খাবার নেশাকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে !

পুতুলের ভাঙাচোরা দেহে আসন্ন মাতৃত্বের ভাব দেখতে দেখতে, তার মুখের লাবণ্যহীনতার বিদ্রোহ দেখতে দেখতে উমাকান্ত আত্মজ্ঞানের আরেক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

পুতুলকে ভেঙে ভেঙে দমিয়ে দমিয়ে কাহিল করা যাবে। প্রচণ্ড আঘাতে চুরমার করে দেওয়া যাবে। কিন্তু তার নিজের মনের মতো পছন্দমতো নতুন করে গড়ে নেওয়া যাবে না !

কারণ, পুতুলও নিজের কায়দায় তাকে খেলিয়ে রাগিয়ে ভুলিয়ে মন জুগিয়ে হেসে কেঁদে রাগ অভিমান করে, তাকে নিজের মনের মতো পছন্দমতো করে নেবার লড়াই চালাচ্ছে।

লড়াই সে শুধু একাই করে না।

পুতুলও লড়াই করতে জানে।

আবেগের সুরে উমাকান্ত বলে, থাকগে। ও সব ব্যাপার তুমি বুঝবে না। কাল সকালে লেখাটা নগদ মজুরি দিয়ে নিতে আসবে। কলমটা বিগড়ে না গেলে আজ রাতের মধ্যেই লেখাটা রেডি করে ফেলতে পারতাম।

পুতুল রান্নাঘরে ফিরে যায়। জামা গায়ে দিয়ে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে উমাকান্ত গভীর আপশোশের সুরে বলে, নতুন কলম দিয়ে কেমন লেখা বেরোবে কে জানে !

চটপট, বিস্বাদ সাদা গরম বিশ্রী আটার লেচিগুলি, বেলতে বেলতে মুখ না তুলেই পুতুল বলে, বাঃ, বেশ ! বিলাতি কলম বিগড়োলেই লেখক মশায়ের দফা শেষ। কত বড়ো লেখক, বিলাতি কলম দিয়ে দিস্তা দিস্তা কাগজে লিখে লিখে কলম পিষে পিষে, কাগজ-কলমে দেশের চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করে দিচ্ছিলেন। কলমটা বিগড়ে গিয়ে মুশকিলে পড়েছেন।

কলম ছাড়া লেখা যায় নাকি—শুধু হাতে ?

কেন দোয়াত-কলমে লেখা যায় না ? পেন্সিলে লেখা ফোটে না ? কলম ভেঙেছে, বাড়িতে দোয়াত-কলম নেই, পেন্সিল নেই ?—ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করে না ?

লেচি বেলা শেষ করে কচকচ করে কুমড়োর ফালিটা কাটতে কাটতে পুতুল কথাগুলি বলে। ছেলেমেয়ে খেয়ে দেয়ে স্কুলে যাবে—দশটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফিরে আসবে বিকাল সাড়ে চারটায়।

ডাল তরকারি ছেঁচকি খেতে না দিলে, মাছ পাতে না পাওয়ার অভিমানকে বেত লাঠির শাসনে কাবু না করলে, ওদের কি সামলানো যায় ?

কলম কিনে বাড়ি ফিরতেই ছেলেমেয়ের এলোমেলো অস্থির উদ্ভট কলরবে বিভ্রান্ত উমাকান্ত কয়েক মুহূর্ত নড়তে পারে না।

তারপর—চোখ থেকে প্রাণ থেকে জীবনান্তকর শ্রমের শ্রান্তি কোঁচার খুঁটে মুছে ফেলতে ফেলতে, মানব-দায় ঘাড়ে নেবার সুরে বলে, কী রে ? কী হয়েছে ?

মা যে মরে যাচ্ছে বাবা !

ছেলেমেয়ের আর্তনাদ, শ্রান্তি-ক্লান্তির জের টানা বন্ধ করে দেয়।

উমাকান্ত প্রায় একটা লাফ দিয়ে পৌঁছায়, রান্নাঘরে কয়েকটা চট বিছানো শয্যায় শায়িত পুতুলের কাছে।

উনান জ্বলছে।

হাঁড়িতে ডগবগ করে ফুটছে সহজে ফোটা খাওয়ার বিরোধী, রেশনের পচা দামি চাল—ট্যাঁট্যা করে চেঁচাচ্ছে পুতুলের চটফট দিয়ে তৈরি শয্যায় একটা নতুন সদ্যোজাত মানুষ !

পুতুল বলে, হাসপাতালে পাঠাতে গেলে, তুমি বিকল হবে জানি তো ! ঘরেই তাই চালিয়ে দিলাম। ভাত ফুটতে দেরি আছে, কী বিশ্রী চাল কী বলব তোমায় ! বুনোর মা-কে ডেকে নিয়ে এসো। উনানে কুঁচো কয়লা দিয়ে যেতে বলবে—যেন না নেভে। সারারাত সেঁক দেবে, পাঁচটা টাকা কবুল করো।

পুতুল গা এলিয়ে দেয়। ট্যাঁট্যাঁ করে চেঁচাচ্ছে সদ্যোজাত রক্তমাখা বাচ্চাটা।

পুতুল যেন জীবনকে জন্ম দেবার দাসীত্বপনার রাগে দুঃখে অভিমানে মরতে চেয়ে সন্তানের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে তার চোখের সামনে জ্ঞান হারিয়েছে।

উমাকান্ত দ্বিধা করে না। জামা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উমাকান্ত খুন্তি দিয়ে উনানের তলা খুঁচিয়ে আঁচ বাড়িয়ে, উনানে আরও কযলা দেয়। কেটলি ভরে জল ফুটতে দিযে উমাকান্ত তার সবটুকু অনভিজ্ঞতা নিয়েই ডাক্তাব আর ধাত্রীর কাজে লেগে যায।

ডাক্তার নেই ! ধাই নেই। অন্য সমস্ত দায় ভুলে না গিয়েও তার ছেলের, ছেলেটার মা-র, প্রাণ বাঁচাতে তাকেই ডাক্তার আর ধাত্রী না হয়ে উপায় কী !

এইটুকু একটা বাচ্চা বিযোতে কত রক্ত ঢেলেছে পুতুল !

তারপর অবশ্য যেতেই হবে ডাক্তার আব ধাইয়ের খোঁজে—অথবা পুতুলকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

টাকা চাই, টাকা !

পুতুলকে বাঁচাতে টাকা জোগাড় করতেই হবে।

প্রেসের মালিক ধনদাস বসে, কোণের দিকে কাঠের ঘেরা কুঠরিটাতে, প্রেসের খোলা হলেব মধ্যে একটা টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার নিয়ে মহেশেব দপ্তর।

এইখানে বসে সে 'রস সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদনাও করে, প্রেসের কাজ দেখাশোনাও করে। লেখকদের সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা, কম্পোজিটারদের সঙ্গে কাজের কথা, আর ছাপাব কাজ করিয়ে যারা পয়সা দেবে তাদের বা তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ আপ্যায়ন চালানো,— সব সে একসাথে চালিয়ে যায়।

কোনো কাজেই এতটুকু রোমাঞ্চ নেই।

মানব ও খালেক, মহেশের জন্য অপেক্ষা কর্বছিল, শুকনো মুখে উমাকান্ত এসে চুপচাপ একটা চেয়ারে বসে পড়ে।

একটি কথা বলে না। যেন চেনেই না মানব ও খালেককে !

তারাও চুপ করে থাকে। কে জানে কোন জ্বালায় জ্বলছে উমাকান্তের প্রাণটা !

পদে পদে উমাকান্তের প্রাণের জ্বালা টের পাওয়া যায়।

যখন তখন সে সতেজে বলে, কেন ? এ জগতে কী এমন অপরাধ সে করেছে যে আত্মবিনাশের প্রায়শ্চিত্ত বরণ করতে হবে ?

লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে মানুষের মতোই সে বেছে নিয়েছে তার কর্মজীবনের লাইন !

কেন সে জন্য মানুষ এমন অন্যায় দারিদ্র্যের বোঝা তার উপর এমনভাবে ঠেকাবে ?

লেখকের এত সম্মান দেশ বিদেশে। লেখক হতে চাওয়ার জন্যই তার হল এমন দশা।

লেখক হতে হলে কি সমাজ ছাড়তে হয় ? সমাজের কাছে নিষ্প্রয়োজনীয় জীব হতে হয় ?

যে দেশে দু-চারজন লেখক ছাড়া কারও দিবারাত্রি খেটেও পেট ভরে না, সে দেশের মানুষ কোন লজ্জায় লেখকদের সম্মান দেখায় ?

ছাপাখানায় বসে নিজের বইটার প্রুফ দেখতে দেখতে মুখ তুলে প্রায়ই সে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে. ওটাই আসল কথা। লিখে পয়সা জোটে না। দিনরাত মেতে থাকতে হবে, পেট চলবে না। কলকাতায় ভিক্ষে করে বেশি রোজগার হয়। তবু লোকে ভাবে নামের জন্য টাকার জন্য আমরা লিখি। একবার ভাবে না যে তাই যদি হবে, হাকিম বঙ্কিমচন্দ্র বড়োলোক রবীন্দ্রনাথ লিখতে গেলেন কেন ? টাকার তো তাদের অভাব ছিল না !

কথাগুলি মোটেই অসাধারণ নয়, কিন্তু প্রাণের ফুটন্ত জ্বালা যেন উপচে উপচে পড়ে কথাগুলিকে আশ্রয় করে। সম্প্রতি দিন দিন বেড়ে চলেছিল তার কথার ঝাঁঝ, অবুঝের মতো হয়ে উঠছিল তার নালিশ—উমাকান্তের মতো লেখকের মুখে মোটেই যা মানায় না।

অন্যেরা ব্যাপার জানে না, বুঝতে পারে না। লেখক-সুলভ পাগলামি মনে করে। কিন্তু মানবের তো ভালো করেই জানা ছিল—তার পুতুলদির ব্যাপার এবং উমাকান্তের অবস্থা।

সে তাই গভীর উদ্‌বেগ অনুভব করে। কিন্তু সহানুভূতি জানাবার উপায় নেই। উমাকান্তের প্রাণের জ্বালা বেড়ে যাবে, সে রেগে উঠবে।

যে কথা চলছে সেই কথা বলো, তর্ক করো, খোঁচা দাও—সস্তা সমবেদনা জানিয়ো না !

মানব তাই হেসে বলে, লোকে এত সম্মান দিয়েছে, তবুও লোককে দোষ দিচ্ছেন ? কিছু লোক লেখকদের ছোটো ভাবতে পারে—সাধারণ লোকে তা ভাবে না। রাগ করে লাভ কী বলুন, কত লেখক টাকার জন্য কত কী যা তা লিখছে, নিজেকে বিক্রি করছে। ওরা যাদের পা চাটে তারা তো ধরে নেবেই লেখকরা মানুষ নয়।

সিসার হরফ বাছতে বাছতে সাজাতে সাজাতেই কালাচাঁদ মন দিয়ে তাদের কথা শোনে।

উমাকান্ত আরও চটে গিয়ে বলে, কারও পা চাটার দরকার হবে কেন লেখকের ? এ অবস্থায় কেন মানুষ লিখবে ?

সবই উমাকান্ত জানে এবং বোঝে। মানব তাই হাসে না। প্রাণের জ্বালায় সেই জানা কথাটা সে যে ভুলে গেছে এটুকু শুধু স্মরণ করিয়ে দেয়।

বলে, মানুষকে কিছু বলার নাছোড়বান্দা তাগিদ থাকলে না লিখে উপায় থাকে না, তাই মানুষ লেখে।

তুমি আমি পেটে না খেয়ে লিখি কেন ?

পেটে খাওয়ার চেয়ে লেখার তাগিদ আমাদের জোরালো বলে !

শখের লেখায় কীসের তাগিদ !

একই তাগিদ—দশজনকে কিছু শোনাব। আসল লেখার তাগিদটা প্রাণের. শখের লেখার তাগিদটা হয় শখের।

এই সব কথাবার্তার মধ্যে ধনদাস হয়তো একবার বাইরে আসে—নিছক একটু ভদ্রতা করতে। মানব ও উমাকান্তের সঙ্গে তার পরিচয় আছে কিন্তু সোজাসুজি অন্য কোনো কারবার নেই।

সব কিছু মহেশের মারফতে চলে।

কেমন আছেন উমাবাবু, মানুবাবু, খালেক সায়েব ?

তিনজনে একটু হেসে তার ভদ্রতার জবাব দেয়।

ধনদাস শ্যেনদৃষ্টিতে চারিদিকে তাকায়। কাজে এতটুকু শিথিলতা ঘটলে সে ধরবেই !

বিশেষভাবে সে কালাচাঁদের দিকে তাকায়। কাজ কামাই করে সে তাদের সঙ্গে কথা বলছিল কি না এই জিজ্ঞাসা চোখে নিয়ে যে তাকায়, সেটা বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না মানব আর খালেকের। ধনদাস কীভাবে সেই জানে, মুখে আচমকা হাসি এনে খালেককে খাতিরের সুরে জিজ্ঞাসা করে, বইটা নিজেই ছাপছেন ভাই ?

এই প্রেসে খালেকের একটি কবিতার বই ছাপা হচ্ছে। পাইকায় তিন ফর্মা সাড়ে তিন ফর্মা হবে। সস্তা কাগজ—ধনদাসের ধারণা কোনো কাগজ ব্যবসায়ীর গুদামে চোখের আড়ালে পড়ে গিয়ে কিছু কাগজ পচে যাবার উপক্রম করেছিল, সন্ধান পেয়ে ড্যাম চিপ দরে কাগজ বাগিয়ে খালেক কবিতার বই ছাপাবার শখ মেটাচ্ছে !

প্রেসের পাওনা আদায় করা সম্পর্কে খটকা ছিল। মহেশ নিজে দায়িক হয়ে আশ্বাস না দিলে, হয়তো কাজটা নিতে সে রাজিই হত না।

একুশ শো বই ছাপছে। পুরনো রং ধরা সস্তা কাগজ, মলাটও হবে কাগজের, একটা দু-রঙের ব্লকের ছোঁয়াচ পর্যন্ত থাকবে না সে মলাটে, শুধু বড়ো হরফে ছাপা হবে বইয়ের নাম, কবির নাম সাধারণ ছোটো হরফে—এই বই ছাপছে একুশ-শো !

টাকা আদায়ের দায় ঘাড়ে নিয়ে মহেশ বলেছিল, কনসেশন রেট দিতে হবে, নইলে কাজটা পাব না।

না পেলাম ?

আলগা টাইপে চালিয়ে দেওয়া যাবে কাজটা। বুনো আর দীনু আধবেলা খাটছে। স্কুল বইয়ের সিজন আসছে—অন্য প্রেস ওদের দুজনকে বাগিয়ে নেবে কিন্তু।

ধনদাস উদারভাবে বলেছিল, দিন তবে ওই রেটটাই। তিন চার ফর্মার ব্যাপার তো, কী আর এমন এসে যায়।

প্রথম ফর্মা ছাপা হওয়া মাত্র খালেক সে ফর্মার টাকা জমা দিয়েছিল—সবটা নয়। দুটাকা হাতে রেখে দিয়েছিল। তবু এটা অভাবনীয় ব্যাপার। বই শেষ না করে এক ফর্মা ছাপিয়েই নগদ টাকা !

এই জন্যই ধনদাস তাকে একটু খাতির জানাতে এসেছে সন্দেহ কী ! এভাবে যে পাওনা মেটায় তাকে সে বড়োই পছন্দ করে।

খালেক বলে, কেউ ছাপাবে না, কী করি। একজন পাবলিশার পেলাম, শুধু কাগজের দামটা দেবে। বই বিক্রি হয়ে কাগজের দামটা শোধ হবার পর লাভের একটা অংশ আমায় দেবে।

ছাপার যন্ত্রের ঘর্ঘর আওয়াজে মুখ গুঁজে কর্মরত অন্য সব হরফ-শিল্পীদের কথা ভুলে গিয়ে ধনদাস হোহো করে সশব্দে হেসে ওঠে।

তার হাসির দমকে চমকে যায় ছাপাখানা।

কিন্তু থেমে যায় না।

হরফ সাজানোর কাজ সকলে করে যায় মাথা গুঁজে।

ধনদাস হাসতে হাসতে বলে, কাগজের দাম দেবে নাকি ? আমি ভাবছিলাম, কাগজ বুঝি আপনি কিনে দিয়েছেন, গুদাম-পচা কাগজ সস্তায় বাগিয়েছেন। তাই তো বলি, কবিতার বই ছাপানোর জন্য এমন রদ্দি কাগজ ! অন্য কারও ঘাড়ে চাপাবার উপায় ছিল না। এ কাগজ পয়সা দিয়ে কেউ কিনত না। ছেলেমানুষ নতুন কবি আপনার ঘাড়ে কাগজটা চাপিয়েছে।

খালেকও হেসে বলে, আজ্ঞে না। আমরা এ কালের কবি, বয়স কম বলেই অত ছেলেমানুষ ভাববেন না। আপনার মতো বুড়োদের চেয়ে আমরা ঢের বেশি পেকে গেছি। কাগজ চেপেছে পাবলিশারের ঘাড়ে, আমার নয়। দোকানে বসেছিলাম, কাগজওলার লোক বলছিল যে এ রকম কিছু রদ্দি কাগজ আছে, যদি কোনো কাজে লাগানো যায়। দাম একটা ধরে দিলেই হবে। আমিও সুযোগ বুঝে কবিতার বইটা ছাপানোর ব্যবস্থা করে নিলাম।

আর সব খরচ তো আপনার ?

আমার বইকী ! তবে নগদ শুধু ছাপার খরচ। বাকি সব বই থেকে উঠে আসবে। কাগজ দেখে লোকে নিন্দা করবে পাবলিশারের, আমার কবিতার নিন্দা তো করবে না !

এমন তেজ আর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে তরুণ কবি কথাগুলি বলে যে, ধনদাসের সশব্দে হাসবার আর সাধ্য থাকে না।

গায়ের জোরে মুখে একটু হাসি ফোটায়।

পিঠ চাপড়ানো সুরে বলে, নাম করুন, বাজারে আগে নাম করুন, কষে ঢাক পেটান। নাম হলে বই ছাপানোর জন্য সাধাসাধি করবে।

খানিক পরে উমাকান্ত আসে।

পুতুল হাসপাতালে গেছে।

সেরে উঠে ফিরে আসবে। কোনো রকমে কয়েকটা দিন ঠেকিয়ে ঠুকিয়ে চালিয়ে যাওয়া।

আজ হাসপাতালে খবর নিতে গিয়ে পুতুলের অবস্থা এবং চিকিৎসার বিবরণ একজন রোগা কালো নার্সের কাছে শুনে, উমাকান্তের মনে হয়েছিল, এবার তার খেপে গিয়ে ভীষণ রকম কিছু একটা আবোল-তাবোল পাগলামি করে, পুলিশের গুলিতে মরে গিয়ে শান্তি পাওয়া দরকার।

কোন ডাক্তার দেখছেন ?

সাদা উর্দি পরা নার্স কবিতা, সাদা টুপি আঁটা মাথাটা উঁচু করে রেখেই বলেছিল, ডাক্তার দাস একজামিন করেছিলেন, তারপর ডাক্তার কেউ দ্যাখেননি। উঁচুক্লাসের দুজন ছাত্রী দেখছিল, আজ তারা রিপোর্ট দিয়েছে যে ডাক্তারকে ইন্টারভেন করতেই হবে। ডাক্তার দাস এলেই যাতে সকলের আগে ওঁকে দ্যাখেন, আমি সে ব্যবস্থা করে দেব।

কবিতা হঠাৎ মাথা তুলে বলেছিল, আমাদের কাউকে দোষ দেবেন না। পেশেন্ট আসে বন্যার মতো। আমরা ক জন ডাক্তার ক-জন নার্স কী করে সামলাব ?

উমাকান্ত তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিয়েছিল, ডাক্তার নার্স আপনারা সোজাসুজি সে কথা বলেন না কেন যে দায় নিতে পারবেন না ? মানুষের প্রাণ নিয়ে খেলা করেন কেন ?

আত্মীয়বন্ধুদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে, মরিয়া হয়ে উমাকান্ত ধনদাসের প্রেসে এসেছে শেষ চেষ্টা করার জন্য।

মহেশ বলে, আমায় তো বড়ো মুশকিলে ফেললে তুমি ! বিকালে দেবে বলে প্রুফ নিয়ে গেলে, নিয়ে এলে তিন দিন পরে !

উমাকান্ত বলে, কী করি বলুন ? বউটা ছিল পোয়াতি—হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেল। হাসপাতালে নিতে নিতে রক্ত ঝরে গেল বালতিখানেক। এখনও যায়-যায় অবস্থা।

হয়েছিল কী ?

কিছু না। উচিত ছিল দিনরাত শুয়ে থাকা, সকালে বিকালে সাবধানে ধীরে ধীরে শুধু একটু হেঁটে বেড়ানো—বাসন মাজা ঘর মোছা হাঁড়ি ঠেলা, ছেলেমেয়ের ঠেলা—সব বন্ধ রাখা উচিত ছিল। উচিত কাজ না করার, উচিত ঠেলা সামলাচ্ছে।

ধনদাসবাবু তো এ সব কথা শুনবে না ভাই !

না শুনলে না শুনবে, করব কী ! ছেলেমেয়ের মা-টাকে বাঁচাবার চেষ্টা করব না ? বলেছি বলেই প্রুফ নিয়ে ছুটে আসব—বউটা ওদিক মরুক বাঁচুক ? সিকি টাকাও দেয়নি—আরও সিকি ভাগ দেবে দেবে করে আজ ক-দিন ঘোরাচ্ছে।

কেন যে ও রকম করে—

করুক। আমি চেষ্টায় আছি। একটা পাবলিশার পেলেই এই বইটা যা পাই নিয়ে কপিরাইট বেচে দেব। তারপর যা হয় হবে দেখা যাবে—নয় জেল খাটব দু-চারমাস।

পরের ফর্মার প্রুফটা এখানে বসেই তাড়াতাড়ি দেখে দিতে দিতে সে কথা কয়—খেয়াল করে যে, ধনদাস ঠিক দু-তিনমিনিটের মধ্যে মহেশকে কী বলতে এসে—অর্থাৎ বলতে আসার ভান করে—তাকে দেখে যেন আশ্চর্য হয়ে—অর্থাৎ আশ্চর্য হবাব ভান করে বলে, আপনার বাড়িতে না বিপদ শুনলাম !

প্রুফশিট থেকে মাথা না তুলেই উমাকান্ত বলে, খুব বিপদ।

ব্যাপার বুঝতে দেরি হয় না। সকলেরই জানা আছে কাঠের ফ্রেমের কুঠরিটার কাছাকাছি বাইরের এই টেবিলে বসে মহেশ যার সঙ্গে যে কথা বলে ধনদাস নিজের কামবায বসে সব শুনতে পায়।

তবু নিজে প্রুফ দেখে দিতে এসেছেন ? আপনারা সত্যি কাজের মানুষ ! অসুখ-বিসুখ মরা-বাঁচার জন্য দু-চারদিন সময় নেওয়া যায়। দায়ে কী ফাঁকি দেওয়া যায মশাই !

বিপদে-আপদে পাওনা টাকা না পেলে যে বিপদ ঠেকানো যায় না, সেটা কি ভেবেছেন মশাই !

ধনদাস আহতভাবে একটু রাগের সঙ্গেই বলে, টাকাটা চেয়েছিলেন, চেক তৈরি করে রেখেছি—চট করে এসে নিয়ে যেতে তো পারতেন ? আজ দোষী করছেন আমায় ! নাঃ, আপনারা লেখকেবা বড়ো বেশি কাছাখোলা মানুষ। সামান্য বিপদে-আপদে এমন মাথা গুলিয়ে যায আপনাদের !

উমাকান্ত নীরবে প্রুফ দেখে যায়।

যাক গে। চেকে কাজ নেই। প্রুফটা দেখে যাবার সময় সব পাওনাটাই নগদ নিযে যাবেন। বিপদে-আপদে এটুকু না করলে চলবে কেন !

নগদ টাকা !

রস সাহিত্যে তিন মাস ধবে ছ-সাত পাতা কবে করে প্রকাশিত, ধারাবাহিক উপন্যাসটার জন্য, পনেরো টাকা হিসাবে মোট মজুরি পঁয়তাল্লিশ টাকা !

মানব আর খালেকের গল্প কবিতায় থাকে কড়া রকমের বিদ্রোহেব ঝাঁঝ। রস সাহিত্যের মতো কাগজে যে ও রকম লেখার ঠাঁই হতে পারে না, সেটা তাবা নিজেরাই জানে।

ও ধরনের লেখা দিয়ে মহেশকে তারা বিব্রতও করে না।

সামাজিক ব্যাপার নিয়ে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ভরা লেখা হলে, দুঃখদুর্দশার শুধু ছবিটুকু সামনে ধরে দিলেই সার্থক হয় এমন ধরনের লেখা হলে মহেশ আপত্তি করে না, ধনদাসও আপত্তি করে না।

এ সবও বিদ্রোহের রচনা। ধনদাস কিন্তু সেটা ধরতে পারে না একেবারেই ! অথবা বিদ্রোহী লেখক কবিদের নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার আর কোনো উপায় নেই বলে অগত্যা এটুকু সে মেনে নিয়েছে ?

ব্যঙ্গ বিদ্রূপ তো হাসির ব্যাপার, ওতে দোষ নেই—স্বয়ং ভগবানকে নিয়েও তো হাসি-তামাশা করা হয়।

সংসারে দুঃখদুর্দশা আছে, তার বর্ণনাতেও দোষেব কিছু নেই—সে জন্য দায়ী কে, সেটা বিশ্রী রকমভাবে না বলা থাকলেই হল !

এ রকম লেখা লিখলে দোষ হয় না—নীতি হিসাবে এটা মানব আর খালেক মেনে নিতে পারনি। মহেশের বয়স, অভিজ্ঞতা স্নেহ আর সদিচ্ছাকে শুধু তারা স্বীকৃতি দিয়েছে।

মহেশ বলে, লেখার এটম বোমা বানাতে কে তোমাদের বারণ করেছে ? বানাও, ছড়াও, চাহিদা বাড়াও। লোকে যদি বলে যে ও রকম লেখা না থাকলে আমরা কাগজ ছোঁব না, ও রকম না হলে

বই কিনব না—ধনদাস জোড় হাতে লেখা ভিক্ষে চাইবে। তোমরা চাও নীতিকথা শুনিয়ে ওকে গলিয়ে দেবে। পয়সা ছাড়া ওর কোনো নীতি আছে ? ওর রুচি নীতি আদর্শ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে গায়ে জ্বালা ধরিয়ে লাভটা কী ? ওকে যারা পয়সা দেয়, তাদের রুচি নীতি আদর্শ বদলে দাও—পাঠক-পাঠিকার দিকে তাকাও। পয়সা দিয়ে তারা যদি এমন গরম লেখা কিনতে চায়, যে কম্পোজ করতে সিসার হরফ গলে যাবে—

খালেক বলে, কিন্তু অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলতে গেলে লেখক নরম হয়ে যাবে না ? সুবিধাবাদী হয়ে যাবে না ?

মহেশ বলে, সেটা লেখক বুঝবে। অবস্থা তো লেখকের মনের ফাঁকা সাধকে খাতির করবে না। অবস্থা ভালো নয়, অবস্থা একেবারে উলটে পালটে না দিলে চলবে না—এ সব হল আলাদা কথা। অন্য রকম অবস্থা হওয়া উচিত বলেই যে অবস্থা আছে, সেটা নেই বলে উড়িয়ে দিলে চলবে কেন ?

মানব বলে, বাস্তবকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না জানি। অবস্থাটা কী, ঠিকভাবে না জেনে অবস্থা বদলাবার ব্যবস্থা করা যায় না,—তাও জানি। কিন্তু খারাপ জেনেও একটা অবস্থাকে স্বীকার করা কি উচিত ?

মহেশ একটু হেসে বলে, সোজা কথাটা তোমরা কিছুতেই ধরতে পারছ না। স্বীকার করা মানে তোমরা বুঝছ যা কিছু যেমন আছে মেনে নিয়ে স্রোতে ভেসে যাওয়া। চোখকান বুজে নিরীহ গোবেচারির মতো মানিয়ে চলার কথা কি আমি বলছি ? যেমন ধরো, তোমার খুব সর্দিকাশি হয়েছে, একটু জ্বরও বোধ হয় এসেছে। তোমার যে অসুখ হয়েছে এইটুকু শুধু আমি তোমাকে মানতে বলছি। অসুখটা উড়িয়ে দিলে চলবে না—সর্দি জ্বরে টাইফয়েডের ইনজেকশন নিলেও চলবে না। উমাকান্ত সব বোঝে, বুঝেও রেগে জ্বলে পুড়ে মরছে। তাতে লাভ কী ?

মানব এবার একটু হাসে।—না, এটা মানতে পারলাম না। গা পুড়বে তবু জ্বালাটা হাসিমুখে উড়িয়ে দেব ? জ্বলুনি ছাড়া অবস্থা পালটে দেবার বোধ চাপবে কোথা থেকে ?

এই আলোচনার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্তের মতোই উমাকান্ত এসে দাঁড়ায়।

তার হাতে একতাড়া লেখা কাগজ।

পুতুল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরেছে, দুদিন আগে বস সাহিত্যের পরের সংখ্যার জন্য উমাকান্ত লেখাও দিয়ে গিয়েছে। কে জানে আবার কী বিপদ ঘটল তার।

ব্যাপার কী ? পুতুলদি কেমন আছে ?

ভালো নয়। বড়ো বিপদে পড়েছি। সামলে উঠছিল, কীভাবে আবার বিগড়ে গেল ধরতে পারছি না।

তার মুখে নতুন বিপদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনে তিনজনের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়।

হরফ সাজানো বন্ধ রেখে নিজের জায়গায় বসে কালাচাঁদও সব শোনে।

ভাবে, বিপদই বটে—টাকা না থাকার বিপদ। নইলে এ আর কী এমন বিপদ দাঁড়াত !

টাকার সন্ধানেই উমাকান্ত বেরিয়েছে, সমাপ্তপ্রায় উপন্যাসটার পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে।

ধনদাস যদি উপন্যাসটা নিয়ে কিছু টাকা দেয় !

মহেশ ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারা করে, উমাকান্ত বিহ্বলের মতো চেয়ে থাকে।

ইশারায় কাছে ডেকে মহেশ তার কানে কানে বলে, বিপদের কথাটা সব ফাঁস করবেন না, এখুনি টাকা না হলেই নয় এটা যেন টের না পায়। যদি অবশ্য আপনার না কথাগুলি শুনে থাকে—বোধ হয় শুনেছে। মোট কথা, নরম হবেন না। এখানে না হলে অন্য জায়গায় চেষ্টা করবেন।

উমাকান্ত মুখ বাঁকায়।

খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে মুখের ভাব স্বাভাবিক করার চেষ্টা করতে করতে সে ধীরে ধীরে ধনদাসের কাঠের ঘেরা আপিসটুকুর ভিতরে যায়। সকলে নীরবে প্রতীক্ষা করে থাকে।

ধনদাস অমায়িকভাবে বলে, আসুন আসুন, বসুন ! অনেক দিন বাদে এলেন মনে হচ্ছে। অবিশ্যি যদি এসে মহেশবাবুর সঙ্গে কথা কয়ে চলে গিয়ে থাকেন--

উমাকান্ত স্বস্তিবোধ করে।

ধনদাস তাহলে তার বিপদের বিবরণ শোনেনি ! গলা সে তেমন চড়ায়নি, আরেকটু জোরে না বললে ধনদাস বোধ হয় বাইরের কথা শুনতে পায় না।

একটা নতুন বই এনেছিলাম।

উপন্যাস ? বেশ, বেশ। শেষ করেছেন ?

সামান্য বাকি—ফর্মা দেড়েক।

ধনদাস নীরবে বারকয়েক মাথা দুলিয়ে বলে, যতটা লিখেছেন তাতে কত ফর্মা হবে ?

দশ ফর্মার মতো হবে।

বারো ফর্মার মতো দাঁড়াবে তাহলে ? একেবারে শেষ করে আনলেই পারতেন ! দেড় ফর্মা দু-ফর্মা লিখতে আপনার আর কতক্ষণ ? পাকা হাত, কলম ধরে বসলেই হল।

ভিতরের উদ্‌বেগ প্রাণপণে চেপে রাখবার চেষ্টা করতে করতে কোনোরকমে উমাকান্ত মুখে মৃদু একটু হাসি ফুটিয়ে বলে, তা কী ঠিক আছে কিছু ! লেখা এসে গেলে দু-তিনদিনে হয়ে যায়, না হলে পনেরো দিনও লেগে যেতে পারে।

একটু চুপ করে থেকে ধীরভাবে বলে, আমার কিছু টাকার দরকার ছিল।

ধনদাস হেসে বলে, টাকার দরকার কার নেই বলুন ? কিন্তু আপনার পাবলিশারের কাছে না গিয়ে আমার কাছে এলেন ?

এর জবাবে আসল কথা খুলে বলা যায় না। তার বইয়ের আসল প্রকাশক দুজন, দুজনের সঙ্গেই অত্যন্ত কড়াকড়ি বন্দোবস্ত এবং নিজেই সেটা সে গড়ে তুলেছে। লিখিত চুক্তির এতটুকু এদিক-ওদিক হলে, হিসাব বা পাওনা টাকা দিতে এক দিন দেরি হলে, ঝগড়া আর রাগারাগি করে দুজনের সঙ্গেই গড়ে তুলেছে একেবারে চাঁচাছোলা শুধু ব্যাবসাগত সম্পর্ক।

এ তো জানা কথাই যে, সুবিধা নিলে প্রকাশক অন্যভাবে সেটা আদায় করে নেবেই। লাভের ন্যায্য বখরা আদায় করার জোর তার থাকবে না।

প্রকাশক দুজনকে মুখের ওপর কতবার যে এ কথা শুনিয়ে অন্য সকলের চেয়ে লাভের ভাগ বেশি আদায় করেছে।

আজ অসমাপ্ত বইটা নিয়ে গিয়ে ওদের কাছে টাকা দাবি করার উপায় তার নেই।

মান অপমানের কথা তুলে আজ গিয়ে হাত পাতলে হয়তো টাকা দেবে না, হয়তো অনেক টালবাহানা করে বিশ-পঁচিশটা টাকা দেবে।

উমাকান্ত বলে, পাবলিশারের সঙ্গে একটু চটাচটি চলছে। তাছাড়া, আপনি একটা বইয়ের কথা বলেছিলেন, তাই ভাবলাম—

এবার মুখ একটু গম্ভীর করে ধনদাস বলে, জানেন তো আমি ঠিক পাবলিশার নই, সুযোগ সুবিধা মতো দু-একখানা বই ছাপিয়ে বার করি। প্রেসের কী আর সেদিন আছে মশাই—বাজার বড়ো খারাপ। কাজ গেছে কমে—কাজ করিয়ে লোকে টাকা দিতে চায় না। কাজ কম থাকলে দু-একজন কম্পোজিটার বসে থাকবে—একটা বই ধরিয়ে দিলাম।

ধনদাস মাথা নাড়ে। বলে, বই বেচে কিছু হয় না—লোক বসে থাকবে, ওই লোকসানটা ঠেকানো। তা চুক্তি-টুক্তি কী রকম হবে ?

আপনি একটা অফার দিন ?

কপিরাইট দেবেন তো ?

উমাকান্ত চমকে ওঠে।

ইতিমধ্যে কোনো ফাঁকে ড্রয়ার খুলে একতাড়া দশ টাকার নোট ধনদাস টেবিলের উপরে রেখেছিল সে টের পায়নি। এবার নজর পড়ায় টাকার তাড়াটার দিকে চেয়ে সে ব্যাকুলভাবে বলে, না না, কপিরাইট দিতে পারব না !

এই তো মুশকিল করলেন। এত খরচ করে একটা বই ছেপে বার করব—হয়তো কাগজের খরচটাই উঠবে না। কপিরাইট পেলে তবু একটা সান্ত্বনা থাকে, লোকসান যাক, বইটা নিজের রইল। আশা থাকে, দু-একখানা করে বেচে বেচে হয়তো পাঁচ দশবছরে খরচটা উঠে আসতে পারে। পাঁচ-দশবছর পরে আপনার আরও নাম হলে বইটা কাটবে, দু-পয়সা লাভও হবে। কপিরাইট ছাড়া বই ছাপা—

মুখে একটা আপশোশের আওয়াজ করে ধনদাস।

তার সামনে টেবিলে তার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি--ও দিকে ধনদাসের সামনে একতাড়া নোট ! ওই নোট, কয়েকটা পেলে পুতুলকে বাঁচানো যাবে। সাদা কাগজের বুকে রাত জেগে দেহ ক্ষয় করে আঁকা হরফের কলঙ্কগুলি থেকে চোখ তুলে ধনদাসের মুখের দিকে চেয়ে মরিয়ার মতো উমাকান্ত জিজ্ঞাসা করে, কপিরাইট দিলে কত দেবেন ?

ধনদাস এক মুহূর্ত ভেবে দৃঢ়কণ্ঠে বলে, না, আপনি আমার কাগজের বাঁধা লেখক, আপনাকে ঠকাব না। ছোটো বইয়ে আমি পঞ্চাশ দিই, বড়ো বইয়ে পঁচাত্তর থেকে একশো। আজ পর্যন্ত কাউকে এর চেয়ে বেশি দিইনি, কিন্তু আপনার কথা আলাদা। আপনার এই বইটার জন্য দেড়শো দেব।

দেড়শো টাকায় একটা আড়াই টাকা তিন টাকা দামের বইয়ের কপিরাইট !

মাথা ঘুরে যায় উমাকান্তের।

এডিশন রাইট নিলে কত দেবেন ?

বললাম তো আপনাকে, এডিশন রাইট নিয়ে এই বাজারে বই ছেপে কী করব ?

উমাকান্ত একটু ভাবে, মিনিট দেড়েক। এত খেটে লেখা বইটা দেড়শো টাকায় ছেড়ে দিলে হয়তো এ যাত্রা বাঁচানো যাবে পুতুলকে কিন্তু ভবিষ্যতে সে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে কী অবলম্বন করে বাঁচবে ?

দু-একঘণ্টায় কী এসে যাবে ?

পুতুলের রক্তপাত হয়তো ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে স্বাভাবিক নিয়মে। পাড়ার দুজন পাঁচ আর সাত সন্তানের জননী এবং চার বছরের এক ছেলের একজন যুবতি মা, যেচে এসে ভার নিয়েছে, ওরা কি আর দু-চারঘণ্টা সামলে রাখতে পারবে না পুতুলের প্রাণটা ?

দেড়শো টাকায় বইটার কপিরাইট বেচে দেওয়ার চেয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে, পুতুলের সঙ্গে তার নিজেরও মরে যাওয়া অনেক ভালো।

উমাকান্ত নীরবে পাণ্ডুলিপির তাড়া হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালে ধনদাস একবার কাশে।

কাগজের পুরানো লেখক, বন্ধু মানুষ—২.:গে, পুরো দুশোই নিয়ে যান। বাকিটা কিন্তু তাড়াতাড়ি লিখে দেবেন।

উমাকান্ত পাকা চালবাজ ছ্যাঁচড়া ব্যাবসায়ীর মতো হেসে বলে, একটু ভেবে-চিন্তে দেখি ? চায়ের দোকানে বসে দু-এককাপ চা খেয়ে মনটা স্থির করে আসি ?

এখানেই বসুন না, চা আনিয়ে দিচ্ছি—যত কাপ ইচ্ছা খান, যত ইচ্ছা ভাবুন !

নাঃ, নিজে নিজে একটু ভেবেই আসি আমি। আপনি আছেন তো ?

তাব দিকে শ্যেনদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে হাই তুলে উদাসভাবে ধনদাস বলে, তিনটে পর্যন্ত আছি। তিনটের পর একবার বাইবে যেতে হবে, কখন ফিরব ঠিক নেই।

আমি তিনটের মধ্যেই ফিরব।

মহেশের টেবিলেব কথাবার্তা যেমন নিচু চাপা গলায কানে কানে না চললেই, কাঠের পার্টিশনের ও পাশে ধনদাসের কানে পৌঁছায়, তেমনি কাঠের পার্টিশনের ভিতবে ধনদাসেব সঙ্গে অন্য লোকের কথাও স্বাভাবিক গলার আওয়াজে হলে, মহেশেব খোলা টেবিল ঘিবে বসা মানুষগুলোর কানে পৌঁছায়।

একটু তফাতে সাজানো হরফের বাক্সের সামনে টুলে বসা কালাচাঁদেব কানেও খানিক খানিক যায়।

পাণ্ডুলিপি হাতে রাগ দুঃখ, ক্ষোভ, বেদনায, বিকৃত মুখ নিযে উমাকান্ত টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াতেই মানব নিচু গলায় বলে, আমরা সব শুনেছি—কপিরাইট দেবেন না।

উমাকান্তের নিচু গলাতে চরম হতাশার সুর ফোটে।

তোমার পুতুলদি মরবে ? কপিরাইটের মায়ায ছেলেমেয়ের মা-টাকে মবতে দেব ? দু এক জায়গায় চেষ্টা করে দেখি, নইলে ফিরে এসে, বেচে দিতেই হবে কপিরাইট।

মানব বলে, তিনটের আগে কিন্তু আসবেন না। আমবাও বেরোচ্ছি চেষ্টা কবে দেখতে।

তার সঙ্গেই মানব আর খালেক বাইরে যায়। বাস্তায নেমে খালেক বলে, ব্যাকুল হবেন না। তিনটে কেন, পাঁচটা পর্যন্ত আপনার জন্য ধন্না দিযে বসে থাকবে। কোথাও সুবিধা না হলে ঘড়িব কাঁটা ধরে তিনটের সময় আসবেন। তার আগেই আমবা ফিরে আসব।

উমাকান্ত বিরক্ত ও বিষণ্ণ হয়ে ভাবে, কী ইয়ার্কি এরা জুড়েছে তাব সঙ্গে ? তাব এমন বিপদের সময় ? কথা না কয়ে বড়ো রাস্তায় পৌঁছে সে চলতি ট্রামে উঠে পড়ে।

খালেক ওঠে পবের বাসে। মানব একটু দাঁড়িযে ভেবে নেয, কীভাবে টাকাব চেষ্টা কববে।

চেষ্টা কবা যায দুভাবে। আত্মীয়বন্ধুর কাছে গিযে। তাব প্রকাশকটিব কাছে গিযে।

প্রকাশকের কাছে গিয়ে বোধ হয় লাভ নেই।

তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে বইকী !

প্রকাশক তাব একজন—ছোটোখাটো দোকান, পুঁজি কম। তবু সাহস কবে নতুন লেখক তাব দু-খানা বই ছেপেছে এক বছবের মধ্যে—ধীরে সুস্থে তৃতীয় বইখানা ছাপছে।

বয়সও বেশি নয় তার প্রকাশক হেমাঙ্গের।

প্রুফ দেখছিল, মুখ তুলে বলে, আসুন, বসুন ! আজ তো কথা ছিল না আসাব !

একটা দবকাবে এসেছি। খুব সিবিয়াস ব্যাপাব—মন দিয়ে শুনুন।

উমাকান্তের বিপদের কথা সংক্ষেপে জানিয়ে মানব বলে, উপন্যাসটা নিয়ে নিন না ? এ সুযোগ ছাড়বেন না। রয়ালটির ব্যাপারে উনি খুব কড়া—বিপদটা সামলে দিন, ও সব আমি ঠিক করে দেব। রেট কম হবে, অল্প অল্প করে সুবিধামতো পাওনাটা দিলেই চলবে।

হেমাঙ্গ চড়া পাওয়ারেব চশমা খুলে চোখ মুছতে মুছতে বলে, সে তো বুঝলাম—এখুনি কত টাকা চাই ?

গোটা পঞ্চাশেক দিয়ে দিন। কাল পরশু শখানেক জোগাড় কবে দিলেই হবে। পারলে দ্বিধা করবেন না, একজন লেখক এ রকম বিপাকে পড়েছেন—

ওই তো বিপদ। নতুন লেখক আপনাদের না ধরে বড়োদের নিয়ে কারবার করলে, ড্রয়ার খুলে সব টাকাই ঝপ করে ফেলে দিতে পারতাম। পনেরো বিশ টাকা আছে কি না সন্দেহ।

তাই দিন—আমার হিসাবে।

হেমাঙ্গের কাছ থেকে পনেরোটা টাকা জোগাড় করে শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত কয়েকজন আত্মীয়বন্ধুর কাছে ছুটোছুটি করতে করতে ঘড়ির কাঁটা দুটো বাজার দিতে এগিয়ে যায়—জোগাড় হয় আর দশটা টাকা !

এরা সবাই সাধারণ অবস্থার আত্মীয়বন্ধু—তার অবস্থাও ওদের ভালো করেই জানা আছে। তাকে টাকা ধার দেওয়া মানেই টাকা জলে ফেলে দেওয়া।

অপমানে কান ঝাঁঝাঁ করেছে মানবের—তবু দুজন যে মুখভার করে পাঁচটা করে টাকা দিয়েছে সে টাকা হাত পেতে নিয়েছে।

আরও টাকা চাই। পুতুলদিকে বাঁচাতে হবেই। জীবনে কোনোদিন, যে দুজন বড়োলোক আপনজনের বাড়ির চৌকাঠ পার হবে না স্থির করেছিল, তাদের কাছে গিয়ে হাত পাতা ছাড়া উপায় নেই। মানব ভাবে, উপায় যখন নেই, মাথা হেঁট করে বুক ঠুকে কাকার দুয়ারেই গিয়ে দাঁড়ানো যাক।

কাকার বাড়ি গিয়ে মানব শোনে তারা সপরিবারে কাদের বাড়ি বেড়াতে গেছে, ফিরতে সন্ধ্যা উতরে যাবে। বাড়ি খালি নয় তাই বলে। ঝি চাকর রাঁধুনিরা আছে—আর আছে আশ্রিতা মনার মা এবং বিধবা সরমা।

রান্নাঘরের ভাঁড়ারের ভারটা মনার মা-র উপর। মনার মা আদর করে বসতে বলে।

একটি সন্দেশ দিয়ে খাতির জানিয়ে বলে, বাড়িতে এসে না খেয়ে ফিরে গেছেন শুনলে বড়োমা রাগ করবেন।

মানব ভাবে, এমনিই হয় বটে ! এমন আবহাওয়াই এই বাড়ির যে আশ্রিত মানুষেরও মন যায় কুঁকড়ে, তাদের আলমারির তাক ভরা খাবার থাকলেও তার কাকার জিনিস, প্রাণ ধরে তাকে একটির বেশি দিতে পারে না !

মনার মা র সহজ হিসাবটা সে বোঝে। একটি সন্দেশ খাইয়ে তাকে বিদেয় করলে কিছু খাবার নিজের ছেলেটাকে খাওয়াতে পারবে। খাবার কাকিমার গোনা গাঁথা, কাকিমা বাড়ি ফিরলে মনার মা বলতে পারবে, মানব এসেছিল বলে খাবার খরচ হয়েছে।

সে হেসে বলে, কী খাব ? কিছুই তো খেতে দিলে না। একটা সন্দেশ লোকে খায় নাকি ?

মনার মা-কে কথা বলার সময় না দিয়ে সরমা তাড়াতাড়ি প্লেটে সাজিয়ে এনে দেয় কয়েক রকম খাবার।

মনার মা-কে ধমক দিয়ে বলে, তোমার বাছা কাণ্ডজ্ঞান নেই—বুঝেও কিছু বুঝবে না। বাবুর ভাইপো এয়েছেন—একটা সন্দেশ দিয়ে আপ্যায়িত করছ !

তুই মাগি বড়ো বাড়াবাড়ি জুড়েছিস। খেদাতে হবে।

তুই খেদাবি মোকে ? ধন্যিধন্যি করব সেই দিন তোকে !

নিজের গালে সশব্দে চড় মেরে সরমা বিকৃত অস্বাভাবিক আওয়াজে হেসে ওঠে !

সম্পর্কের হিসাব ধরলে এরা তারও ঝি-রাঁধুনি। এক ধমকে এদের ঠান্ডা করে দেবার অধিকার তার আছে।

কিন্তু কীসের জোরে সে খাটাবে তার অধিকার ?

তাকে আদর-আপ্যায়ন করার অধিকার এদের হাতে ছেড়ে দিয়ে যে আপনজনেরা বেড়াতে গেছে, তাদের কাছে তার যে কতখানি কদর কিছুই তো এদের অজানা নয় !

ধমক কি দেওয়া যায় এদের ? মানব শুধু বলে, না গো না, আমি কিছু খাব না।

সরমা থমকে যায়। মনার মা ভড়কে যায়।

খাবেন না ? কিছু খাবেন না ? বড়োমা শুনলে যে—

মানব মিথ্যা কথা বলে, পেটে জায়গা নেই। এইমাত্র হোটেলে ভোজ খেয়ে এলাম।

সরমা আর মনার মা, দুজনেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। বাঁচা গেল। তাদের কেউ দোষী করতে পারবে না।

বাকি থাকে দিদি।

কিন্তু মুশকিল এই যে, ভগিনীপতি ইন্দ্রজিৎ কোনোদিন তাকে দুচোখে দেখতে পারে না !

মাধবীর বিয়ের সময় সে ছিল কলেজের নীচের ক্লাসের ছাত্র, তখন থেকেই তার উপর ইন্দ্রজিতের অন্ধ বিদ্বেষ।

মাঝে মাঝে দু-চারদিন দিদির বাড়ি বেড়াতে যেত।

ইন্দ্রজিৎ চশমার ফাঁকে আক্রোশভরা চোখে তার দিকে তাকাত, আর তার দিকে তাকিয়েই তাকাত মাধবীর দিকে। সে দৃষ্টির মানে খুব সোজা—কেন যে তোমার বখাটে বেয়াদপ ভাইটা না ডাকলেও আমার বাড়িতে আমাকে জ্বালাতে আসে !

অত্যন্ত নীতিবাগীশ, নীরস এবং কর্তৃত্বপ্রিয় মানুষ। সে চায় যে সকলে তাকে মেনে চলুক, ভয় করুক—একটু ভক্তিও করুক। শালা-ভগিনীপতির সম্পর্ক হলেও মানব যে তার সঙ্গে ইয়ার্কি দেবে, তার হুকুম গ্রাহ্য করবে না—এটা সে একেবারেই বরদাস্ত করতে পারত না।

আজকাল তো কথাই নেই—মানব এখন তার কাছে আত্মীয়-বিতাড়িত লোফাব মাত্র !

ইন্দ্রজিৎ বেতনে ও অন্যান্য প্রকাশ্য দুর্নীতিহীন পে-বিল সই করে মাইনে আদায় করে হাজার দুই টাকা।

এক পাই ঘুষ নেয় না।

অনেক রকম সুযোগ-সুবিধা থাকলেও জীবনে কখনও আলগা পয়সা রোজগারের কথা ভাবতেও পারেনি।

ঘুষ নেওয়ার জন্য একবার দুজন অধীনস্থ অফিসারের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছিল। শাস্তিটা অবশ্য পরে দাঁড়িয়েছিল সামান্য ব্যাপারে, মৌখিক একটা বোঝাপড়ায় যে, তিন বছর ওদের প্রমোশন বন্ধ থাকবে।

বাধ্য হয়ে এই নামমাত্র শাস্তি দিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হওয়ায় রাগের যে জ্বালা হয়েছিল, ইন্দ্রজিতের সারাজীবনে সেটা বোধ হয় জুড়োবে না !

ইন্দ্রজিৎ দাবি করেছিল যে ওদের জেলে দেওয়া হোক।

ওরা গিয়ে ধন্না দিয়েছিল ইন্দ্রজিতের ভারিক্কি রীতিনীতি ও সম্ভ্রান্ত জীবনযাপনের কলকাঠি ছিল যে কর্তাব্যক্তিটি, তার কাছে।

কর্তাব্যক্তিটি যেচে নিমন্ত্রণ নিয়ে এসেছিল ইন্দ্রজিতের বাড়িতে—এক কাপ চা খেতে। ইন্দ্রজিৎও বুঝেছিল ব্যাপারটা সহজ নয়। সেও বাড়িতে মহাসমারোহে আয়োজন করেছিল কর্তাব্যক্তিটির সংবর্ধনার।

মানবকে হুকুম দিয়েছিল, দশ টাকার ফুল কিনে আনো দিকি হকমার্কেট থেকে।

আমি পারব না। ভদ্রলোক আপনার চাকরির হর্তাকর্তা হতে পারেন, আমার কে ? মানুষ-পূজার ফুল আনা আমার দ্বারা হবে না !

ধৈর্য হারিয়ে গর্জন করে উঠেছিল ইন্দ্রজিৎ, ভুলে গিয়েছিল যে মানব দুদিনের জন্য বোনের বাড়ি বেড়াতে এসেছে—তাদের আপ্যায়নটাই তার প্রাপ্য—ধমক নয় !

মানবও গর্জে উঠেছিল, কী বললেন ? এখুনি আমি চলে যাচ্ছি আপনার বাড়ি থেকে।

আত্মীয়স্বজনের কাছে মানবের কদর তখন ফুরিয়ে যায়নি। আত্মীয়-বাহিনীর সঙ্গে তখনও সে এক সামাজিক সূত্রে গাঁথা। ইন্দ্রজিৎ, শালাকে তাড়িয়ে দিয়েছে ! কী সর্বনাশ, সবাই বলবে কী ?

মাধবী হাল ধরে স্বামীকে কড়া সুরে ধমক দিয়ে বলেছিল, কী পাগলামি করছ ছেলেমানুষের সঙ্গে ? ফুল আনাবার আর লোক নেই ?

অনেক বুঝিয়ে ঠান্ডা করেছিল মানবের রাগ।

ইন্দ্রজিৎ পছন্দ না করুক, ভাই বাড়িতে এলে আগে মাধবীর বড়ো আনন্দ হত। মানব, কাকার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর সে বাড়িতে গেলে মাধবীও খুশি হতে সাহস পায় না।

শুধু তাদের মানে না তা নয়, কোথায় থাকে কী করে, কিছুই জানায় না দু-চারমাস।

হঠাৎ একদিন এসে বলে, আমায় কিছু টাকা দাও।

এমনভাবে বলে, যেন মহাজন খাতকের কাছে বাকি সুদ দাবি করছে। বড়োলোকেব বউ, বড়ো বোন, তার কাছে দরকারের সময় টাকা চাইবার অধিকার তার আছে—এ অধিকার না মানতে চাও, দিদিত্বের অধিকারে ইস্তফা দাও, চুকিয়ে দাও সম্পর্ক !

এই নিয়েই কয়েকবার বেশ খানিকটা ঠোকাটুকি হয়ে গিয়েছিল ইন্দ্রজিৎ আর মাধবীর মধ্যে। শেষবার লেগেছিল তারই সামনে।

ইন্দ্রজিৎ মন্তব্য করেছিল, তোমাব লোফার ভাইকে দেওয়ার জন্য আমি এত খেটে টাকা রোজগার করি না !

মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল মাধবীব।

রেগে বলেছিল, তোমাব কত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, কতভাবে সাহায্য চাইতে আসে হিসেব রাখো ? কতজন কতভাবে কত সাহায্য আদায় করে নিয়ে গেছে হিসেব রাখো ? আমার ভাইটা বিগড়ে গেছে সত্যি, তবু আমার ভাই তো ! বিগড়ে যাক আর যাই হোক, ন-মাসে ছ-মাসে বিশ-পঁচিশটা টাকা চায়। তুমি মাইনে পাও দুহাজার টাকা। আমার ভাইকে আমি পঁচিশটা টাকা দেব—তোমাব তাতে আপত্তি কেন ?

বললাম তো আপত্তি কেন ! লোফারদের দেওয়ার জন্য আমি খেটে পয়সা রোজগার করি না।

মানবকে বিশেষ বিচলিত মনে হয়নি।

সে একটু ব্যঙ্গের সুরেই বলেছিল, একটা ভুল করছেন আপনি, আপনাদের মতো নীতিবাগীশ লোকেরা এ রকম সোজা কথা গুলিয়ে ফেলেন। আমি আপনার কাছে আসি না, আসি আমার দিদির কাছে। আপনার টাকায় দিদির অধিকার আছে—দিদি আমায় নিজের টাকা দেয়—আপনার টাকা দেয় না।

একটু হেসে আবাব বলেছিল, আপনি ছোটোলোক। স্ত্রীর কাছে তাব ভাই এলে তাকে অপমান করা যে স্ত্রীকেই অপমান করা—এটুকু জ্ঞানও আপনার নেই। আপনার অপমান আমি গায়ে মাখব না।

ইন্দ্রজিৎ কটমট করে তার দিকে তাকিয়েছিল।

মানব হাসিমুখেই মাধবীকে বলেছিল, তুই কী বলিস দিদি ? আর আসব না তো ?

মাধবী চুপ করেছিল।

তারপর আর আসেনি মানব। মাধবীর কাছে ছোটোভাইয়ের অধিকারের দাবি চিরদিনের জন্য ত্যাগ করেছে। দেখা করার জন্য মাধবী দুবার চিঠি লিখেছে, মানব জবাবও দেয়নি।

কিন্তু এ সব কথা ভাবলে কি চলবে আজ ? না, নিজের মান-অপমানের প্রশ্ন আজ বড়ো করা যাবে না।

মানব ভাগ্য মানে না। কিন্তু ইন্দ্রজিতেব বাড়ির সামনে খান-পনেরো মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার মনে হয়, যারা ভাগ্য মানে আর অনিয়ম মেনে চলে, তারা যেন এতগুলি মোটরের নীরব হর্ন আর নীরব ইঞ্জিনের ভাষায় স্পষ্ট ঘোষণা করছে—দিদির বাড়ি হোক, গেট পার হয়ো না ! দিদিকে না জানিয়ে আজকের দিনে এ সময় তোমার আসা উচিত হয়নি। দিদি রেগে যাবে।

খান পনেরো নতুন পুরানো প্রাইভেট গাড়ি তো শুধু নয়, ট্যাক্সিও কত অতিথি পৌঁছে দিয়েছে ঠিক নেই।

ট্রামে-বাসে চেপে বুদ্ধির কারবারি নরনারীও নিশ্চয় এসেছে কয়েকজন।

মোটর চেপে এসেছে যে জ্ঞানী-বিজ্ঞানী তাদেব সঙ্গে, সমান ভাবের চেযে বরং বেশি তেজেব সঙ্গে সূক্ষ্ম বিষয়ে তর্ক ক-ার অধিকার আছে ট্রাম-বাসে চেপে আসা জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের।

তর্কের স্থূল বিষয়ে তাদের হার মেনে নেওয়াটাই নিয়ম।

সূক্ষ্ম বিষয়ে সতেজে তর্ক করে স্থূল বিষয়ে হার মেনে নেওয়াটা তারাও যেন সুখেব সঙ্গে, আরামের সঙ্গে, মেনে নেয়।

এ রকম কত আসরে মানব অংশ নিযেছে, মজা দেখেছে, মজা করেছে !

দিদি রেগে টং হয়ে যেত তার ব্যবহারে।

এই বেশে এই চেহারা নিয়ে আজ এ সময় সমাগত মার্জিত ভদ্র অতিথিদের মধ্যে তাকে হাজির হতে দেখে মাধবীর মূর্চ্ছা যাওয়া আশ্চর্য নয় !

কিন্তু এ সব চিন্তার অবসর কই ? প্রতিটি মুহূর্ত পুতুলকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে মরণের দিকে—শুধু টাকা থাকলেই যে-মরণকে অনায়াসে ঠেকানো যায় !

আর দ্বিধা না করে মানব ভিতরে যায়। যেখানে চোখ ঝলসানো বেশ আর পরিবেশের মধ্যে নারী ও পুরুষমানুষগুলিকে চেনাই যাচ্ছে না মানুষ বলে !

ইন্দ্রজিৎ কথা বলছিল অদ্ভুত রকমের, ভেলভেটেব মতো দেখতে এবং নির্মান্বিত প্রায় সকলেরই অজানা বস্তু দিয়ে তৈরি, স্যুটপরা বিদেশি মানুষটার সঙ্গে। তার দিকে এক নজর তাকিয়ে মাধবীর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে ইন্দ্রজিৎ মুখ ফিরিয়ে নেয়।

একটু যে চোখের ইশারা করবে তাকে সে সুযোগও মাধবী পায না।

এই বেশে এইভাবে তার ভাই যে আজ এখানে হাজির হয়েছে, এ দুর্ঘটনা সে সামলে নেবে,—ইন্দ্রজিতের ভাবনা নেই—চোখের ইশারায় এটুকু জানিয়ে দেবার সুযোগও ইন্দ্রজিৎ তাকে দেয় না।

মানবকে এভাবে এসে দাঁড়াতে দেখে সে যে কী রকম আঁতকে উঠেছিল তাও ইন্দ্রজিতের চোখে পড়েনি।

তিন-চারদিন চোটপাট চলবেই। মারধোর কববে না, কিন্তু কথা আর ব্যবহারেব ধারালো অস্ত্রে তার হৃদয়মন কুচিকুচি করে কাটবে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য এ চিন্তাও মনে উঁকি দিয়ে যায় মাধবীর যে চাকর দরোয়ান ডেকে চোর বলে ধরিয়ে দেবে মানবকে !

মারতে মারতে আধমরা করে ওরা যাতে তাকে থানায় গিয়ে জমা দিয়ে আসতে পারে সে ব্যবস্থা করবে !

ইন্দ্রজিৎ খুশি হবে। বেশি রকম খুশি হবে। আজ রাত্রেই হয়তো তাকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দ করতে বার হবে রোমাঞ্চকর আনন্দের কোনো কেন্দ্রে, হয়তো কিনে দেবে নতুন রকম শাড়িটা কিংবা গয়নাটা !

কিন্তু পারা যায় কি? নিজের ভাইকে স্বামীর দারোয়ান চাকর দিয়ে মেরে আধমরা করিয়ে দিয়ে থানায় পাঠাতে? ইন্দ্রজিতের আগামী কয়েকদিনের মার্জিত কিন্তু মারাত্মক আক্রমণ ঠেকাবার জন্য, তাকে খুশি করার জন্য?

মাধবী তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে ক্ষোভের সঙ্গে বলে, তুমি এমন দিনে এলে, আর তুমি দিন পেলে না আসবার? তুমি জানো না ওর আজ জন্মদিন?

মানব হেসে বলে, কী করে জানব? নেমন্তন্ন করেছ? শ-খানেক লোক এসেছে, এরা সবাই তো বন্ধুবান্ধব আত্মীয় নয়? বাইরের কত লোক নেমন্তন্ন পেল—আমি ভাই হয়ে বঞ্চিত হলাম। আমি সব জানি। গরিবের মেয়ে বড়োলোকের টাকার স্বাদ পেয়েছ—জুতো মারা পর্যন্ত তুমি সয়ে যাচ্ছ। জুতো সইতে হয় বলেই তো ভাইকে আড়ালে ডেকে চুপিচুপি কথা কইতে হয়।

কী করব বলো? ও যে বোঝে না।

বোঝালেই বোঝে।

বোঝে না তুই নিজেই তো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খেপিয়ে দিয়েছিস ওনাকে। একটু যদি ভালো কাপড় জামা পরে আসতিস, দাড়িটা কামিয়ে আসতিস, কাছে গিয়ে নম্রভাবে মিষ্টি করে কথা বলতে পারতিস–

হঠাৎ যেন অন্ধকারে আশার আলো দেখতে পেয়ে আকস্মিক উত্তেজনায় মাধবীর হাত পা কাঁপতে থাকে।

[illegible] না তুই? চ তোকে খুব দামি স্যুট পরিয়ে দিচ্ছি। স্যুটটা পরে চুলটা একটু আঁচড়ে এসে সকলের সঙ্গে মেশ না তুই? আগে শুধু ওনার কাছে গিয়ে খুব নম্রভাবে মিষ্টি করে বলবি-

পুতুলদি ওদিকে পলেপলে মরছে। নিজের দিদি এদিকে জুড়েছে বায়না। মানব ভূমিকা করে না। সোজাসুজি বলে, আমায় কিছু টাকা দে দিদি।

টাকা? ভাইকে টাকা দিয়েছে জানলেই তো ইন্দ্রজিৎ আরও রেগে আগুন হয়ে যাবে। তার পাঁচশো টাকার শাড়িতে, দেড়হাজার টাকার গয়নাতে ইন্দ্রজিতের শুধু খেলিয়ে খেলিয়ে দেরি করার আপত্তি—ভাইকে বিশ-পঁচিশটা টাকা দিলেই ইন্দ্রজিৎ খেপে যায়।

মানব আবার বলে, আমায় শ খানেক টাকা দিতেই হবে।

মাধবী মিষ্টিসুরে বলে, আমার হাতে পাঁচ দশ টাকার বেশি থাকে না জানিস তো? কী জন্য চাইছি জানালে উনি অবশ্য টাকা দেন।

কিছু একটা বানিয়ে বলে চেয়ে আনো।

বিশ্বাস করবে? অত হাবা নাকি! তুই এলি অমনি আমার অন্য ব্যাপারে টাকার দরকার পড়ল? চেয়ে রেখে দেব—ক দিন বাদে এসে নিয়ে যাস।

আমার এখুনি দরকার। যা আছে তাই দিয়ে দাও। আমার নিজের জন্য নয়। ওই যে লেখক আছেন উমাকান্তবাবু?—ওঁর স্ত্রী বিনা চিকিৎসায় মরে যাচ্ছে!

মরে যাচ্ছে?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মাধবী পনেরোটা টাকা এনে দেয়। একগাছি সোনার চুড়ি তার হাতে দিয়ে বলে, টাকা আর নেই—এটা বেচে দিবি যা।

প্রায় চারটের সময় উমাকান্ত প্রেসে ফিরতেই মহেশ বলে, দেরি করলেন কেন এত? মানব খালেকেরা কিছু টাকা জোগাড় করে এনে আপনার জন্য তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করল—তারপর আপনার বাড়ির দিকে ছুটে গেছে।

উমাকান্তের মুখে কালি পড়ে গেছে, চোখ রাঙা।

সূর্যের কিরণ রাত্রিকে নাশ করেছিল ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ।

এখনও সূর্য অস্ত যায়নি।

ক-দিন আগের কথা ! তার সন্তানকে জন্ম দিতে পুতুল যেদিন সকালে রক্তপাত শুরু করেছিল ! পুতুলের সঙ্গে ঝগড়া করে যেদিন সে গিয়েছিল বাজার আর রেশন আনতে, বাড়ি ফিরে নিজের চেষ্টাতেই বন্ধ করেছিল পুতুলের রক্তপাত, আর মনে মনে হাজারবার আপশোশ করেছিল যে, রেশন না আনলে অন্তত ডাক্তার ডাকার পয়সাটা হাতে থাকত !

হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে পুতুল আবার বেসামাল হবার পর ক-ঘণ্টাই বা কেটেছে ? ক-ঘণ্টার মধ্যে এ রকম হয়ে যেতে পারে একটা সুস্থ লোকের চেহারা !

রক্তবর্ণ চোখ মেলে উমাকান্ত মহেশের দিকে তাকায়।

ক্ষয়ে যাওয়া ফেলনা ঃবফের সিসা গলিয়ে তৈরি করা কাগজ-চাপাটা তুলে, মহেশের মাথাটা ফাটিয়ে দেখার ঝোঁক সামলাতে এমন মনের জোর খাটাতে হয় তার !

কথা না বলে সে ধনদাসের কাঠের কুঠরিতে যায়।

পাণ্ডুলিপিটা টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, দু-শো টাকাই দিন !

ধনদাস গম্ভীর মুখে বলে, দেখুন, ভেবে-চিন্তে দেখলাম, দু-শো পারব না। দেড়শো নিয়ে যদি পারেন তো দিয়ে যান—নইলে কাজ নেই।

তাই দিন।

তৈরি ছিল টাইপ করা স্ট্যাম্প-মারা চুক্তিপত্র।

ধনদাস জানত সে ফিরে আসবে !

পনেরোটি দশ টাকার নোট গুণে দেয় ধনদাস।

নোটগুলি হাতে পেয়েই উমাকান্ত পকেটে পুরতে যাচ্ছে দেখে বলে, না না, গুনে নিন--টাকা পয়সার ব্যাপারে ছেলেমানুষি করবেন না।

দেড়শো টাকা পকেটে নিয়ে ঘরে যখন সে ফেরে, শীতের সূর্য পশ্চিম আকাশে আড়ালে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

বাড়ির সামনের সিঁড়িতে দেড়বছরের বাচ্চা মেয়েটাকে কোলে নিয়ে মানব, আব তিন বছবের ছেলেটাকে পাশে নিয়ে খালেক বসেছিল।

ভেতরে একটা ঘরে আট বৎসরের মেয়েটা যেন কান্নার সুরে সুরে গান গাইছে।

সবই বুঝতে পারে।

তবু উমাকান্ত যেন জীবন মরণের ব্যাপারটাকেই ঋষির মতো উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করে, মরে গেছে, না ? ভালোই হয়েছে—মরে বেঁচেছে।

মানবের চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল কি ঝরে পড়ল, তার কোলে শোয়ানো পুতুলের গর্ভে জন্মানো তার বাচ্চাটার গায়ে ?

খালেক কি চোখ মুছল ছেঁড়া শার্টটার হাতায় ? পুতুলের মরণে ওদের চোখে জল এল, তার চোখটা শুধুই জ্বালা করছে কেন ?

চোখ মুছে খালেক ক্ষোভের সুরে বলে, কিছুতে বাঁচাতে পারা গেল না।

মানব বলে, আপনার ভরসায় না থেকেই ডাক্তার আনলাম—ইস্ ! আর দুঘণ্টা আগে যদি ডাক্তার আনা যেত ! ডাক্তারবাবু যাবার সময় বলে গেলেন, আপনাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত।

মানব জোরে শ্বাস টানে। বলে, ফাঁসি হওয়া উচিত আমার। আমিই আপনাকে ধনদাসের টাকাটা নিতে বারণ করলাম। টাকাটা নিয়ে তাড়াতাড়ি এলে—

উমাকান্ত হাঁফ টানার মতো কয়েকবার নিশ্বাস নেয়, একটা অদ্ভুত বিকৃত আওয়াজে বলে, তোমার কোনো দোষ নেই। আমি নিজেই তো অন্য চেষ্টা করতে বেরোলাম।

উমাকান্ত চোখ বোজে।

হঠাৎ সে যেন পাথরের মূর্তি হয়ে যায়, তারপর কাটা গাছেব মতো হঠাৎ আছড়ে পড়ে যায়।

সিঁড়ির কোনায় লেগে কেটে গিয়ে, মাথা থেকে গলগল করে রক্ত বার হয়।

কে জানে ফুটো হয়েছে না একেবারে ফেটে গেছে তার মাথার খুলিটা !

মানব গলা চড়িয়ে ডাক দিতেই একজন পক্ককেশা বিধবা এবং একজন প্রৌঢ়বয়সি সধবা তাড়াতাড়ি বাইরে আসে।

মানব বলে, বাচ্চা দুটোকে সামলান। তোর রুমালটা দে তো খালেক !

রুমালটা ভাঁজ করে উমাকান্তের মাথার ক্ষতয় বসিয়ে, পরনের কাপড়ের আঁচল থেকে ব্যান্ডেজের মতো ফালি ছিঁড়ে, মাথায় আনাড়ির মতো পেঁচিয়ে মানব বলে, অ্যাম্বুলেন্স ডেকে এনে ব্যবস্থা করতে করতে পুতুলদির মতো ফিনিস হয়ে যাবে। আয় খালেক, ধরাধরি করে ডাক্তার দাসের ডিসপেনসারিতে নিয়ে যাই।

ডাক্তার দাসের পক্ককেশী বিধবা মা চেঁচিয়ে বলে, তোদের ডাক্তার দাস যে সাত দিন জ্বরে শয্যাগত রে !

মানব বলে, কম্পাউন্ডার সলিলবাবু আছেন তো ডিসপেনসারিতে ? শুধু রক্তপাত ঠেকানো— উনি সেটা পারবেন। তারপর দেখা যাবে।

এদিকে ধনদাস মহেশকে কামবায় ডেকে পাঠায়।

এটা সে করে কদাচিৎ।

কিছু জানতে চাইলে, কোনো বিষয়ে নির্দেশ অর্থাৎ হুকুম দিতে চাইলে, নিজেই সে মহেশের কাছে যায়।

উদ্দেশ্যহীনভাবে প্রেসের এদিক-ওদিক একটু ঘুরে দেখে বেরিয়ে যেন, খেয়ালের বশেই মহেশের টেবিলে একটা হাত রেখে দাঁড়ায়।

সে এসে দাঁড়ালে মহেশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় না, বলে প্রথম প্রথম তার রাগ হত ! কিন্তু ফাঁকা রাগের ধার সে ধারে না।

মানুষটা বিদ্বান বুদ্ধিমান সাহিত্য-রসিক, সাধারণ মাইনে-কবা কর্মচারীর মতো মনিব সামনে এলে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখানো তার জানাও নেই, ধাতেও নেই। মনিব হলেও এটুকু বুঝতে হবে বইকী, মানতে হবে বইকী !

মহেশ এসে বসলে ধনদাস বলে, উমাবাবুর কানে কানে আপনি কী বলছিলেন ?

মহেশ আশ্চর্য হয়ে যায়। এই কুঠুরির আড়ালে থেকে ধনদাস শুধু তাদের কথাবার্তাই শোনে না, আড়াল থেকে লুকিয়ে কে কী করছে না করছে তা জানবার ব্যবস্থাও তার আছে !

মুখ কিন্তু গম্ভীর হয়ে যায় মহেশের।

আমার ব্যক্তিগত কথা। গোপনীয় কথা।

ধনদাস কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলে, উমাবাবুর কানে কানে কী বলেছেন শুনবার জন্য আপনাকে ঠিক ডাকিনি। আপনার নিজের ব্যাপার কার কানে কী বলবেন না বলবেন, তা দিয়ে আমার দরকার কী ? আপনি গুণী লোক, আপনার কদর আমি জানি, কোনো রকম অপমানজনক ব্যবহার কোনোদিন পেয়েছেন আমার কাছে ?

তারপর সে অমায়িকভাবে একটু হাসে।—তবে কী জানেন, একটা কথা আপনাকে বলে রাখি—আমার এখানে কাজ করলে আমার স্বার্থটা সব সময় দেখতে হবে। আপনি তা দ্যাখেন, তবু একবার জানিয়ে রাখলাম। এ বিষয়ে আমি খুব কড়া।

এর নাম ফার্স্ট ওয়ার্নিং !

মহেশ সায় দিয়ে বলে, সে তো বটেই, এ কোনো দোষের কথা নয়। যার চাকরি করব তার স্বার্থহানি ঘটাব, এটা কে বরদাস্ত করবে ?

অনেকে এই সোজা কথাটা বোঝেন না কিনা, সেটাই বড়ো আপশোশের কথা হয়ে দাঁড়ায়। কালাচাঁদ কাজ ভালোই করছে, না ?

ওর সাথে পাল্লা দেবার মতো কেউ নেই আপনার প্রেসে। তবে মানুষটা একটু খেয়ালি ধরনের। পাঁচ-দশমিনিট, হয়তো চুপচাপ বসেই রইল কাজ বন্ধ করে। আমি কিছু বলি না - বলে লাভ হয় না। হাত যখন লাগায়—আধঘণ্টা সুবিধে দিয়েও—মধুভূষণ এদের ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়।

৪

হোঁচট খেয়ে আছড়ে পড়ে মহেশের কোমরে চোট লেগেছে ভীষণ।

বাপ রে ! মা রে !—বলে কাতরেও উঠেছে কয়েকবার।

তারপর খানিকক্ষণ গুম খেয়ে থেকে যেন জগতের সব রকম গভীরতম শোকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অদ্ভুত রকম করুণ কণ্ঠে বলে : হায় রে কপাল সরকারি রেশন, পয়সা দিয়ে চুরি করতে যাব—নিজের ভাঙা ঘরের পচা চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে আছাড় খেয়ে কোমর ভাঙলাম !

মলয়া ছুটে এল। তাকে জড়িয়ে ধরে তুলবার চেষ্টাটা, তার ভাঙা কোমরে ব্যথা না দিয়ে কীভাবে করবে ঠাহর পাচ্ছিল না—আছাড় খাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে তার ইয়ার্কি দেওয়ার কথা শুনে রেগে গিয়ে ঝংকার দিয়ে ওঠে, রসিকতাটা নয় পাঁচ মিনিট পরেই শুরু করতে ? নিজের ভাঙা কোমর নিয়েও তুমি ইয়ার্কি দিয়ে রসিকতা করতে পারো— ধন্য তুমি ! সত্যি কি ভেঙেছে কোমরটা ? না এমনি চোট লেগেছে ?

বেশ মানুষ তুমি— দিব্যি আছ ! সরকারি রেশন আনতে যেতে, হোঁচট খেয়ে আছাড় খেলে কারও মাথা আস্ত থাকে ? বিধবা যদি না হতে চাও তো চটপট ডাক্তার ডাকাও ।

কী আবোল-তাবোল কথা বলছ ? কোমরে চোট লেগেছে বললে, আবার বলছ মাথায় চোট লেগেছে !

কোমরে চোট লাগার ব্যথাটা কোথায় লাগে গো ? কোমরে ব্যথা লাগে, চোট পায় মাথাটা। কোমরের ব্যথাবোধ আছে নাকি ? একটু রসিয়ে বললাম ভাঙা কোমরের ব্যথায় মাথাটা ফেটে যাচ্ছে—মোটে বুঝলে না তুমি রসিকতাটা !

তোমার রসিকতা বুঝবার সাধ্য আমার নেই। আছাড় খেয়ে কোমর ভাঙার ব্যথা নিয়ে যে রসিকতা চালাতে পারে -তার রসিকতা বুঝবার মতো মাথা বিধাতা আমায় দেয়নি !—

বুড়ো বয়সে পা পিছলে পড়ে গিয়ে কোমরে চোট লাগলে দিন তিনেক আপিস কামাই করা যায়।

কাঁদাকাটা করে চিঠি পাঠিয়ে নিরুপায়তা জানিয়ে আরও দুদিন ব্যথিত কোমরটাকে বিশ্রাম দেওয়া যায়।

তারপরেই আসে ভদ্রতাপূর্ণ চরমপত্র ! জমাদারের বদলে কালাচাঁদের হাতে পাঠানো হয়।

পত্রের মর্মকথা এই মহেশের কোমর ভেঙে গেছে জেনে, দু-একমাসের মধ্যে মহেশ বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না জেনে, ধনদাস বড়োই দুঃখিত হয়েছে। সে আশা করে শীঘ্রই মহেশ সেরে উঠবে। কিন্তু রস সাহিত্য কাগজটা তো বার করতে হবে নির্দিষ্ট দিনে ? দু তিনমাস ছুটি নিয়ে মহেশ কোমরের ব্যথা সারাতে চাইলে কি ধনদাস আপত্তি করবে ? আজ দশ বছরের বেশি মহেশ তার হয়ে কাজ করছে ! মহেশ তো অনায়াসেই জানিয়ে দিতে পারে যে অন্য কাউকে দিয়ে এক সংখ্যা কী দু সংখ্যা রস সাহিত্য বার করা হোক, তারপর মহেশ সুস্থ হয়ে গিয়ে দম্ভ নেবে।

মহেশ বিছানায় শুয়ে জবাব লেখে, কোমরের ব্যথা অনেক কম। একবার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, তাই দেরি হবে। আজকেই মহেশ প্রেসে যাবে।

মলয়া একেবারে যেন নেতিয়ে গিয়ে বলে, পারবে যেতে ? উঠেই তো দাঁড়াতে পারছ না !

আজ কি আর সত্যি সত্যি যার বে পাগলি ? ওটা হল জানিয়ে দেবার কায়দা যে ঠিক সময়ে গিয়ে কাগজ আমি ঠিক বার করে দেব।

মলয়া ঝংকার দিয়ে বলে, সবার সাথেই তোমার রসিকতা।

কাতরানি থেমেছে কিন্তু মুখ দেখেই টের পাওয়া যায় যে মহেশের কোমরের ব্যথা বেশ জোরালো।

তবু সে রসিকতা করে জবাব দেয়, রস যে আমার বেশি গো – রস নিয়েই মজে আছি নইলে রস সাহিত্যের সম্পাদক হয়ে এতকাল চালাতে পারতাম ?

যেমন কাগজ তোমার রস সাহিত্য তেমনি তুমি সম্পাদক !

ভালোমন্দ সব রকম কথায় ঝংকার দিয়ে উঠুক, উঠতে বসতে কলহ করুক, ছোটোবড়ো সব ব্যাপার মহেশের হালকা রসিকতায় উড়িয়ে দেবার কায়দার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সব সময় সব ব্যাপারে সব কথায় খ্যাঁচখ্যাঁচ করার কায়দায় লড়াই চালাক-- মলয়া উদয়াস্ত খাটে।

উদয় থেকে শুরু করে সূর্য অস্ত যাওয়ার পরেও খাটে অনেক রাত্রি পর্যন্ত।

কারণে তো খাটেই, অকারণেও খাটে।

যে কাজ সংক্ষেপে সারা যায় সেই কাজ সবিস্তারে করা তার স্বভাব, হাতে কাজ না থাকলে তার হাপ ধরে যায়। মেয়েরা কোনো কাজে সাহায্য করতে এলে সে ঝংকার দিয়ে ওঠে, ফাকা দরদ দেখিয়ে আমার ব্যাপারে তোরা মাথা গলাবি না বলে দিচ্ছি !

আহত মহেশের সেবাও করে মরিয়া হয়ে। সংসারের কাজ কমিয়ে বাকি সময় সে অবিরাম তার কোমরে সেঁক আর মালিশ চালিয়ে যায়, তাড়াতাড়ি মহেশকে সারিয়ে তুলে আপিসে গিয়ে কাজ করে মাস মাইনে আনার মতো জোরদার করে তাতে সে যেন কোমর বেঁধেছে—প্রাণ দিয়ে সে সামলাবে স্বামী আর সংসারকে।

মেয়েদের সংসারের কোনো কাজে নাক গলাতেও দেয় না, মেয়েদের দিকে ফিরে তাকাবার সময়ও মলয়া পায় না।

দুই মেয়ে, চন্দ্রা এবং মন্দ্রা।

মন্দ্র থেকে মন্দ্রা চন্দ্রাই জোর করে নিজের নামে মিলিয়ে নাম রেখেছিল আদরের বোনটির।

মহেশ বলেছিল, মন্দ্র কথাটার মানে জানিস না খুকু ? মেঘের গম্ভীর ধ্বনি, মৃদঙ্গ। অভিধান না মানিস সে জন্য নয়– সবু গলায় এমন চেঁচিয়ে কাঁদে, এমন খিলখিল করে হাসে, ওর তুই মন্দ্রা নাম রাখলি ?

আমার নামের সঙ্গে মিলেছে, একটা মানে আন্দাজ করা যায়, তাই ঢের। তুমি বলো না লাগসই অন্য একটা নাম ?

মহেশ দু-একটা নাম বলেছিল কিন্তু চন্দ্রার পছন্দ হযনি ! চন্দ্রার পর আর মেয়ে জন্মাবে না, আর নামকরণ করতে হবে না, এ বকম আশা থাকলেও কোনো ভরসা অবশ্য অবশ্য ছিল না। মেয়ে দিয়েই যখন শুরু হয়েছে, একগন্ডা দেড়গন্ডা মেয়েব আশঙ্কাই তার ছিল। কিন্তু নাম রাখা নিয়ে মহেশ কখনও মাথা ঘামায়নি।

চন্দ্রা চলন্তিকার পাতা উলটে এলে মহেশ বলেছিল, তোর নাম কিন্তু চন্দ্রা নয়—চন্দ্রাবতী। মন্দ্রাবতী বড্ড বেখাপ্পা হবে।

চন্দ্রাবতী নয়, আমাব নাম চন্দ্রা। তুমি নাম রেখেছ, বাতিল কবব না একেবারে। বতী-টতী লাগিয়ে কী দরকার ? চন্দ্রা বললেই লোকে বুঝবে আমি মেযে।

তারপর হাসিমুখে বলেছিল, কী নামটাই ঠাকুর্দা রেখে গেছেন তোমার, বলিহারি যাই। আগে নয় মহেশ বলতে মহাদেব বোঝাত,—শরৎবাবু মহেশ গল্প লিখবার পর কী মানে মনে আসে বলো তো সবার ? ঠাকুর্দার ওপর এমন বাগ হয় আমার !

মহেশও হাসিমুখে বলেছিল, বুঝেছি। ক্লাসের মেয়ে খোঁচা দিয়েছে, না ? আজকালের মধ্যেই দিয়েছে নিশ্চয় ! মহেশ গল্পটা পড়ান হচ্ছে বুঝি ? কার গায়ে জ্বালা ছিল, এই সুযোগে ঝাল ঝেড়েছে !

চন্দ্রা খুশি হয়ে বলেছিল তুমি কী কবে বুঝলে বাবা ? একেবারে ঠিক ধরেছ ব্যাপারটা ! ঝবনা তো আমায় দু-চোখে দেখতে পারে না—কে জানে আমি ওর কী ক্ষতি কবেছি ! ক্লাসে গল্পটা পডান হচ্ছে, উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, মহেশ কথাটার মানে বুঝিয়ে দিন। মহেশ মানে তো মহাদেব, একটা ষাঁড়েব এ নাম রাখা হল কেন ? চন্দ্রার বাবার নামও আবাব মহেশবাবু। ক্লাসেব সব মেযে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল বাবা !

মহেশ কড়া সুব করে বলেছিল, তুমি মিছে কথা বলছ—ক্লাসেব সব মেযে হাসেনি, হাসতে পারে না। সকলেব সঙ্গে তো ছেলেমানুষি ঝগড়া হয়নি তোমাব ! কিছু মেযে হেসেছিল, কিছু মেযে ঝরনার অসভ্যতায ভীষণ চটে গিয়েছিল।

ঠিক বলেছ ! রাধার খুব ভাব ছিল ঝরনার সঙ্গে, আমার সঙ্গে মিশতই না। ক্লাস শেষ হলে, যাচ্ছেতাই বলে ঝরনার সঙ্গে ঝগড়া করলে, —আড়ি হয়ে গেল দুজনার।

একটু থেমে চন্দ্রা বিস্ময আব কৌতূহলেব সঙ্গে বলেছিল, কিন্তু তুমি কী করে ঠিক ঠিক সব জানলে ঘরে বসে ?

সম্পাদককে সব জানতে হয।

চেয়ারে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পাকা চুল তুলে দিতে দিতে চন্দ্রা বলেছিল, তাই বুঝি চুল পেকে যাচ্ছে ?

মহেশ কয়েক দিন প্রেসে না যাবার ফলে একটা যোগাযোগ ঘটে যায়। ভাগ্যচক্র নয়, কোমরে চোট না লেগে কোনো অসুখ হয়ে বা অন্য কারণে মহেশ কাজে হাজিরা দিতে কামাই করলেও যোগাযোগটা ঘটত।

ঘটনার সঙ্গে গাঁথা হয়ে হয়েই ঘটনা ঘটে থাকে।

শখের কবি ও লেখক জহরের কবিতার বইটি বাব হয়েছে। মহেশকে একখানা বই উপহার দিতে দুদিন প্রেসে গিয়ে তার দেখা না পাওয়ায় সে তার বাড়িতেই আসে।

মহেশের সঙ্গে তার আগে থেকেই পরিচয় ছিল কিন্তু রস সাহিত্যের আপিসেই মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হত, মহেশের বাড়িতে তার এই প্রথম পদার্পণ।

চন্দ্রার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় এবং তাকে তার অদ্ভুত রকম ভালো লেগে যায়।

একেবারে যাকে বলে প্রথম দর্শনে প্রেমের সূত্রপাত ঘটা।

একটা দিন বোধ হয় কোনো রকমে ধৈর্য ধবে থাকে। পরদিন ব্যথিত কোমরটা নিয়ে কোনো রকমে প্রেসে হাজিরা দিতে গিয়ে মহেশ তাকে তারই প্রতীক্ষায় বসে থাকতে দেখতে পায়।

বিশেষ কোনো ভূমিকা না করেই জহর বলে, আমি আপনার মেয়েব সঙ্গে ভালো করে মিশতে চাই। আপনার কোনো আপত্তি নেই তো ?

মহেশ বলে, আমার আপত্তি হবে কেন ? আমার তো পর্দানশিন বোকা মেয়ে নয়।

জহর উচ্ছ্বসিতভাবে বলে, অনেক মেয়ের সঙ্গে চেনা আছে, আপনার মেয়ের মতো একজনের মধ্যে এমন প্রাণশক্তির সঙ্গে এমন গভীর ভাব আব কারও মধ্যে দেখিনি।

মহেশ আশ্চর্য হয়ে বলে, আমার কোন মেয়েটার কথা বলছ ? চন্দ্রা তো খুব ধীর শান্ত মেয়ে—ভাবুক বলা যেতে পারে, খুব সেনসিটিভ, ওর মধ্যে তুমি প্রাণশক্তি দেখতে পেলে ? সত্যিকারের জীবন্ত বলতে গেলে ছোটোটাকে বলতে হয়—সব সময় অস্থির চঞ্চল।

জহর হেসে বলে, আমি চন্দ্রার কথাই বলছি। আপনারা ভুল হিসাব ধরেন—খুব দুরন্ত আর অস্থির হলেই কি বেশি জীবন্ত হয় ? রোগা ছেলেমেয়েরাই বেশি দুষ্টু হয় দ্যাখেন না ? প্রাণশক্তি আছে বলেই আপনার বড়োমেয়ে এত সেনসিটিভ অথচ শান্ত।

মহেশ বলে, তাই নাকি ! প্রাণচঞ্চল কথাটার মানে তোমবা কবিরা তবে এই বোঝ ?

জহর একেবারে ডঠে-পড়ে লাগে।

তার যেন সবুব সইবে না, যত তাড়াতাড়ি পারা চন্দ্রার হৃদয়মন জয় করতে হবে।

তার বাড়াবাড়িতে সকলে হাসাহাসি করে, বলাবলি করে যে কবি লেখকেবা সত্যিই পাগলেব জাত !

চন্দ্রা লজ্জা পেয়ে দিন পনেরো পবেই জহরকে বলে, কী আরম্ভ করেছেন ? আপনার কোনো বুদ্ধি-বিবেচনা নেই।

জহর বলে, আমার মতলব কিন্তু ভালো। তোমাব জন্য ছেলে খোঁজা হচ্ছিল, সে হিসাবে আমি একেবারে বাজে নই। বাড়ির অবস্থা ভালো, চাকরিটাও মন্দ করছি না। কবি হলেও স্বভাব কেউ মন্দ বলতে পারবে না।

অন্য দিকে তাকিযে চন্দ্রা বলে, আমার পিছনে না লেগে বাবাকে বললেই হয়।

তোমাব বাবাকে জানিয়েই তোমার পেছনে লেগেছি।

চন্দ্রা মুখ ফেরায় না, গলা চড়ায় না, মৃদুস্বরে প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে বলে, আপনি তো ভীষণ মানুষ ! ছেলের অভিভাবক হোক আর ছেলে নিজেই হোক, এক দিন কী বড়ো জোর দুদিন মেয়েকে দেখে-শুনে পরীক্ষা করতে এসে পছন্দ নয়তো অপছন্দ করে যায়। আপনি আজ পনেরো দিন ধরে রোজ এসে মেয়ে পছন্দ করছেন !

খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে থাকে জহর। সামনে রাখা দু নম্বর চায়ের কাপ ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জুড়িয়ে যায়।

তারপর হঠাৎ সে বলে, আমি কি তবে ভু., করলাম ?

কী করে বলব ?

না, আমি ভুল করিনি। তুমিই আমায় ভুল বুঝেছ। পছন্দ তোমায় আমি প্রথম দিনেই করেছিলাম—শুধু পছন্দ করা নয়, ভালোবেসেছিলাম।

এবার মুখ ফিরিয়ে চোখ তুলে তাকিয়ে চন্দ্রা একটু হেসে বলে, তাই বুঝি দিনের পর দিন যাচাই করে চলা ? আমায় নিয়ে দশজনের হাসাহাসির ব্যবস্থা করা ?

জহর আবেগের স্বরে বলে, বললাম না তুমি আমায় ভুল বুঝেছ। তোমায় পছন্দ করিনি—ভালোবেসেছি। এতদিন কোনো মেয়েকে চাইনি, বাকি জীবনে তুমি ছাড়া কোনো মেয়েকে চাইতে পারব না। কিন্তু আমরা কবি-মানুষ, আমরা ভালোবাসার ব্যাপার জানি—

কোনো মেয়েকে ভালো না বেসেই- ? এবার বুঝলাম ভালোবাসা নিয়ে কবিরা কী রকম আন্দাজি কারবার চালান !

খোঁচা খেয়েও জহর যেন খুব খুশি হয়ে ওঠে।

না, তা নয়। অল্পবয়সে দু-একটা মেয়ের সঙ্গে ছেলেমানুষি ভালোবাসা নিয়ে পাগলামি করেছি বইকী ! বেশি না বুঝে থাকি, এটুকু বুঝে গিয়েছি যে একপক্ষে ভালোবাসা হয় না। তোমায় যদি শুধু পছন্দ করতাম, তোমার পিছনে লাগতাম না। তোমার বাবার সঙ্গে কথাবার্তার ব্যবস্থা করে তোমায় পাবার ব্যবস্থা করতাম। ভালোবেসে ফেললাম বলেই মুশকিল হয়েছে। একপক্ষে ভালোবাসা হয় না, তোমার মধ্যে একটু ভালোবাসা না জাগিয়ে—অন্তত তুমি আমাকে পছন্দ কর কি না জেনে—

চন্দ্রা মুচকে হাসে।

ভালোবাসার প্রমাণ মেয়েরা কী করে দেবে জানি না। পছন্দ করার প্রমাণ কিন্তু যথেষ্ট দিয়েছি। নইলে এত জ্বালাতন বরদাস্ত করতাম ? এত পাগলামি সইতাম ? সবাই হাসাহাসি করছে দেখেও এতদিন চুপ করে থাকতাম ?

শুধু সহ্য করা ?

আমি কচিখুকি নই। আমিও দু-তিনবছর কবিতা লিখেছি, বাবা এখানে ওখানে কয়েকটা ছাপিয়েও দিয়েছেন। আপনি তো তবু নিজের পয়সায় নিজের কবিতার বইটা বার করলেন, আমার কবিতাগুলি মাসিকের ছেঁড়া কাগজে মুদি দোকানে মশলা প্যাক করছে।

তুমি কবিতাও লিখেছ জানতাম না।

কবিতা লেখা বুঝি তোমাদেরই একচেটিয়া ?

জহর যেন পরম খুশি হয়ে হাসে, টেবিলে সজোরে এক চাপড় মেরে জুড়িয়ে যাওয়া চায়ের কাপের অর্ধেকটাই উছলে ফেলে দেয়।

এবার বুঝে গেছি। তোমরাও স্বাধীনতা চাও ! আমাদের এত কালের এমন ছাঁকা ভালোবাসাও তাই মানা চলছে না। সত্যি কথাই—আমরা আজও সত্যি তোমাদের ভালোবাসার দাম কষছি কতখানি তোমরা সতী-সাবিত্রী হতে পারবে তারই ওজনে।

আরেক কাপ চা আসে। এনে দেয় মন্দ্রা, মুখখানা হাস্যকর রকম গম্ভীর করে আসে। জহর তার গাল টিপে দিয়ে বলে, গাল ফোলা কেন ?

মন্দ্রা বলে, আমিও কিন্তু কচিখুকি নই। গাল টেপা জমা রইল, একদিন উশুল করব।

করবেই তো, সুদে আসলে করবে। ও গালটাও টিপে দিই, ঋণ বাড়ুক।

মন্দ্রা চলে গেলে, জহর বলে, তোমার কবিতাগুলির কপি ঠিক আছে ?

আছে না ? আরও গোটা ত্রিশেক কবিতা লেখা আছে। ছাপাতে ভালো লাগেনি বলে ছাপাইনি।

গয়না না দিয়ে, আমার বইটার চেয়েও ভালো করে তোমার কবিতার বইটা ছাপিয়ে বিয়ের রাতে উপহার দিলে, খুশি হবে তো ?

খুশি হব না ? কিন্তু তুমি পারবে কিনা কে জানে ! হিরা জহরতের গয়নায় আমায় মুড়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল একজন, বাবা সামলে নিল। টাইফয়েডে আমি মর-মর বলে কাটাল মাসখানেক, টাইফয়েড থেকে সেরে উঠে আমার মাথা বিগড়ে গেছে বলে আমাকে বোম্বাইয়ে জ্যাঠার কাছে চেঞ্জে পাঠিয়েছে বলে আরও ক-মাস ঠেকিয়ে রাখল। টাকায় সুবিধা হবে না টের পেয়ে তারপর বাঁদরটা হাল ছাড়ল।

জহর বলে, জ্যাঠা মানে তো রাজীববাবু ?

চন্দ্রা বলে, নামেই জ্যাঠা। বাবা সত্যি সত্যি কয়েক মাসের জন্য পাঠাতে চেয়েছিল। আমিই গেলাম না। ও রকম বড়োলোক জ্যাঠার বাড়ি ঝি হিসাবে ছাড়া যেতে পারি ? জ্যাঠা কোনোদিন মানবে ভাইঝি বলে ? বাবাকে এতটুকু সাহায্য করবে না, শুধু চাইবে পায়ে এসে প্রণাম করো।

কাজে যাবার সময় মহেশ এসে একটু দাঁড়ায়,—খানিকটা বাঁকা হয়ে।

আছাড় খেয়ে শুধু চোট লাগার ব্যথা এতদিন থাকার কথা নয়। অন্য কোনো গোলমাল ঘটেছে পঞ্চাশ বছরের পুরানো দেহটাতে।

চন্দ্রা বলে, না গেলে হয় না ? কামাই করো না দু একদিন !

জহর বলে কাগজ তো বেরিয়ে গেছে ?

মহেশ বলে, আমার কি শুধু কাগজ বার করার কাজ হে ? প্রেসের কাজও দেখতে হয়। বসো তোমরা—আমি চললাম।

জহর বলে, ফেরার সময় প্রেসে আপনার সঙ্গে দেখা করে যাব।

খানিক পরেই একগাদা বইখাতা হাতে মন্দ্রা এসে দাঁড়াল।

বলে, বাবা বেরিয়ে গেলেন, আমিও স্কুলে চললাম, বোকা দিদিটাকে কে পাহারা দেবে ?

জহর হেসে বলে, আমি পাহারা দেব। সারাজীবন পাহারা দেবার চাকরি দিতে তোমার দিদি রাজি হয়েছে, মন্দ্রা !

মন্দ্রাও হেসে বলে, আহা মরি, কী বিনয় ! দিদির আবার রাজি অরাজি !

কেউ অবশ্য ভাবেনি এভাবে এমন আচমকা চন্দ্রার এত ভালো বিয়ে হয়ে যাবে—যদিও ব্যাপারটা মোটেই অভাবনীয় নয়। এ রকম ভালোবাসার বিয়ে সংসারে হরদম হচ্ছে।

জহরের তাড়াহুড়ো করাটাও এমন কিছু সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার নয়। কোনো মেয়েকে ভালোবেসে ফেললে তাড়াতাড়ি তাকে পাওয়ার ঝোঁকটা কবি-লেখক ছাড়াও অনেকেরই দেখা যায় !

তবু তাদের জানা চেনা বেশির ভাগ মানুষেরাই কিনা কোনো কোনো ভাবে সাহিত্য-জগতের সঙ্গে জড়িত, লিখতে এবং চিন্তা করতে প্রেমের মাধ্যমটাকে বুদ্ধি দিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ও বিচার-বিশ্লেষণ করতে অভ্যস্ত—অনেকেরই তাই, তাদের ভালোবাসার বিয়েটা অসাধারণ মনে হয়।

প্রথম পরিচয়ে প্রেম হওয়া নয়—ওটা যে অতি সাধারণ ব্যাপার যুগ যুগ ধরে ওটা অসংখ্যবার বাস্তব জীবনেও ঘটেছে—কবি-লেখকেরা হরফ সাজিয়ে সেটা অসংখ্যবার প্রমাণও করে গেছে।

কিন্তু জহরের মতো একজন সুমার্জিত কবি-লেখকের পক্ষে ভালোবাসাটা গড়ে উঠতে না দিয়ে, পাকতে না দিয়ে, মিলনের ছেদ টানাটা খাপছাড়া লাগে অনেকের কাছে।

মহেশের আয়োজন সামান্য কিন্তু বিয়েতে সমারোহ হয় প্রচুর। বহুলোকের সঙ্গে মহেশের পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা—তাদের সকলকে সেকেলে লুচি-পোলাও মাছ-মাংসের ভোজ খাওয়াবার সাধ্য তার নেই। না করলে নয় বলেই বাছা বাছা অ ত্মীয়কুটুম্ব বরযাত্রী কিছু লোককে ও রকম ভোজ খাইয়ে চেনা মানুষদের সে চা, বিস্কুট, চানাচুরের আসরে নিমন্ত্রণ করে।

ভোজ খেতে এসে আত্মীয়কুটুমেরা চন্দ্রাকে উপহার দেয় সোনারুপার সিঁদুর কৌটা থেকে প্রসাধন সামগ্রী, শাড়ি বা হালকা গয়না—চায়ের আসরে নিমন্ত্রিত নিমন্ত্রিতেরা প্রায় সকলেই বইয়ের উপহার বৃষ্টি করে।

একটা আলমারি ভরে গিয়ে বেশি হবে—এত বই !

এমন জমাট বাঁধে চা-খাবারের প্রীতি-সম্মেলনের আসর যে, মনে হয় চন্দ্রার বিয়ে উপলক্ষে বুঝি একটা বড়ো রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলেছে।

প্রাণখোলা হাসি-তামাশা, আলাপ-আলোচনা, গানবাজনা ও সংক্ষিপ্ত সরস বক্তৃতায়, প্রাণের রসে জমজমাট হয়ে ওঠে সে আসর।

কতকাল পরে যে মলয়ার মুখে হাসি দেখা গিয়েছে।

তার কলহ আর মহেশের হালকা রসিকতার সম্পর্ক যেন বদলে গিয়েছে চন্দ্রার বিয়ে ঠিক হবার দিন থেকে।

সর্বদা দুজনে মিলে মিশে পরামর্শ আর বিচার বিবেচনা।

হৃদয়বাবু জহরের জ্যাঠা না কাকা গো ? জ্যাঠাই হবে বোধ হয়। দাবি দাওয়ার এই লম্বা ফর্দ পাঠিয়েছে। শুধু গয়নাই চেয়েছে হাজার তিনেক টাকার।

সে জন্যে ভেবো না। তুমি বস সাহিত্য নিয়ে ভাবে মেতে থাকো। ও সব আমি হিসেব করেছি। জহরকে পরিষ্কার বলেছি গয়না কানে হাতে গলায় পাঁচশো টাকার বেশি দিতে পারব না।

মলয়া লজ্জিতভাবে হাসে।

কী অদ্ভুত ছেলে জানো ? আমার কথা শুনে একেবারে নিশ্চিন্তভাবে বললে, আমি তোমার মেয়েকে বিয়ে করছি মা —গয়নাগাঁটি দেনাপাওনার ব্যাপার বুঝবে অন্যেরা। আপনারা যা দেবার দেবেন, আমিও আপনাদের হয়ে হাজার টাকার শাড়ি গয়নার ব্যবস্থা করে মুখরক্ষা করব। আমি রেগে উঠতে কী বলেছিল জানো ? রাগবেন না, ওটুকু বুঝবার মতো বুদ্ধি আমার আছে। আমি কি আজকের কথা বলছি ? আজ তো আমি পরের ছেলে, এক মাস পরে যখন জামাই হব, তোমায় মা বলে ডেকে তোমার পক্ষ হয়ে তোমার মেয়েকে দিলে তো আর দোষ থাকবে না !

মহেশ যেন একটু চিন্তিতভাবেই বলে, সাংসারিক জ্ঞানবুদ্ধি বড়ো কম ছেলেটার। সব সময় ভাবের বশে চলে।

মলয়া হেসে বলে, ওতে কী আসে যায়। বুদ্ধি তো আছে—সাংসারিক জ্ঞানবুদ্ধিও নিজে থেকেই গজাবে।

সে তো গজাবে কিন্তু কীভাবে গজাবে সেইটা তো ভাবনার কথা।

বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিয়ের ওই বিশেষ আসরটিকে সব চেয়ে বেশি সরগরম করে রাখে, মানব আর অপর্ণা।

মানবের চেয়ে বয়স কিছু বেশিই হবে, বিয়ে হয়েছে। চন্দ্রা যে স্কুলে পড়ত এবং মন্দ্রা এখন যে স্কুলে পড়ে, সেই স্কুলের শিক্ষিকা।

লেখিকা হিসাবে তাকে আবিষ্কার করার গৌরব চন্দ্রা দাবি করে থাকে। ক্লাসে একদিন অপর্ণা ছোটো একটি খাতা ফেলে গিয়েছিল, সেই খাতায় ছিল মেয়েদের জন্য তার লেখা ছোটো একটি প্রবন্ধ।

লেখাটি পড়ে চন্দ্রা খাতাটি হাতে নিয়ে, অপর্ণার কাছে গিয়ে বলেছিল, এ লেখা আপনাকে ফেরত দিচ্ছি না অপর্ণাদি। ভারী সুন্দর হয়েছে লেখাটা—বাবার কাগজে ছাপিয়ে দেব।

অপর্ণা সহজে রাজি হয়নি। লেখা তো ছাপা হবেই না, মাঝখান থেকে মহেশ ভাববে যে সোজাসুজি নিজে চেষ্টা না করে ছাত্রীকে দিয়ে বাজে লেখা ছাপিয়ে নেবার চেষ্টা করছে !

মিছামিছি কেন লজ্জা দেবে চন্দ্রা ?

আপনার আবার লজ্জা কী ?

চন্দ্রা একরকম জোর করে লেখাটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে মহেশকে পড়তে দিয়েছিল। তারপর অনেক লেখা বেরিয়েছে অপর্ণার, বই বেরিয়েছে, নাম হয়েছে।

মাঝে মাঝে চন্দ্রা সগর্বে বলত, আমার জন্য আপনি লিখতে শিখলেন অপর্ণাদি।

অপর্ণা বলত, না, তোমার বাবার জন্য। প্রথম লেখাটা ছেপেছিলেন বলেই তো আরও লেখার উৎসাহ পেলাম।

প্রথম লেখাটা কে এনে দিয়েছিল বাবাকে? কে জোর করে বলেছিল লেখাটা ছাপতেই হবে? বললেই হল বাবার জন্য।

অপর্ণা হেসে বলত, বাজে লেখা হলে তুমি ধরেছ বলেই বুঝি উনি ছাপতেন?

বাজে লেখা হলে আনতাম নাকি? লেখাটা ক্লাসে ফেলে গিয়েছিলেন, আমি পড়ে দেখলাম সুন্দর লেখা--নইলে কে জানত আপনি লিখতে পারেন? আমি আপনাকে আবিষ্কার করেছি।

অপর্ণা হেসে বলেছিল, আচ্ছা আচ্ছা, বই যদি ছাপি তোমার নামে উৎসর্গ করব।

প্রথম বইখানায় সত্যই সে চন্দ্রার কাছে ঋণ স্বীকার করে চন্দ্রার নামে বইটি উৎসর্গ করেছে।

গল্প উপন্যাসের চেয়ে মেয়েদের জন্য লেখা অপর্ণার ঘরোয়া প্রবন্ধগুলির আদর হয়েছে বেশি।

মনস্তত্ত্ব এবং যৌনবিজ্ঞান ঘটিত ব্যাপার পর্যন্ত, সে সরল সহজভাবে অল্পকথায় বুঝিয়ে দিতে পারে।

ধনদাসের কাগজে তার লেখা ছাপানো নিয়ে মাঝে মাঝে একটু অসুবিধায় পড়তে হয় মহেশকে।

যৌন বিষয়েও এমন অনেক কথা সে সোজাসুজি লিখে বসে যে একটু অদলবদল না করে ছাপানো যায় না।

অপর্ণা বলে, দোষ কী? সোজা স্পষ্ট বলাই তো ভালো। এ সব বিজ্ঞানের কথা ঢেকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলতে গেলেই বরং নোংরা হয়ে যায়।

মহেশ বলে, কোন কাগজে লেখা যাচ্ছে সেটা হিসাব করে দেখতে হবে তো।

মানবও তাকে সমর্থন করে। বলে, নিশ্চয়ই। সোজা স্পষ্ট কথা শোনাটা আগে না শিখিয়ে হঠাৎ বলতে গেলে মানুষ চমকে যাবে না, ভড়কে যাবে না? সাধারণ ঘরের মেয়েরা দরকার হলে সোজাসুজি অনেক কথা বলাবলি করে— আপনার চেয়েও বরং গোটা গোটা করে বলে। কিন্তু তাদের বলার একটা ধরন আছে। আপনার লেখার ধরনটা একেবারে অন্য রকম বলে তাদের কাছে নোংরা ঠেকবে আপনি অনেক মার্জিতভাবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বলতেও লাগবে।

অপর্ণার সঙ্গে কথায় কথায় মানবের তর্ক বাধে--কোনো বিষয়েই দুজনের মতের যেন মিল নেই।

আসলে কিন্তু তা নয়।

অনেক মূল বিষয়ে মতের তাদের তফাত থাকে না--তারা তর্ক করে আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে।

অপর্ণা তর্ক করুক তার লেখার কোনো কোনো জায়গা দরকার মতো সংশোধন করার অনুমতি মহেশকে দেওয়া আছে।

আজও মানব আর অপর্ণা তর্ক জুড়ে দেয় - বিয়ের প্রীতি সম্মেলনের আসরে মানানসই হবে এমনিভাবেই অবশ্য জুড়ে দেয়। বিষয়টাও হয় লাগসই --প্রেমের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

অপর্ণা জহরকে বলছিল, কাজটা ভালো করলেন না। কবি-লেখকরা প্রেমে পড়বে, একবার ছেড়ে দশবার পড়বে, কিন্তু ভালোবেসে বিয়ে করা তো তাদের উচিত নয় !

কথাটা লুফে নিয়ে মানব হাসিমুখে বলে, সে কী কথা ! আপনি যে একেবারে উলটো গাইছেন ! শুধু কবি-লেখকদেরই বরং দশবার প্রেমে পড়ে দশটা বিয়ে করার স্পেশাল অধিকার থাকা উচিত— প্রত্যেকটা বউকে পুষবার জন্য স্পেশাল পেনশনের ব্যবস্থা থাকা উচিত। প্রেম ছাড়া বিয়ে হয়, কিন্তু বিয়ে ছাড়া প্রেমের মানে হয় ?

সকলে হাসে।

অপর্ণাও হেসে বলে, বোঝা গেল একেবারে ছেলেমানুষ রয়ে গেছেন। একবার প্রেমেও পড়েননি, একবার বিয়ে করার মজাও টের পাননি—আইন করে আপনাকে লিখতে না দেওয়া উচিত ! প্রেম আর বিয়েতে যে, তেল আর জলের মতো খাপ খায় না, দুটো একেবারে বিপরীত ব্যাপার, এটুকু না জেনেই কলম ধরেছেন !

প্রৌঢ় লেখক অনিমেষ মন্তব্য করেন, ঠিক কথা ! নইলে ওর লেখা অমন কড়া হয়—গল্প-উপন্যাস দিয়ে বিপ্লবের চেষ্টা চালায় !

চন্দ্রার বান্ধবী সন্ধ্যা বলে, আমরা প্রতিবাদ করছি—ওঁর লেখায় সত্যিকারের বাস্তব প্রেমের অনেক গন্ধ আছে। আপনাদের ফেনানো প্রেমের গল্পের চেয়ে ওঁর প্রেম ঢের বেশি জোরালো। চুপ করে গেলে চলবে না মানুবাবু, অপর্ণাদির কথার জবাব দিতে হবে ! আমরা শুনতে চাই।

মানব হাসিমুখে চারিদিকে তাকিয়ে বলে, উনি তামাশা করে কথাটা বলেছেন। নইলে মনোবিজ্ঞান নিয়ে, যৌনবিজ্ঞান নিয়ে এত লিখেছেন, উনি কি সত্যি জানেন না, তেল আর জলের মতো বিপরীত বলেই প্রেম আর বিয়ের মধ্যে, একটা বাদ দিয়ে আরেকটার মানেই হয় না ?

প্রৌঢ় অনিমেষ আমোদে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, দেখলে তো, ডায়ালেকটিকস ঠিক টেনে এনেছে !

সকলে সশব্দে হেসে ওঠে।

আসর যখন এমনিভাবে হাসি-আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছে তখন এসে দাঁড়ায় উমাকান্ত।

হাসি কথা একেবারে থেমে যায়। পুতুলের শোচনীয় মরণের বিবরণ প্রায় সকলেরই জানা ছিল না, অনেকের এটাও জানা ছিল যে ভেবে-চিন্তে উমাকান্তের দিক বিবেচনা করেই তাকে মহেশ আহ্বান জানায়নি।

মহেশ অভ্যর্থনা জানিয়ে বলে, এসো উমাকান্ত, বসো !

উমাকান্ত শান্তভাবেই বলে, বসা উচিত নয়, তবু বসব। চন্দ্রার বিয়েতে আমি একটা নিমন্ত্রণ পেলাম না !

মহেশ অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে বলে, কী জানো, আমরা ভাবলাম এই সেদিন—

মহেশ থেমে যায়। উমাকান্ত বসে এবার একটু হাসে—সত্যই হাসে ! বলে—জানি, আমার মানসিক অবস্থা বিবেচনা করেই আমায় বলেননি। তাই তো যেচে এলাম।

তার মাথার ব্যান্ডেজ তখনও খোলা হয়নি।

৫

মাস ছয়েক কেটেছে চন্দ্রার বিয়ের পর।

চন্দ্রা কিছুদিন বাপের বাড়ি থাকতে আসে। জহর নিজেই তাকে পৌঁছে দিয়ে যায়—সকালে। সারাদিন থেকে, মন্দ্রার সঙ্গে মিষ্টি ইয়ার্কির লড়াই চালিয়ে, জামাই-আদর ভোগ করে, বিকালে সে বিদায় নেয়।

সকলের কাছ থেকেই দুটো দিন থেকে যাবার অনুরোধ আসে। কিন্তু জহরের নাকি জরুরি কাজ, থাকার উপায় নেই।

মন্দ্রা মিনতি করে বলে, কবির আবার জরুরি কাজ থাকে নাকি জামাইবাবু ? আচ্ছা বেশ দুদিন না থাকতে পারেন, আজকের রাতটা শুধু থেকে যান !

বলে সে একটু মুচকে হাসে, বউ থাকবে যেখানে, সেখানে দিনটা কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা কি চলে যেতে আছে ? এটুকু বুদ্ধিও নেই ? কাল সকালে যাবেন। দুপুরের জামাই-ভোজ না খেতে চান—সকালে চা খাবার খাইয়ে ছেড়ে দেব।

জহর হেসে বলে, তোমার সঙ্গে এক বাড়িতে রাত কাটাতে বলছ ? জানই তো নিজেকে সামলাতে পারব না, রাতদুপুরে চুপিচুপি ঘুম ভাঙাতে যাবই—দিদি দিদি, চোর চোর, বলে চেঁচিয়ে আমার দফাটি সারবে। বেশ মতলব করেছ জব্দ করার !

কথা দিচ্ছি চেঁচাব না, চুপ করে থাকব।

এখন আর কথা দিয়ে লাভ কী ? তোমার দিদি তো শুনে ফেলল, ও কি আর রাত্রে ঘুমোবে ভেবেছ ? সারাবাত জেগে পাহারা দেবে।

ছ-মাসের মধ্যে নানা উপলক্ষে এবং বিনা উপলক্ষে কয়েকবার চন্দ্রা দু-চারদিনের জন্য বাপের বাড়ি এসে থেকে গিয়েছে—নিজের শাড়ি গয়নার সৌভাগ্যে বেশ একটু লজ্জিতভাবেই যেন এসেছে।

মন্দ্রার জন্য প্রতিবার দামি শাড়ি আর আর অন্য নানারকম উপহার নিয়ে এসেছে।

এবার তাই যেন একটু কেমন কেমন ভাব !

মন্দ্রার জন্যও এবার সে কিছুই আনেনি।

সন্ধ্যার পর মলয়া রুটি সেঁকে, মন্দ্রাকে সরিয়ে দিয়ে চন্দ্রা রুটি বেলে দিতে বসে।

মলয়া বারবার তাকায় মেয়ের দিকে, বারবার একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে থেমে যায়।

চন্দ্রা বলে, পোড়া পোড়া করছ কেন রুটি ?

খুন্তি দিয়ে চাটুতে রুটি দুটো উলটে দিতে দিতে মলয়া বলে, মা-র কাছে কিছু লুকোতে নেই জানিস তো ?

লুকোচুরির কী আছে ?

চাটু নামিয়ে রেখে মেয়ের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে বসে মলয়া বলে, কিছু হয়নি তো ? কোনো রকম গণ্ডগোল করে আসিসনি তো ? বেঘরে বেখাপ্পা জামায়ে পড়েছিস, তোর জন্যে ভেবে ভেবে রাত্রে আমার ঘুম হয় না !

চন্দ্রা মুখ তোলে না। রুটি বেলতে বেলতেই বলে, কিছু হয়নি, কিছু হয়নি, কিছু হয়নি ! নিশ্চিন্ত হয়ে রাতে ঘুমিয়ো। একটা কী বিষম রকমের বই লিখবে, শুধু লেখা নিয়ে দিনরাত মেতে থাকতে হবে, তোমার মেয়ের দিকে মন গেলে, শুধু বই লেখা নিয়ে মাতা যাবে না—তাই দু-একমাসের জন্য তোমার মেয়েকে বাপের বাড়ি বেড়াতে পাঠিয়েছে।

মলয়া খানিকটা স্বস্তি পায়, একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। মুখভার করে বলে, বাবা, বই লেখার জন্য বউকে বাপের বাড়ি পাঠাতে হয় !

মন্দ্রা বলে, কবি-জামাই এনেছ ভুলে যাও কেন ? কবিদের কখন কোন ভাব, কখন কোন ঠাট, তার কি কিছু ঠিক আছে ?

ছ মাস কেটে যায়।

চন্দ্রাকে নেবার কথা তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও বলে না, জহরও বলে না।

জহর মাঝে মাঝে আসে—সকালের দিকে। সারাদিন থাকে, মন্দ্রার সঙ্গে হাসি-তামাশা চালায়, যথারীতি জামাই-আদর ভোগ করে, বিকালে কিংবা সন্ধ্যার পর বিদায় নিয়ে চলে যায়।

তার জরুরি কাজ আছে।

মন্দ্রা বলে, আচ্ছা বেশ, তাই সই, আর ক দিন লাগবে কাজটা চুকতে ? যদ্দিন লাগুক, আরও একটা দিন নয় বেশি লাগাবেন। বাড়াবাড়ি করবেন না জামাইবাবু !

জহর অন্যমনে কী ভাবে।

মন্দ্রা বেগে বলে, আপনার কোনো বুদ্ধি-বিবেচনা নেই। হয় আপনি ছেলেমানুষ, নয় গোমুখ্যু। জামাই আসে, রাতে না থেকে চলে যায়—মা বাবার কী রকম লাগে বোঝেন না ? আত্মীয়বন্ধু পাড়া প্রতিবেশীরাই কী ভাবে ? দিদির কথা নয় বাদ দিলাম - আপনাদের মধ্যে কী হয়েছে আপনারাই জানেন, দিদিকে শাস্তি দিচ্ছেন বুঝতে পারছি।

জহর তাড়াতাড়ি বলে, না না, শাস্তি কেন দেব ?

মন্দ্রা আরও বেগে বলে, এভাবে আসেন কেন তবে ? রাত্রে থাকতে না পারলে আর আসবেন না।

জহর বলে, তাই বটে, এ দিকটা তো আমার খেয়াল হয়নি ! সবাই যে নানারকম ভাববে মনেই পড়েনি একেবারে।

মন্দ্রা ব্যঙ্গ করে বলে, তা মনে পড়বে কেন, আকাট মুখ্যু কবি যে !

জহর একটু হেসে বলে, আচ্ছা বেশ, বুদ্ধিমতী শালির কথাই মানলাম, আজ থেকে যাচ্ছি। এবার থেকে যেদিন আসব থেকে যাব।

খুশির সীমা থাকে না মন্দ্রার।

সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, এই তো লক্ষ্মীছেলের মতো কথা ! বইটা শেষ হতে কদ্দিন লাগবে বললেন না তো !

তা কি বলা যায় ? লেখার কাজের কিছুই ঠিক থাকে না।

পরদিন চন্দ্রার মুখখানা ম্লান দেখায়। জহর তখনও ঘুমোচ্ছিল। অনেক দিন পরে স্বামীর সঙ্গে রাত কাটিয়েছে, রাত জাগার জন্য মুখ শুকনো দেখাতে পারে, ম্লান দেখাবে কেন ?

সকলের তাকাবার রকম দেখে দেখে চন্দ্রা নিজে থেকেই বলে, বই লেখা সত্যি বড়ো বিশ্রী কাজ। কেমন অন্যমনস্ক ভাব, সারারাত উশখুশ করেছে, ঘুমোতে পারেনি -- প্রায় শেষরাত্রে ঘুমিয়েছে। একটা কিছু অসুখ-বিসুখ না হয়ে যায় !

মন্দ্রা একসময় চন্দ্রাকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করে, কী রকম অন্যমনস্ক ভাব দিদি ? তোকে বুঝি আদর-টাদর করেনি ?

আরে না, ও সব নয়। কতবার তো বলেছি আমাদের মধ্যে ও সব গোলমাল কিছু হয়নি। বই লেখা নিয়ে হয়েছে যত ঝঞ্ঝাট।

দিন সাতেক পরে শনিবার বিকালে ছোটো একটি সুটকেস নিয়ে জহর আসে এবং দু-রাত্রি থেকে যায়।

পরদিন সকালে আরও শুকনো, আরও ম্লান দেখায় চন্দ্রার মুখ।

মেজাজও যেন একটু খিটখিটে হয়ে গেছে।

কালও ঘুম হয়নি জহরের ?

ঘুমিয়েছে—ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছে।

ওষুধটা যে মদ সে কথা চন্দ্রা আর খুলে বলে না।

জহর মাঝে মাঝে আসে দু-একটা দিনরাত্রি থেকে চলে যায়—কিন্তু এতটুকুতে কেউ খুশি নয়।

প্রায় বছর পূর্ণ হতে চলল ভালোবেসে বিয়ে করা বউকে বই লেখার অজুহাতে বাপের বাড়ি ফেলে রেখেছে –এ কী অদ্ভুত ব্যাপার।

চন্দ্রা শুকিয়ে যাচ্ছে, দিন দিন আরও খিটখিটে হয়ে উঠেছে তার মেজাজ।

মন্দ্রার উপরেই তার মেজাজটা যেন বেশি রকম বিরূপ।

মন্দ্রা যে অশান্ত তডবড়ে মেয়ে এটা যেন তার সহ্য হচ্ছে না, উপদেশ দিয়ে ধমক দিয়ে শাসন করে, সে যেন তার প্রকৃতি সংশোধন করতে উঠে পড়ে লেগেছে।

মন্দ্রার মেজাজও বিগড়ে যায়, দুই বোনে উঠতে বসতে ঝগড়া বাধে।

চন্দ্রা বলে, আগেকার দিনকাল নেই জানিস তো ? এভাবে বিগড়ে যাস নে ছোটোবোনটি আমার।

এভাবে বোলো না দিদি। ছোটোবোনটিকে অন্য সময় আদর কোরো। যা বলতে চাও—সোজা করে স্পষ্ট ভাষায় বলো।

কেন তুই যখন-তখন বাইরে চলে যাবি, হইচই করে বেড়াবি, পড়াশোনায় মন দিবি না ? বড়ো হসনি ? এত অবাধ্য হবি কেন ?

তুমিই বলো কেন ? এত উপদেশ ঝাড়বে কেন তুমি ? মা বাবা থাকতে আমার জন্য তোমার এত মাথাব্যথা কেন ? এত টাকা খরচ করে বাবা তোমার বিয়ে দিলেন, এখনও দেনা শোধ দিতে পারেননি জামাইবাবু কেন তোমায় নেয় না, কেন বাপের বাড়ি ফেলে রাখে ? আমার পিছনে না লেগে, এ সব কেন নিয়ে মাথা ঘামালেই হয়।

সশব্দে গালে চড় পড়ত।

মন্দ্রা জানত, তাই দুহাতে দিদির হাতটা পাকড়ে নিয়ে ঠোঁট উলটে বলে, মন খুলে যদি কথাই না কইতে পারিস, এত উপদেশ ঝাড়তে কেন আসিস দিদি ?

হাত ছাড়।

গালে চড় মারবি না, বললেই ছাড়ব।

চড় মারব না।

মন্দ্রা দিদির হাত ছেড়ে দেয়।

বলে, দিদি, কেন এত বকিস ? কেন এত উপদেশ ঝাড়িস ? আমারও তো তোর মতো দশা হবে দু চারবছর পরে।

সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে মহেশের বাড়িতে কয়েকজন লেখক লেখিকার ছোটোখাটো বৈঠক বসে।

মানব ও খালেকও কোনো কোনো দিন উপস্থিত থাকে।

নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনায়, শিল্প-সাহিত্য নিয়ে তর্ক বিতর্কে বৈঠক জমজমাট হয়ে ওঠে শুধু চুপচাপ বিষণ্ণ উদাস মুখে বসে থাকে চন্দ্রা – অবশ্য স্বেচ্ছায় সেদিন সে বৈঠকে হাজির থাকে।

খানিক বসে থেকে ঠিক যেন বিরক্ত হয়েই উঠে যায়। অন্য ঘরে একা একা সে কী করে কে জানে।

সাহিত্য সম্পর্কে তার বিতৃষ্ণা প্রকাশ পায় খুব স্পষ্টভাবেই।

কবি জহরের স্ত্রী, পরস্পরকে পছন্দ করে তাদের ভালোবাসার বিয়ে—সাহিত্য প্রসঙ্গ উঠলে তার কিনা জাগে বিতৃষ্ণা।

অপর্ণা একদিন সোজাসুজি মহেশকে জিজ্ঞাসা করে, চন্দ্রার ভাবসাব এ রকম কেন ? ওর কী হয়েছে ?

তখন কেবল মানব উপস্থিত ছিল।

কে জানে কী হয়েছে ! কিছুই বুঝতে পারি না—নিজেও কিছু বলে না।

অনেক দিন এসে রয়েছে, না ?

ন-দশমাস হল।

জহরবাবু নিতে চান না ?

তেমন তাগিদ দেখছি না। বড়ো ভাবনায় পড়েছি মেয়েটাকে নিয়ে। নেমন্তন্ন করলে তো আসেই, জহর নিজে থেকেও মাঝে মাঝে আসে, দুজনে দিব্যি কথাবার্তা বলে, কিছুই বোঝা যায় না। জহর বলে একটা জরুরি কাজের নাকি খুব চাপ পড়েছে।

অপর্ণা একটু চিন্তা করে বলে, ঝগড়াঝাঁটি হয়নি মনে হয়—কোনো ভুল বোঝার পালা চলছে !

মানব এতক্ষণ মুখ বুজে ছিল, এবার সে বলে, ভুল বোঝা নয় —অমিল। বিয়ের আগে ভুল বোঝা ছিল, এখন সেটা অমিল দাঁড়িয়েছে।

অপর্ণার মুখের ভাব দেখে মানব একটু লজ্জা পায়, বলে আমার অবশ্য এ সব বিষয়ে কিছু বলা সাজে না—

অপর্ণা বলে, সাজে—তবে অভিজ্ঞতা নেই কিনা তাই ভুল বোঝা আর অমিলে তফাত করে বসছেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝা মানেই অমিল। ছোটোখাটো বিষয়ে অমিল থাকলে এসে যায় না—বরং থাকাই ভালো, আসল মিলটা তাতে আরও জমে। বড়ো ব্যাপারে বা গোড়ার ব্যাপারে অমিল থাকলেই মুশকিল হয়। কিন্তু চন্দ্রার তো জানা উচিত কোথায় মিলছে না ?

মহেশ চিন্তিতভাবে বলে, চন্দ্রা ঠিক করে কিছুই বলতে পারে না। ইচ্ছা করে বলে না কি না কে জানে ! শুধু বলে যে কোনো রকম মনোমালিন্য হয়নি, কিছুই ঘটেনি, আপনা থেকে জহর নাকি কেমন বদলে গেছে, কেমন একটা ছাড়া-ছাড়া ভাব এসেছে। সেটা অবশ্য আমরাও বেশ ধরতে পারি বুঝতে পারি।

চন্দ্রা কি জহরকে অনাদর করে ?

মহেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

যার আদর কমে যাওয়ায় মেয়েটা শুকিয়ে যাচ্ছে, খিটখিটে মেজাজ হয়েছে, তাকে অনাদর করে বলি কী করে ? এখন আর তেমন নেই কিন্তু আগে জহর এলে খুব খুশিই হত। জহরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—সেও ঠিক চন্দ্রার কথাই বলে। কিছুই নাকি ঘটেনি, চন্দ্রাই নাকি কী রকম বদলে গেছে—কেমন একটা ছাড়া-ছাড়া ভাব এসেছে।

অপর্ণা বলে, এ তো ভারী সমস্যার কথা হল ! এ বলে ওর ছাড়া-ছাড়া ভাব এসেছে, ও বলে এর ছাড়া-ছাড়া ভাব এসেছে। তাহলে আর সন্দেহ কি যে একটা গুরুতর ভুল বোঝার পালা চলেছে ?

মানব বলে, আমি আবার মুখ খুললাম। এ রকম না হলে আর সমস্যা থাকত কীসের ? আমি খানিকটা ব্যাপার বুঝেছি। খুব মোটা আর বাস্তব ব্যাপারে অমিল দেখা দিয়েছে—বোঝাপড়া করে নিতে দুজনে লজ্জা পাচ্ছে, ভয় পাচ্ছে। দুজনেই ভাবছে, যদি আরও খারাপ হয়, যদি আরেকজনের মন আরও বিগড়ে যায় !

অপর্ণা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মানবের মুখের দিকে তাকায়, একটু বিস্ময়ের সঙ্গে বলে, আপনার বয়স বেশি নয়, বিয়েও করেননি—আপনি এত সব জানলেন কী করে ?

এ সব জানা আর কঠিন কী ? দুজনেই রোমান্টিক প্রকৃতির, গোড়ায় দিব্যি মিল ছিল, ধীরে ধীরে অমিল দেখা দিল। এ বলে ও বিগড়ে গেছে, ও বলে এ বিগড়ে গেছে---দুজনের একটা বাস্তব সম্পর্কের ব্যাপার ছাড়া এ রকম হতে পারে ?

অপর্ণা সোজা প্রশ্ন করে বসে, কী ধরনের বাস্তব সম্পর্কের কথা বলছেন ?

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক—স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক ! ঠিক কীভাবে কী অবস্থা দাঁড়িয়েছে অনুমান করা যায় না—কিন্তু এটুকু বোঝা যায় যে এই সম্পর্ক নিয়ে দুজনের ধারণা দুরকম, কিছুতে খাপ খাচ্ছিল না। দুজনেই কিছুদিন তফাতে থেকে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করবে ভাবছিল। জহর চন্দ্রাকে এখানে রেখে গেছে, চন্দ্রাও আপত্তি করেনি। জহর আর এখন নিয়ে যাবার কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না, চন্দ্রাও কিছু বলতে পারছে না। এখন তবু ভাবটা আছে, খোলাখুলি ঝগড়া নেই---দুজনেই ভয় পাচ্ছে, একটা যদি বিশ্রী রকম মনোমালিন্য হয়ে যায়, সম্পর্কটা আরও বিগড়ে যায়।

অপর্ণা একটু ভেবে মানবকে বলে, আমি এদিকে চন্দ্রার সঙ্গে কথা বলে দেখি, আপনি জহরবাবুর সঙ্গে আলাপ করুন না ? মহেশবাবুকে সব খুলে বলতে জহরের সংকোচ হয়েছে, আপনাকে হয়তো খুলে বলতেও পারেন আসল ব্যাপারটা কী।

চটে গিয়ে চড়িয়েও দিতে পারেন !

সেভাবে বলবেন কেন ? এই বয়সে সংসার এত বোঝেন, একটু কায়দা করে আলাপ করতে পারবেন না ? আপনাদের জানাশোনাও তো কম দিনের নয়। খুলে বলতে না চাইলেও কথাবার্তা থেকে খানিকটা হয়তো বুঝতে পারবেন।

মন্দ্রা কখন এসে চুপচাপ আড়ালে বসে পড়েছিল, কেউ খেয়াল করেনি। হঠাৎ সে ফোঁস করে ওঠে, অনাদর ? অনাদর না ছাই। দিদিই বরং আমল দেয় না জামাইবাবুকে।

মহেশ বলে, তুই এখানে কেন ? এ সব কথায় কেন ?

মন্দ্রা বলে, আমি জানতে বুঝতে চাই। দুদিন বাদে আমারও তো দিদির মতো দশা হবে।

এর পরে আর কথা নেই। মন্দ্রার অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করেই তাদের কথা চলে।

চন্দ্রার সঙ্গে কথা বলে অপর্ণা খানিকটা ধরতে পারে কিন্তু ঠিক কী ব্যাপারটা যে চলছে দুজনের মধ্যে বুঝতে পারে না।

হাসিমুখে একটু তামাশার সুরে সে জিজ্ঞাসা করে, একসঙ্গে শোয়া হত না দুজনের ?

চন্দ্রার মুখ লাল হয়ে যায়।

হত না ? কী যে বলেন !

তুমি জান না ভাই, ওই নিয়েই কত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মন কষাকষি দাঁড়িয়ে যায়—আমার নিজের বেলা ঘটেছিল কিনা, আমি জানি। একটু থেমে একটু হেসে আবার সে জিজ্ঞাসা করে, শুধু ভদ্রতা বজায় একসঙ্গে শোয়া হত না তো ?

ধেৎ !

তবে ? অপর্ণা ভাবনাচিন্তায় কূলকিনারা পায় না। কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেছে মেয়েপুরুষের সম্পর্ক নিয়ে---রক্তমাংসের দুটো মেয়েপুরুষের সম্পর্কের গন্ডগোল বুঝতে তার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে ! কেন তবে এমন অমিল মাথা তুলেছে দুজনের মধ্যে যে, পরস্পরকে ভালোবেসেও দুজনে তফাতে সরে আছে—মন্দ্রার ধমকানি খাওয়ার আগে, শ্বশুরবাড়ি এসে একটা রাত কাটাতেও জহর ছ-সাতমাস রাজি হয়নি ?

আগে জহরবাবু এলে রাত্রে থাকতে চাইতেন না কেন ?

আমি কি জানি ওর কী হয়েছে ?

থাকতে বলতে না ?

বলতাম না ? সবাই বলত, আমিও বলতাম। একটা নাকি বড়ো বই ধরেছে, রাত জেগে লিখছে—মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছে বইটাতে। এটা নাকি ওর সেরা বই হবে।

ছাই হবে। বউয়ের জন্য এদিকে প্রাণ খাঁখাঁ করছে চব্বিশ ঘণ্টা, সেরা বই লেখা হবে !

চন্দ্রা ম্লান হেসে বলে, তাই নাকি হচ্ছে, আমি কাছে না থাকাতেই হচ্ছে। আমার জন্য খুব ব্যাকুলতা জাগে, লিখতে বসলে ওটাই নাকি লেখার ঝোঁক দাঁড়িয়ে যায়, তরতর করে কলম চলে।

হতেও পারে ! লেখকদের কত রকম পাগলামিই যে থাকে। একটু ছিট না থাকলে বোধ হয় লেখক হওয়া যায় না।

আপনিও তো লেখিকা !

আমি তো গল্প-উপন্যাসও লিখি বসালো প্রবন্ধের মতো করে ! কাজের কথা, দরকারি কথা লিখি।

তফাত কী ?

এ তফাতটুকুও বোঝ না ? আমি কি কবিতা লিখি ? আমি লিখি প্রবন্ধ।

মানব ভেবে চিন্তে জহরের সঙ্গে কায়দা করে কথা বলার চেয়ে সরলভাবে সোজাসুজি কথা বলাই ভালো মনে করে।

সুযোগ জোটে কয়েক দিন পরেই। বইয়ের দোকানে জহরের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়।

চা খাওয়াবেন চলুন !

চায়ের দোকানে বসে বলে, আমরা দুজনেই লেখক কবি আমাদের মধ্যে কথার মারপ্যাঁচ চলবে না কিন্তু। সোজাসুজি বলি। মহেশবাবুর বাড়ির সকলে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। আপনার স্ত্রীর মুখে তো কেউ হাসি দেখতেই পায় না। কী রকম রোগা হয়ে গেছে সে তো আপনি মাঝে মাঝে গিয়ে নিজের চোখেই দেখে আসেন।

জহরের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়, সে ঠোঁট কামড়ায়। মানব একটু ভড়কে গিয়ে ভাবে, সেরেছে ! শুরুতেই চটে গেল নাকি !

সে আবার বলে, যদি কিছু হয়ে থাকে— মিটমাট করে নিন না ? চন্দ্রা আমার বোনের মতো, আরও যদি জের টেনে চলেন ও বেচারা ভেঙে পড়বে, সাংঘাতিক কিছু করে বসবে। চোখের সামনে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আর দু একমাসের বেশি টানতে পারবে না, বিশ্রী কিছু করে বসবে। হয়তো খবরের কাগজেও ছাপা হয়ে যাবে।

মানব ভান করেনি, বলতে বলতে তার মুখ এমন ভীষণ রকম গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল যে চেয়ে দেখে জহর হঠাৎ কিছু বলতে পারে না।

মানব বলে, জানেন তো আমি চ্যাংড়ামি পছন্দ করি না ! আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার— তার মধ্যে আমার যে নাক গলানো চলে না সেটা আমি খুব ভালো করে জানি। এত দিন তাই চুপচাপ ছিলাম। কিন্তু চন্দ্রা এবার সাংঘাতিক কিছু করে বসবেই জেনে একেবারে মরিয়া হয়ে নাক গলাতে চাইছি—আপনি নয় দুটো গাল দেবেন, তবু চেষ্টা তো করা যাক বিপদ ঠেকাবার। যাই হয়ে থাক, আমাদের খুলে বলুন, মিটিয়ে দিচ্ছি। গোলমালটা কী নিয়ে ?

জহর মাথা নাড়ে, গোলমাল কিছু নয়, আপনারা বুঝবেন না, মেটাতেও পারবেন না।

চায়ের কাপে একবার চুমুক দিয়ে বলে, আমরা লেখক কবি—সোজাসুজি কথা বলব বলছিলেন ? তাই বলছি। যদি বলেন গোলমাল গোলমালটা আমার স্বভাবের। দোষটা আমার—আমার প্রকৃতির। চন্দ্রাকে কাছে রাখতে আমার ভয় করে—কবে মন ভেঙে দেব, সারাজীবনের মতো সর্বনাশ হয়ে যাবে। নিজের স্বভাবটা একটু শুধরে নেবার চেষ্টা করছি।

কবি কিনা, উঁচুস্তরের প্রেমের কথা লিখি, স্বভাবটা তাই দাঁড়িয়েছে উলটো। সংযমের বালাই নেই, একটু ভদ্র আর সংযত থাকতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।

ও !

সবাই ভাবছে, আমিই বুঝি খেয়ালের ঝোঁকে চন্দ্রার মনে কষ্ট দিচ্ছি। আমার দোষ আমি বুঝি — মোটেই এটা খেয়াল বা পাগলামি নয়। মনটা একেবারে বিগড়ে যাওয়ার চেয়ে এ অনেক ভালো। মাঝে মাঝে যাই, চিঠিপত্র লিখি, জানাবার চেষ্টা করি যে আমার ভালোবাসা একটুও কমেনি—ও আমার কাছে না থাকার জন্য বইটা ভালো হচ্ছে, ওর জন্য প্রাণের ছটফটানি লেখার প্রেরণা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আসলে কিন্তু উপন্যাস লিখতেই পারছি না—তবে কয়েকটা গল্প খুব উতরে গেছে। এ রকম গল্প আগে কখনও লিখতে পারিনি।

জহর একটু হাসে।

উতরে গেছে মানে আমার স্ট্যান্ডার্ডে উতরে গেছে। ওকে একটু খুশি রাখার জন্য বড়ো বই লেখার কথা বলে এসে এখন পড়েছি মহা বিপদে। যদি একদিন এসে দেখতে চায় বই কতটা লিখেছি, কী রকম লিখেছি মুশকিলে পড়ে যাব।

মানব তার মুখের ভাব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করছিল, জহরের মুখে উদ্ধত ভাবের চরম নির্বিকারতা। সে যে বিনীত আর সংযতভাবে কথা বলছে, সেটা যেন তারই উদারতা।

মানব ধীরে ধীরে বলে, কিন্তু চন্দ্রাকে তো সে রকম কোল্ড টাইপের স্ত্রী বলে মনে হয় না ! তাছাড়া সংযম নিয়ে কী এত ভাবনা আপনার ? বিয়ের পর কিছুদিন একটু বাড়াবাড়ি হলে কী এসে যায় ? আপনা থেকেই সামঞ্জস্য হয়ে যায়। আমি নিজে অবশ্য বিয়ে করিনি, কিন্তু পাঁচজন বন্ধুর কাছে শুনি তো ব্যাপার সব ! স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারের বিজ্ঞানটা তো পড়েছি তন্নতন্ন করে। অভিজ্ঞতার অভাবও নেই—ঘরসংসার পেতে বসার আয়োজন করিনি—শুধু এইটুকু।

জহর মাথা নাড়ে, আমার ব্যাপার জানেন না।

জানিয়ে দিন না ?

চন্দ্রা কোল্ড নয় -নর্ম্যাল। আমি মানুষটাই নীচ।

নীচ ! প্রেমের ব্যাপারে চন্দ্রার তুলনায় নিজেকে জহর নীচ মনে করে। ব্যাপার তো তবে সহজ নয় !

বিয়ের পর বুঝি নিজেকে অ্যাবনর্ম্যাল মনে হয়েছে—আগে একেবারে কিছুই জানতেন না ?

না —ঝোঁকটা ছিল মানসিক, ভাবতাম এটা আমার তেজি পুরুষত্বের লক্ষণ। অসংযমের ঝোঁকটা এত জোরালো জানলে বিয়ের আগেই নিজেকে শুধরে নেবার চেষ্টা করতাম। এ রকম ঝঞ্ঝাট হত না।

চায়ের দোকান—ভিড়ের সময় না হলেও পাশেপাশে দু-চারজন লোক আছে। একটু নিচু গলায় কথা বললেও যেভাবে যে সুরে সে কথা বলে, যেভাবে আবেগে তার গলা কেঁপে যায়, তাতে তার মনের অবস্থা বুঝতে কষ্ট হয় না মানবের।

চন্দ্রাকে খোলাখুলি বললেই পারেন ? একা একা নিজেকে শুধরোবার চেষ্টা না করে দুজনে মিলেমিশে পরামর্শ করে, করলে আরও ভালো হয় না ? স্বামীর যদি কোনো অসুখ থাকে, স্ত্রী নিজের গরজেই সেটা সারাতে প্রাণ দিয়ে সাহায্য করবে।

জহর মাথা নাড়ে—আজ বললে বুঝবে অন্য রকম। নিরুপায় হয়ে হয়তো সয়ে যাবে, সাহায্যও করবে—কিন্তু একবিন্দু শ্রদ্ধা কি আর থাকবে আমার ওপর ? ভদ্রঘরের মেয়ে, একটা রুচিবোধ আছে—আমার প্রকৃতি কী রকম জঘন্য, কী রকম পশুর মতো ওকে চাই—জেনে আর কি আমায় মানুষ ভাবতে পারবে ?

মানব ধীরে ধীরে বলে, বুঝলাম ব্যাপার। আমি যদি বলি এর মধ্যে অনেকটাই আপনার কল্পনা, আপনার কিছুটা দোষ থাকলেও আসল দোষটা আপনার স্ত্রীর—আপনি নিশ্চয় চটে যাবেন ! না, দোষ বলব না—আপনারও দোষ নেই, চন্দ্রারও দোষ নেই। আপনারা শুধু ভুল করেছেন। সামলে নেবার জন্য যে চেষ্টা আপনারা করেছেন তার প্রশংসা করতে হয়, ভুল উপায়ে করলেও সিরিয়াসলি চেষ্টা করাটাই মস্ত বড়ো গুণের কথা। খেয়োখেওয়ি না করে আপনারা দুজনেই সমাধান খুঁজছেন।

জহর বলে, বিয়ে করলে, আমার মতো ধাত হলে, টের পেতেন। প্রাণপণে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করে এসেছি, তবু যেটুকু টের পেয়েছে তাতেই চন্দ্রা ভড়কে গিয়েছিল। সাধে কি তাড়াতাড়ি ওকে বাপের বাড়ি সরিয়ে দিয়েছি ?

বেশি ড্রিঙ্ক করছেন শুনলাম ?

একটু সামলে নিচ্ছি !

মানব মনে মনে বলে ড্রিঙ্ক করার জন্যই যে ড্রিঙ্ক করে সে নিজেকে সামলাতে পারে না, এ অবস্থায় নিজেকে সামলাবার জন্য ড্রিঙ্ক করে তুমি নিজেকে সামলাবে !

মানব জানে, লেখকের বিশেষ অবস্থার দু-একচুমুক ড্রিঙ্ক দরকাব হয়, ওষুধেব মতো দরকার হয়—সকলের অবশ্য নয়।

এ এমন ধরনের কাজ যে তার সঙ্গে মানুষটার ধরনের একটা যোগাযোগ ঘটলে মাঝে মাঝে স্নায়ুমণ্ডলীর অবস্থা, ব্রেনের অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, ডাক্তাবি শাস্ত্রের হিসাবনিকাশের বাইরের একটা অদ্ভুত কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র সহজ উপায় হল দু-একচুমুক খাওয়া।

এ অবস্থাটা আসে অনিয়মিতভাবে, ওষুধের মতো খেলে অভ্যাস জন্মে যাবার কারণ থাকে না।

লেখার জন্য নেশা দরকার হয়—এটা স্রেফ বাজে কথা। নেশা কোনো কাজেই লাগে না লেখার। কোনো লেখক যদি নিয়মিত নেশা করে—অন্য পাঁচজনের মতো নেশার জন্যই করে।

সারা সপ্তাহ দেহ ক্ষয় করে খেটে হপ্তা পাবাব দিন, কলকারখানার কোনো কোনো নিরক্ষর মজুর যে কারণে দু-একজন সাঙাতের সঙ্গে এক-দেড়টাকার বেশি খেয়ে পরদিন বুকভরা আপশোশ নিয়ে ঘুম থেকে জাগে !

৬

সামান্য সাধারণ তুচ্ছ ছোটো ছোটো বিষয়ে ভুল ধারণাই পিছানো দেশের মানুষের ক্ষতি করে বেশি।

সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে জেনেও মানুষ পরম সুখে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে, কিন্তু শিশুকে টিকা দিতে নেই এ কথা জানার ফলে অনেক ভবিষ্যৎ জীবন আরম্ভ হতে না হতে শেষ হয়ে যায়। বড়ো বড়ো নামকরা রোগে মানুষ যত না ভোগে আর মারা যায়, স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ খুঁটিনাটি ব্যাপার সম্বন্ধে ভুল ধারণার ফলে তার চেয়ে অনেক বেশি লোক, অনেক কাল ধরে অনেক বেশি কষ্ট পায় আর অকারণে অকালমৃত্যুকে বরণ করে নেয়।

জীবনের খুঁটিনাটি ছোটো ছোটো বিষয়ে ভুল ধারণাই মানুষের জীবনে অশান্তি সৃষ্টির সব চেয়ে বড়ো কারণ।

বড়ো বড়ো ব্যাপারে হাল ধরে আছে বড়ো বড়ো মানুষেরা, ছোটোখাটো সাধারণ মানুষকে বড়ো ভুল করার সুযোগ তারা দেয় না। বড়ো ভুল করাটা তাদেরই একচেটিয়া অধিকার।

বড়ো বড়ো ভুল সংসারে ক-জন মানুষ ক-বার করে ? অসংখ্য দৈনন্দিন ছোটো ছোটো ভুল মানুষ হরদম করে চলেছে। অনেক বড়ো বড়ো ভুলের শোচনীয় জের—অবশ্য বড়োর পিছু-ধরা আধাবুড়ো মানুষকে সারাজীবন টেনে চলতে হয়, আবার অনেক ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে ফলটা মারাত্মক হলেও ধীরে ধীরে মানুষ সামলে উঠতে পারে।

তাছাড়া, ভুল সম্বন্ধে মানুষের আত্মরক্ষার একটি স্বাভাবিক ধর্ম আছে। সেটা হল তার ভীরুতা। লাভের আশাতেও বড়ো কিছু করতে মানুষ ভয় পায়, ইতস্তত করে। যে সব বৃহৎ ব্যাপারের ফলাফল সুনিশ্চিত সে সমস্ত ব্যাপারেও মানুষ জোরালো অথবা মৃদু দ্বিধার অস্বস্তিবোধ করে, কোনো কারণে ফলাফলটা যদি অন্য রকম হয়ে যায় !

কারণটা খুবই সহজবোধ্য।

বড়ো ব্যাপারের সুফল এবং কুফল দুটোই বড়ো রকমের হয়।

কিন্তু ছোটো ছোটো ব্যাপারকে মানুষ অতটা গ্রাহ্য করে না, যদিও ফলাফল জমা হতে হতে, একদিন ফলাফলের দিক থেকে বড়ো ব্যাপারকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে !

অল্প পরিমাণে আফিম খেলে উপকার হয় এই ধারণার বশে আফিমের নেশার দাসত্ব মেনে নিয়ে অনেকে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে অকর্মণ্য জীবন কাটিয়ে দেয় ; কিন্তু তিলে তিলে জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখার অভ্যাস সঞ্চয় করে বাস্তব জগতে বেঁচে থাকার পক্ষেই নিজেদের যারা অনুপযুক্ত করে ফেলে, তাদের তুলনায় আফিমখোরেরা সংখ্যায় অতি নগণ্য। আফিমের নেশা আজ পর্যন্ত কোনো জাতিকে নষ্ট করেনি, কিন্তু স্বপ্ন দেখার নেশা জাতির-পর জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

অথচ, মুশকিল এই, জেগে জেগে একটু একটু স্বপ্ন দেখার ক্ষমতাকে মানুষ শিক্ষা ও সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে গণ্য করে নিয়েছে !

স্বপ্ন যে কল্পনা নয়, এ কথাটা অনেকের জানা নেই। কল্পনা মানুষের জীবনধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, প্রগতির জন্য তো বটেই !

কিন্তু স্বপ্ন দেখা একটা রোগমাত্র।

যাদের দেখলেই স্বপ্নবিলাসী বলে চেনা যায়, যারা অলস অকর্মণ্য পরমুখাপেক্ষী হয়ে জীবনের সমস্ত অবস্থাতে দারুণ অশান্তির মধ্যে জীবনযাপন করে এবং দশজনের জীবনকে অশান্তিময় করে তোলে, সংসারের অধিকাংশ বীভৎস পাপই যাদের দ্বারা ঘটে থাকে, যারা চুরি ডাকাতি গুন্ডামিকে জেনে রেখেছে জীবনের রাজকীয় জীবননীতি, তাদের বাদ দিলেও স্বপ্ন-রোগের বহু রোগী জগতে আছে।

ভাব-প্রবণতা স্বপ্ন-রোগের মতো মারাত্মক নয়।

কারণ ভাব-প্রবণতায় আজও আদর্শবাদিতার রসায়ন মেশানো আছে। কোনো আদর্শ না আঁকড়ে এ জগতে কেউ আজও ভাব-প্রবণ হতে পারে না।

যারা ভাব-প্রবণ, অনুভূতির জগতে অসাধারণ ও অতিরিক্ত উত্তেজনা সৃষ্টি আর উপভোগ করার জন্য, চিন্তাশক্তির সাহায্যে কতকগুলি ভুল ধারণাকে নিয়ে তারা নাড়াচাড়া করে, কিন্তু

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সমস্ত ভুল ধারণা সাধারণ বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ বাস্তবতাকে বিশেষ বিকৃত না করে বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করলে যে ভুল ধারণা জন্মায়।

যেমন নরনারীর মিলন সম্পর্কে ভাব-প্রবণ নরনারীর কল্পনা। এই কল্পনার মধ্যে অনেক ভুল ধারণা থাকে, অনেক মিথ্যা থাকে, অনেক অসম্ভব প্রত্যাশা থাকে,—তবু নরনারীর মিলনের বাস্তবতাই এই কল্পনার ভিত্তি। এই রকম ভাব-প্রবণতার জন্য নরনারীর মিলিত জীবনে অশান্তির সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু সে অশান্তি কদাচিৎ মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়।

অন্য দিকে যত বড়ো বীভৎস অপরাধই স্বপ্নরোগীরা করুক, আত্মসমর্থনের অজস্র যুক্তি সর্বদাই এদের ভুল ধারণার ভাণ্ডারে মজুত থাকে। এই সব যুক্তি মাখিয়ে কদর্যতাকে এরা মনোহর রূপ দেয়, হীনতাকে দাঁড় করাতে পারে মহত্ত্ব হিসাবে এবং মনেপ্রাণে তাই বিশ্বাসও করে।

কয়েকটা টাকার জন্য মানুষ খুন করেও এরা অনায়াসে ভাবতে পারে যে, বীরত্ব আর পৌরুষের আদর্শের জন্য ফাঁসির বিপদ বরণ করেছে এবং এ কথা ভেবে রীতিমতো গৌরববোধ করতে পারে।

মানুষ খুন করার নামে যার শিহরন জাগবে, রাজার আইন, সমাজ ও ধর্মের আইন, প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে যাওয়ার কল্পনা করাও যার পক্ষে বিচার বিবেচনা করে দেখার ব্যাপার, সেই সব তথাকথিত সাধারণ ভালো মানুষের জীবনে স্বপ্ন-অভিব্যক্তি বড়োই বিচিত্র। হাজার হাজার নরনারীর দৈনন্দিন জীবনযাপনের অসংখ্য খুঁটিনাটির মধ্যে এই বিজাতীয় মারাত্মক রোগের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সচেতন অভিযান, সাধারণ লক্ষণ হিসাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

ধনদাস আর কালাচাঁদের ভাব-প্রবণতার কী আকাশ-পাতাল তফাত দেখা যাচ্ছে ! একজন যেন ভাব-প্রবণতাকে জয় করে চলেছে, আরেকজন স্বপ্ন-প্রবণতা নিয়ে খেলা করছে।

বাইরে যাবার সময় ধনদাস চৌকাঠে হোঁচট খেল।

ধনদাসের ধারণা, কোনো কাজে যাবার সময় হোঁচট খেলে কাজটা সফল হয় না। একটু বসে, স্ত্রীর সঙ্গে দুটো কথা বলে, ছেলেমেয়েকে একটু আদর করে কয়েক মিনিট পরে ধনদাস আবার বাইরে গেল।

কুসংস্কার না বলে ধনদাসের এই ধারণাকে স্বপ্ন রোগের পর্যায়ভুক্ত ভুল ধারণা হিসাবে গণ্য করা চলে। এই একটি ভুল ধারণার সঙ্গে ধনদাসের মনের আরও কত যে ভুল ধারণা একসূত্রে গাঁথা হয়ে আছে !

হোঁচট খাওয়া-না-খাওয়ার সঙ্গে ধনদাসের মনের এই সমস্ত ভুল ধারণার কেবল এইটুকু সম্পর্ক যে, এই উপলক্ষে তার ব্যর্থতার ভীতিটা তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল, নিজের নিরন্তর দুরদৃষ্টের জন্য মানসিক বিষাদ ও অসহায় ভাবটা নাড়া খেল, ইত্যাদি। হোঁচট খাওয়ার ফলে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়নি—স্বপ্ন-রোগে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকার ফলে হোঁচট খাওয়াকে একটু কাজে লাগানো হচ্ছে মাত্র।

কথাটাকে সহজ করা সম্ভব হবে।

ছোটোবড়ো যে কাজেই হাত দিক তাতেই তার সাফল্যলাভ করা শুধু উচিত নয়, সেটাই জগতের অন্যতম অপরিবর্তনীয় নিয়ম—এই স্বপ্ন মনকে বশ না করলে কেউ ভাবতেও পারে না, বেরোবার সময় হোঁচটফোঁচটের বাধা-পড়া ভবিষ্যৎ ব্যর্থতার ইঙ্গিত। আগামী ব্যর্থতার এই অস্বাভাবিক অপ্রমাণিত স্বাভাবিক সম্ভাবনাকে ধনদাস মানে, কিন্তু সাহেবসুবোদের হিসাবমতো তাদের হুকুমে তাকে যে এটা মানতে হয় এটা একেবারেই সে স্বীকার করে না।

ফলে, ন্যায্যত প্রাপ্য সাফল্যের জন্য উপযুক্ত পরিশ্রম করাটা মহেশ, ধনদাস আর তার পেয়ারের আত্মীয়কুটুম্বরা বোকামি মনে করে। সহজে ফাঁকি দিয়ে কার্যোদ্ধারের প্রবৃত্তি দেখা দেয়।

ব্যর্থতা ধনদাসকে বড়ো বেশি কাবু করে দেয়।

ব্যর্থতার ভয়ে বড়ো কাজের প্রেরণা আসে না -ছোটো কাজে আলস্য জাগে, অবহেলা জাগে।

অন্য লোকে কষ্ট পাক আর নিজে সে সুখ ভোগ করুক—ধনদাস এই স্বপ্ন-রোগে ভুগছে।

অর্থাৎ ধনদাস মানুষটা হিংসুক আর স্বার্থপর। যেখানে সাফল্য ও ব্যর্থতার প্রশ্ন আছে সেখানেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতে বাধ্য। কারণ উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিষয়ে একা ধনদাসের কর্তৃত্ব থাকলে ব্যর্থতার প্রশ্নই ওঠে না। যিনি অথবা যাঁরা নিজেদের লাভ-লোকসানের হিসাব করে ধনদাসের লাভের কাজটা হতে দেবেন না, ধনদাস তাঁদের হিংসা করে এবং তাঁদের ক্ষতি করে নিজের লাভ চায়।

সমস্ত বিরোধিতার ক্ষেত্রেই অবশ্য মানুষ প্রতিপক্ষের ব্যর্থতা এবং নিজের সাফল্য কামনা করে, নতুবা বিরোধিতার কোনো অর্থই হয় না।

কিন্তু ধনদাসের কামনার রূপ অন্য রকম। বিরোধীপক্ষের সাফল্য ধনদাসের কাছে অসঙ্গত, এটা যেন দেবতার অন্যায় পক্ষপাতিত্ব। সাফল্যের পথে যে বা যারা বাধাস্বরূপ আসবে ছলে-বলে কৌশলে তাদের নিপাত করা জীবনসংগ্রামের অন্যতম বাস্তব নীতি।

জহরকে সে যে কী রকম ভড়কে দিয়েছিল মানব সেটা টের পায় সকালবেলা তার বস্তির ঘরে জহরের আবির্ভাব ঘটায়।

আত্তি এসে জানায় : একজন ভদ্দরলোক ডাকছেন।

মানব কলম চালিয়ে যেতে যেতে মুখ না তুলেই বলে, ভদ্দরলোককেই এখানে নিয়ে এসো না ? আমার তো খোলা দরজা।

একবার মুখ তুলেও তাকাতে নেই বুঝি !

কলম রেখে মুখ তুলে তাকিয়ে আত্তির আহত অভিমানের মুখভঙ্গি দেখে মানব প্রায় তাজ্জব বনে যায়।

শুধু মুখ না তুলে কথা বলার জন্য আত্তিরও এমন অপমানবোধ হয়, রাগ হয় !

মানব গম্ভীর হয়ে বলে, আমি রাগ করেছি। তোমার দিকে তাকাবও না, তোমার সাথে কথাও বলব না।

আত্তি একটু হেসে চলে যায়।

ভদ্রলোককে ডেকে কাজ নেই আত্তি—আমিই যাচ্ছি।

জহরকে দেখেই মানবের মনে পড়ে যায়, তার মুখে চন্দ্রা এখন ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছেছে এবং যে কোনোদিন সাংঘাতিক কিছু করে বসতে পারে শুনে, জহরের মুখের ভাবটা কী রকম হয়েছিল !

আতঙ্কে জহরকে আজ তার কাছে টেনে এনেছে !

জহরের মুখখানা প্রায় কাঁদো কাঁদো।

কোনো রকম ভূমিকা না করেই সে বলে, চন্দ্রার ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে এসেছি। আপনি মিটমাট করে দেবেন বলেছিলেন !

মানব বলে, আমি একা নই, আমরা—আমরা মিটমাট করে দেব বলেছিলাম। চলুন চায়ের দোকানে গিয়েই বসি।

জহরকে সে রবির দোকানে নিয়ে যায়। এত দামি শাল কাঁধে এমন সুবেশধারী একজনের সঙ্গে মানবকে তার দোকানে ঢুকতে দেখে রবি আশ্চর্য হয়ে চেয়ে থাকে।

জহর বলে, কাল চন্দ্রাদের ওখানেই ছিলাম, ওখান থেকে সোজা আপনার কাছে এসেছি। আপনি বলেছিলেন না যে চন্দ্রার ধৈর্য বেশিদিন টিকবে না, একটা কিছু করে বসবে ? ভেবে-চিন্তে দেখলাম, আপনার কথাই ঠিক। এ দিকটা আমার একেবারে খেয়াল হয়নি।

এ দিকটা খেয়াল করছেন না বুঝেই মনে করিয়ে দিয়েছিলাম। খেয়াল করলে কি আর চুপ করে থাকতেন ?

তাই ঠিক কবলাম নিয়ে আসব—তারপর যা হবার হবে। আমায় নয় অমানুষ বলে ঘেন্নাই করবে।

এটা আপনার ভুল ধারণা। অমানুষ ভাবা ঘেন্না করার প্রশ্নই ওঠে না। প্রশ্ন হল, মানিয়ে নেবার—আপনি যেমন, তেমনিভাবেই চন্দ্রা আপনাকে মানবে ; চন্দ্রা যেমন, তেমনিভাবে ওকে আপনি মানবেন। দুজন মানুষের যেখানে দেহমন কোনোটার ঢাকা থাকছে না, সবকিছু জানাজানি হয়ে যাচ্ছে, সেখানে কি ও সব হিসাব চলে ? দুজনের দোষ-গুণ দুটোই দুজনকে মানতে হবে।

জহর খানিক চুপ করে থেকে বলে, ভুল কবেছি বুঝলাম কিন্তু এ দিকে যে মুশকিল হল। ওকে আনার ব্যবস্থা করার জন্যই কাল গিয়েছিলাম। চন্দ্রা পরিষ্কার বলে দিয়েছে এ জীবনে আব কোনোদিন আমার বাড়ি যাবে না।

খানিক আগে দেখা আত্তিব মুখ মনে পড়ে। কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু সে কথা বলেছিল কাগজের বুক থেকে মুখ না তুলে।

তাতেই কী রাগ আত্তির !

মানব ধীরে ধীরে বলে, চন্দ্রা তো বলবেই ও কথা, কতদিন ফেলে বেখেছেন বাপেব বাড়ি ! কতকাল ধরে অভিমানে ঘা দিয়ে আসছেন, অপমান করে আসছেন ! মেয়েদের যে মান অভিমান আছে এটা খেয়াল করতেও ভুলে গেছেন নাকি !

জহর চুপ করে থাকে।

মানব হেসে বলে, ক্ষমা চাইতে হবে, সাধতে হবে, ব্যাকুলতা দেখাতে হবে—আমি হলে চন্দ্রাব পায়ে ধরতাম। মেয়েদেব নিজেদের তো কোনো মান নেই—আমরা যেটুকু দেব সেইটুকু।

জহব চুপ করে থাকে।

মানব আবার বলে, তবে হ্যাঁ, চন্দ্রাকেও একটু বোঝানো দরকার। ওব কয়েকটা ভুল ধারণাও ভেঙে দিতে হবে। আমার মনে হয়, অপর্ণা পারবে। ওব সঙ্গে কথা বলব।

জহর কৃতজ্ঞভাবে বলে, একটা মিটমাট যদি কবে দিতে পাবেন—

মানব জোর দিয়ে বলে, পারব বইকী ! আপনি মিটমাট চাইছেন মানেই তো মিটমাট হয়ে গেছে। তবে এটাও কিন্তু বলে রাখছি— খিটিমিটি থাকবেই।

এবার জহরের মুখেও হাসি ফোটে।

প্রাক্তন দুটি বিবাহিতা ছাত্রী আর চন্দ্রাকে অপর্ণা তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে।

চন্দ্রা আশ্চর্য হয়ে বলে, হঠাৎ নেমন্তন্ন কেন ?

গেলেই বুঝবে। খাওয়া গৌণ ব্যাপার—আসল নেমন্তন্ন হল আমার কথা শোনার। একটা ভারী মজার গল্প শোনাব।

অপর্ণার কথা শুনে তিনটি মেয়ের মুখই লজ্জায় অল্প লাল হয়ে ওঠে।

তিনজনেই তারা অপর্ণার পুরানো ছাত্রী, বয়সে তারা অপর্ণার ছোটোবোন সন্তানবতী সুমিতাব চেয়ে অনেক ছোটো, তিনজনেরই বিয়ে হয়েছে অনেক দিন। অপর্ণার প্রথম ছেলেটির বয়স হবে সাত-আটবছর, যদিও তাকে দেখে আজও অনুমান করা যায় না বযস তার ত্রিশের দিকে এগিয়ে গেছে এবং বিবাহিত জীবন সে যাপন করছে দশ বছরের বেশি।

অবশ্য অপর্ণার কথা শুনে মুখ যে তাদের আজই প্রথম লাল হল তা নয়। তাদের এবং আরও অনেকের মুখ অনেকবার অপর্ণা এ রকম আরক্ত করে দিয়েছে। মুখের যেন তার আটক নেই। যে কথা সমবয়সি সখির কানে কানে বলতে পর্যন্ত সংকোচ হয়, পাঁচজনের সামনে অপর্ণা অনায়াসে অতি স্পষ্ট ভাষায় তা বলে বসে !

তবু অপর্ণাকে এরা প্রায় সকলেই শ্রদ্ধা করে।

কারণ, যাই বলুক অপর্ণা, অনাবশ্যক বাজে কথা সে কখনও বলে না তার কথা হালকা ইয়ার্কি নয়। জীবনের অতি বাস্তব গুরুতর সমস্যা নিয়ে সে কথা বলে। সংকোচহীন স্পষ্টতার সঙ্গে আলোচনা করার বিকৃত সুখ উপভোগ করাটা যে তার উদ্দেশ্য নয়, সেটাও স্পষ্টই বুঝা যায়। এ সব বিষয়ে সব রকম ন্যাকামিকে সে সবসময় তেজের সঙ্গে এড়িয়ে চলে।

আকারে ইঙ্গিতে, নানারকম হাস্যকর ঢং করে যে সব কথা বলা চলে, স্পষ্ট ভাষায় তা বলে ফেলাই কি সহজ আর সুবিধাজনক নয় ?—অপর্ণা এই মত পোষণ করে।

তাই অপর্ণার কথা শুনে পাড়ার অনেক মেয়ের দেহে অনেকবার রোমাঞ্চ হয়েছে কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষের রক্তমাংসের দেহ সম্বন্ধে অনেক কুসংস্কার আর ভুল ধারণাও তাদের কেটে গেছে, অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞানও তারা অর্জন করেছে। অপর্ণার চমকপ্রদ কথাবার্তা শুনেই যে পাড়ার একটি নবদম্পতির অশান্তিময় ভাঙা জীবন আবার জোড়া লেগে সুখে শান্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, এ খবরও অনেকে জানে। কারণ এই দম্পতিটি অপর্ণার একজোড়া অন্ধ ভক্তে পরিণত হয়েছে এবং নিঃসংকোচে নিজেরাই বন্ধু ও বান্ধবীদের কাছে প্রকাশ করেছে যে, কত তুচ্ছ কারণে তাদের জীবন নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিল এবং কত সহজে অপর্ণা তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে।

শুধু তাদের সস্তা ভুলটা বুঝিয়ে দিয়ে !

চন্দ্রা পরদিন স্বামীগৃহে যাবে।

তাকে লক্ষ করেই অপর্ণা কথা বলছিল এবং লজ্জায় সংকোচে সে-ই কাতর হয়ে পড়েছিল সব চেয়ে বেশি। তবু অপর্ণা গ্রাহ্য না করেই বলতে থাকে, তুমি বড়ো বোকা মেয়ে। নিজেকে সস্তা করার ভয়ে নিজের জীবনটা নষ্ট করতে বসেছ। একটিবার মিলনের জন্য জহরকে প্রাণপণে লড়াই করতে হয় ! নিজেকে সস্তাই যে করে ফেলনি তাই বা কে জানে ? হয়তো জহরের মনে ধারণা জন্মে গেছে ভেতরে ভেতরে তোমার কোনো অসুখ-বিসুখ আছে, নইলে এই বয়সে বিয়ের প্রথম বছরে—

অপর্ণা চুপ করে মিনিটখানেক ভাবে। তারপর একটু হেসে বলে, তোমাকে বোকা বলছি, আমিও তোমার মতোই বোকা ছিলাম। শোনো আমার বোকামির গল্প—তাহলে নিজের ভুল বুঝতে পারবে।

বোকামি করে এমন ভুল করেছিলাম যার ফলে জীবনের সব সুখ শান্তি আমার ধ্বংস হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। ভুলটা করেছিলাম তোমারই মতো—নিজেকে সস্তা করব না, স্বামীর কামনাকে সবসময় চড়া পর্দায় চড়িয়ে রেখে তাকে একেবারে আমার গোলাম করে রাখব। অল্প বয়েস, বুদ্ধি কম, তাই স্কুলকলেজে বন্ধুদের কাছে পুরুষ সম্বন্ধে যে সব তত্ত্বকথা শুনতাম তাই মন দিয়ে বিশ্বাস করতাম। বিয়ের রাত্রেও একটি বন্ধু আমার কানে কানে বলে দিয়েছিল, খবর্দার, চাওয়ামাত্র ধরা দিয়ে নিজেকে সস্তা করবি না ! মনে রাখিস, নিজের তুই যত দাম করবি পুরুষ তোকে তত দাম দেবে। আমি শুনে শুধু একটু হেসেছিলাম। কারণ, তখন আমার ধারণা ছিল যে এ সব বিষয়ে জানতে কী আর আমার কিছু বাকি আছে। মানুষের মন যে কী দুর্বোধ্য জটিল জিনিস তা কি তখন জানি ?

তিনজনে গভীর মনোযোগ দিয়ে তার কথা শোনে। চন্দ্রা প্রথমে উশখুশ করছিল, এখন সে হাতে মুখ রেখে সামনে ঝুঁকে স্থির হয়ে বসেছে।

অপর্ণা হাসে, প্রথমেই তোমাদের বলে রাখি, নিজেদের সস্তা না করা মেয়েদের একটি অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সব মেয়েই জানে প্রেমিকের কাছে নিজের দাম কমাতে নেই। জেনে হোক আর না জেনে হোক সব মেয়েই নানাভাবে প্রেমিকের কাছে নিজের আকর্ষণ বাড়াবার জন্য, নিজের প্রভাব বাড়াবার জন্য চেষ্টা করে। এটা দোষের কিছু নয়, এটা প্রকৃতিরই একটা নিয়ম। নিচু স্তরের জীবের মধ্যেও এ নিয়ম দেখতে পাওয়া যায়।

চন্দ্রা প্রশ্ন করে, নিযমটা কেন ?

স্ত্রীপুরুষ দুরকম জীব বলে।

ও !

কিন্তু সব জিনিসের সীমা আছে। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা এমন দাঁড়িয়েছে যে প্রস্তুতির কোনো নিয়ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে ভাবি যে খুব বাহাদুরি করছি, কিন্তু সেটা সে প্রকৃতির নিয়মভঙ্গ করা হচ্ছে তা আমাদের মাথায় ঢোকে না।

অপর্ণা একটু থামে।

আমাদের মধ্যে সত্যি ভালোবাসা জন্মেছিল। তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে দুজনে মিলে নীড় বাঁধবার জন্য আমরা দুজনেই পাগল হয়ে উঠেছিলাম। বিয়ের রাত্রে আমরা দুজনেই যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। কিন্তু তখন আমার এল পাগলামি। পাছে ভালোবাসার বাঁধন ঢিল হয়ে যায়, ওঁর আগ্রহ ঝিমিয়ে আসে, বেশি পেয়ে আমাকে সস্তা মনে হয, এই ভয়ে আমি হঠাৎ ভয়ানক সংযত হয়ে গেলাম। সংযম না ছাই, একটা বিপজ্জনক খেলা আরম্ভ করে দিলাম আব কী ! তুমিও খুব সম্ভব জহরের সঙ্গে এই রকম একটা খেলা আরম্ভ করেছিলে চন্দ্রা !

চন্দ্রা চুপ করে থাকে।

উনিও আমার অনিচ্ছার মর্যাদা দিতেন। এমনিভাবে দিনের পর দিন অতৃপ্তি দিয়ে কদাচিৎ ওঁর কাছে ধরা দিতাম। তাও এমন ভাব দেখাতাম যেন কেবল ওঁর মুখ চেয়ে মস্ত একটা কুৎসিত কাণ্ড মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছি। উনিও যেন মস্ত বড়ো একটা অপরাধ করছেন এমনিভাবে কেমন যেন লজ্জিত আর অপরাধী হয়ে পড়তেন। আর এমন মূর্খই আমি তখন ছিলাম যে ওঁর ও রকম ভাব দেখে খুশি হয়ে ভাবতাম, আমি যেন অনেক উঁচুতে উঠে আছি আর উনি নীচে নেমে গেছেন, এটা যখন উনি বুঝতে পারছেন, এবার থেকে ওঁর শ্রদ্ধা ভালোবাসা নিশ্চয় আরও বেড়ে যাবে। তাছাড়া, আমার সঙ্গলাভের জন্য ওঁর ব্যাকুলতাও যে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে সেটাও বেশ বুঝতে পারছিলাম।

আমার প্রতি ওঁর আকর্ষণ বাড়ছে এই সব ভেবে মনকে বুঝালেও তলে তলে কেমন একটা গভীর অতৃপ্তি আমাকেও কিন্তু পীড়ন করত। কাজকর্মে মন বসত না, গল্পগুজব বই পড়া ভালো লাগত না, মাঝে মাঝে ওঁর আদর পর্যন্ত বিস্বাদ লাগত। সব সময় কেমন একটা অস্বস্তি আর অভাব বোধ করতাম। এটা বুঝতে অবশ্য আমার সময় লেগেছিল, কারণ, তখন মনে মনে আমার বিশ্বাস ছিল—আমি পরম সুখী, নিজের চেষ্টায় নিজের দাম্পত্য জীবনকে আদর্শ জীবনে দাঁড় করাতে পেরেছি। নিজের ভেতরের ছটফটানিটা স্পষ্টভাবে বুঝতে আমার বছর খানেক কেটে গেল। তখনও অবশ্য বুঝতে পারলাম না, কী জন্য আমার ও রকম লাগে।

ততদিনে তিনি অনেক বদলে গেছেন। বদলে গেছেন মানে যে আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছেন বা আমাকে অবহেলা করতে আরম্ভ করেছেন, তা নয়। কতকটা যেন আমার মন জুগিয়ে চলবার জন্যই নিজেকে সামলে চলেন, মিলনের জন্য আগের মতো আর ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন না। আমি দেহটা তুচ্ছ করি, তিনিও যেন সেই জন্যই দেহটা তুচ্ছ করতে আরম্ভ করেছেন। রাত্রে ঘরে

এলে খিল দেওয়ামাত্র আগের মতো আর দুহাতে আমাকে বুকে জড়িয়ে হাজার খানেক চুমু খান না, বেশ ভদ্রভাবে সন্তর্পণে আদর করেন। কোনো রকম ঝগড়াঝাঁটি বা সামান্য মনান্তরও কখনও হত না। আগের মতো দরকারের চেয়ে বেশি শাড়ি-ব্লাউজ, সাবান পাউডার-স্নো-ক্রিম এনে দিচ্ছেন, বেড়াতে আর সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন, হাসিমুখে কথা বলছেন, তবু যেন আমার মনে হত মানুষটা কেমন ঝিমিয়ে যাচ্ছে, তফাতে সরে যাচ্ছে।

তাছাড়া বাইরে সময় কাটানোর স্বভাবটাও তাঁর বাড়তে লাগল। শেষে একদিন রাত্রে বাড়িই ফিরলেন না। কৈফিয়ত দিলেন যে বন্ধুর বাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। দোকান থেকে একেবারে চুল ছাঁটিয়ে, দাড়ি কামিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন, তবু মুখখানা বড়ো বেশি শুকনো দেখাতে লাগল। আমার মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল।

কয়েক দিন পরেই আবার রাতে বাড়ি ফিবলেন না। তারপর দু-চারদিন পরে-পরেই, রাত্রিটা বাইবে কাটিযে আসতে লাগলেন। আমার যে তখন কী অবস্থা হল বুঝতেই পাবছ ! একেবারে যেন হতভম্ব হয়ে গেলাম। কেন এমন হল কিছুই বুঝতে পাবলাম না। আমার মুখের দিকে চেয়ে যিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন, একটা রাত আমায় ছেড়ে থাকতে হলে যাঁর প্রাণ ছটফট করত, তিনি আমায় ফেলে সরারাত বাইরে হইচই করে কাটাতে আবম্ভ করেছেন।

দাম বাড়ার বদলে এতই দাম কমে গেল আমাব !

প্রথম কিছুদিন রাত্রিটা বাইরে কাটিয়ে সকালে অথবা বিকালে একেবারে আপিস থেকে বাড়ি ফেববার সময় নিজেকে ভালো করে মেজেঘষে আসতেন, আমি যাতে চেহাবা দেখে কিছু টের না পাই। কিন্তু একদিন রাত প্রায় তিনটার সময় মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফিরলেন। ধরাধবি কবে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আমি কাঁদতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি, তিনিও উঠে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে আবম্ভ কবেছেন। দেখেই আমার কান্না বন্ধ হয়ে গেল। আমি ভাবলাম, মাতাল অবস্থায় আমার কান্না দেখে বুঝি বাঙ্গ করছেন।

ধমক দিয়ে বললাম, কী মাতলামি আবম্ভ করেছ ?

তখন তিনি কত কথাই যে বললেন। অবশ্য নেশার ঘোরে জড়িয়ে জড়িয়েই কথাগুলি বললেন, মাতাল অবস্থায় সে রাত্রে বাড়ি না ফিরলে হয়তো কোনোদিন আমায় বলতেন না। সব কথা তোমাদের শুনে কাজ নেই, আসল কথাটা শোনো। তিনি বললেন, আমি সত্যি পশু, অপর্ণা। কিছুতে নিজের পশু প্রবৃত্তি চেপে রাখতে পারি না। কিন্তু তুমি তো আমার বউ, আমার সন্তানের জননী হবে তুমি, তোমায় কী করে নীচে নামাই ? তাই বাইবে একটু হইচই কবে আসি, আমায় তুমি মাপ করো।

আরও অনেক কথা বলতে বলতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। বাকি রাতটা আমি জেগেই কাটিয়ে দিলাম। কত কথাই যে ভাবতে লাগলাম তার ঠিকানা নেই। ওঁর এই অবস্থার জন্য কে দায়ি বুঝতে আমার আর বাকি রইল না। সকালে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে প্রথম খেয়াল হল, এতদিন ওঁর ওপর কী অত্যাচারই করেছি। বেঁধে মারার একটা কথা আছে না ? এত দিন তেমনিভাবে মেরেছি ওঁকে। মনের জোর ওঁর কম নয়, আমি যদি তফাতে থাকতাম বা অসুখ হয়ে পড়ে থাকতাম তাহলে কোনো কথা ছিল না, কিন্তু প্রথম যৌবনের লাবণ্যে ঢলঢল শরীর নিয়ে সর্বদা চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কত রকম ভালোবাসার খেলা খেলছি, পাশাপাশি শুয়ে রাত কাটাচ্ছি, সবসময় ওঁকে উত্তেজিত করে তুলছি, অথচ ধরা দেওয়ার বেলায় আমার আসছে পাগলামি !

ভাবতে ভাবতে এ কথাটাও বুঝতে পারলাম, তিনি যাকে নিজের পশুবৃত্তি ভেবে নিজেকে অশ্রদ্ধা করছেন, সেটা এ রকম অবস্থায় এমন প্রচণ্ড না হয়ে উঠলেই বরং ওঁকে অসুস্থ মনে করা চলত। একজন সুস্থ সবল জোয়ান মানুষ, সে যে একটি মেয়েকে ভালোবেসে তাকে বিয়ে করে এনে

যোগী ঋষির মতো ঠান্ডা হয়ে থাকবে, উত্তেজনাবোধ করবে না, পাগল ছাড়া এমন কথা কে ভাববে ? আর দিনের পর দিন সেই উত্তেজনা অতৃপ্ত থাকার ফলে মানুষ যদি বিগড়ে যায়, তাতেই বা আশ্চর্যের কী আছে !

আমি বুঝতে পারলাম, নিজের যা ক্ষতি আমি করেছি, নিজেকেই আমায় তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। ওঁর ঘুম ভাঙতে অনেক বেলা হল। লজ্জায় চোখ তুলে আমার দিকে তাকাতে পারলেন না, যেন অপরাধটা সমস্ত ওঁর, আমার কোনো দোষ নেই।

অনেকক্ষণ পরে বললেন, কাল তোমায় অনেক বাজে কথা বলেছিলাম, না ?

আমি সহজভাবে বললাম, না দামি দামি কথা বলেছ, দরকারি কথা বলেছ, অনেক আগেই তোমার ও সব কথা আমায় বলা উচিত ছিল।

তারপর ওঁকে তিন মাসের ছুটি নেওয়ালাম। পরদিন জিনিসপত্র বেঁধে চলে গেলাম পুরী। সেইখানে আমাদের হনিমুন আরম্ভ হল—বিয়ের এক বছর পরে।

এক বছর ধরে যে অস্বাভাবিক অবস্থায় দুজনের জীবন অশান্তি আর অতৃপ্তিতে ভরে উঠেছিল, তিন মাসেই সেটা কেটে গিয়ে আমাদের জীবন আনন্দে, তৃপ্তিতে ভরে উঠল। ওর ভালোবাসা আর আকর্ষণও যেন মাঝখানের ঝিমানো ভাবটা কাটিয়ে দিন দিন বেড়েই চলতে লাগল। দেখলাম যে প্রেমিককে বঞ্চিত করেই শুধু নিজের দাম বাড়ানো যায় না।

চন্দ্রা মুখ তুলে বলে, নিতে যদি নাও আসে, আমি নিজেই কাল যাব অপর্ণাদি।

৭

নানাস্তরের ছোটোবড়ো নানারকম সাহিত্যিক সভা বৈঠক ও আড্ডায় মানব মাঝে মাঝে যাতায়াত করে—তাকে যেতে হয়।

প্রধানত সাহিত্য করার প্রয়োজনেই। কিন্তু তার খেয়ালও হয় না যে প্রধানত কালাচাঁদের লেখক হবার সাধকে কেন্দ্র করে কীভাবে তারই আস্তানায় গড়ে উঠেছে একটা ঘরোয়া বৈঠক—সে খালেক আর দু-চারজন লিখিয়েদের নিয়ে।

কালাচাঁদ উপস্থিত থাকবার এবং নানারকম প্রশ্ন করবার অনুমতি পেয়েছে। তবে প্রশ্ন সে করে কম, অনেক বেশি মনোযোগ দিয়ে তাদের তর্ক ও আলোচনা শোনে।

নিজের লেখা যখন খুশি পড়ে শোনাবার ঢালাও অনুমতিও তাকে দেওয়া আছে। কিন্তু সুযোগটা সে কাজে লাগায় খুব কম।

মানব জিজ্ঞাসা করে, লেখার চেষ্টা করছ না কালাচাঁদ ?

করছি বইকী ! হবে না জানা কথা, চেষ্টা করে দেখতে ছাড়ব না।

লেখা পড়ে শোনাও না কেন ?

শোনাবার মতো লেখা কি আর হচ্ছে মানুবাবু ?

সেদিন খালেক আর সুরেন এসেছিল একটা গুরুতর পরিকল্পনা নিয়ে দেশভাগ হয়ে গেছে তার আর চারা নেই, কিন্তু একালের হিন্দু-মুসলমানে যে সেকেলে সস্তা অমিল নেই এটা দেখাবার জন্য একটা কাব্য সংকলন বার করলে দোষ কী ?

কতকাল ধরে হিন্দু-মুসলিম কবিরা পাশাপাশি মূলত একই ভাষাভিত্তিক ভাবের ও ধারার কবিতা ও গান রচনা করে এসেছে একই বাংলা মাতৃভাষা বলে তাদের কাব্যে ঐতিহ্যের ছাপ আর পরিবর্তনের ধারা যে মূলত একই সেটা সাজিয়ে গুছিয়ে তুলে ধরা।

এ কাজ যে কত কঠিন এবং কীভাবে এ কাজ যে করা সম্ভব, তাই নিয়ে তিনজনে যখন তর্ক আর আলোচনায় মশগুল, স্কুলবইয়ের মরশুমের সময়কার ডবল শিফ্‌টের হরফ সাজানো আর হরফ সংশোধনের ডিউটি দিয়ে এসে, শুধু হাতটা ধুয়ে নিজের লেখা একটা গল্প তাদের পড়িয়ে শোনাতে এসে কালাচাঁদ আলোচনার গতি পালটে দেয়।

দুর্ভিক্ষের একটা গল্প লিখেছে কালাচাঁদ।

পুতুল মরার আগে উমাকান্তের লেখা একটা গল্প পুতুল মরার পর ছাপা হয়েছে—সেই গল্প পড়ে কালাচাঁদ নিজে একটা গল্প লিখেছে।

গতবারের মহান ভীষণ দুর্ভিক্ষের ব্যাপার নিয়ে লেখা গল্প। উমাকান্ত মাঝে মাঝে মন্বন্তর নিয়ে গল্প লেখে।

গল্পটি ছাপা হয়েছিল রস সাহিত্য পত্রিকায়। কম্পোজ করেছিল কালাচাঁদ নিজে।

একটু ফ্যানের জন্য কাতারে কাতারে লাইন দিয়েও, লাখের হিসাবে মানুষ মরেছে যে দুর্ভিক্ষে—সেই মন্বন্তরকে মহান বলা ! বীভৎস মৃত্যুর আঘাতে জাতির চেতনা জাগিয়ে দিয়েছে বলে !

হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল কালাচাঁদ।

জাতির চেতনা তবে এমনিভাবে মরার ঘায়ে জাগে !

কে জানে লেখকেরা কীভাবে চিন্তা করে সংসারের ছোটোবড়ো ব্যাপার নিয়ে !

গল্প শুনিয়ে কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করে ভালো হয়নি জানি, কিন্তু গল্প হয়েছে কি ?

মানব বলে, না গল্প হয়নি। তুমি শুধু তোমাব নিজের প্রাণের জ্বালাটা প্রকাশ করেছ।

আপনি হলে কীভাবে গল্পটা সাজাতেন মানুবাবু ?

আমাব কত গল্প পড়েই তো দেখছ কী করে সাজাই !

কালাচাঁদ হেসে বলে, তা নয়। আমার এই বিষয়টা নিয়ে লিখতে চাইলে কী লিখবেন, ধরবেন কী করে ?

খালেক এবং মানবও হাসে।

চাদ্দিকে কী হচ্ছে-না-হচ্ছে দেখে শুনে হদিস পাই, কী নিয়ে কী লিখতে হবে। মানুষ কে আসবে, কী ঘটনা ঘটবে ভেবে সাজিয়ে নিই—খেয়াল রাখি যাতে গল্প হয়।

কালাচাঁদ খালেককে প্রশ্ন করে, কবিতাও তাই ?

খালেক বলে, নিশ্চয় ! কী নিয়ে কবিতা লিখব সেটা আগে ভাবি, তারপর ঠিক করি কী করে ভাবনাটা সাজালে কবিতা হবে।

কালাচাঁদ চিন্তিত হয়ে বলে, গল্পের গল্প হওয়া চাই, কবিতার কবিতা হওয়া চাই—এ তো সোজা কথা বললেন। এটা বুঝতে তো কষ্ট নেই। কিন্তু কী বলবেন আর কী করে সাজিযে গল্প কবিতা করবেন—দুটো একসাথে মিলিয়ে ভাবেন কী করে ? ভাবতে গেলে মোর মাথা ঘুরে যায় বাবু !

খালেক মিষ্টিসুবে বলে, আমাদেরও একদিন তোমার মতো মাথা ঘুবে যেত কালাচাঁদ। ব্যাপারটা বুঝেছি কিন্তু ভাবটাকে কী বকম চেহারা দেব ভেবে আজও মাথা ঘুরে যায়। তুমি ভাবছ দুটো বুঝি ভিন্ন—তা কিন্তু নয় কালাচাঁদ। শোনো, তোমায় বুঝিয়ে বলি। গল্প কবিতা লেখার কায়দাই হল—যা বলব অর্থাৎ যেটা হল ভাবনা—সেটাকে গল্প কবিতার চেহারা দিয়ে ভেবে চলা, যেমন তুমি দুর্ভিক্ষ নিয়ে লিখেছ—তোমার ভাবটা হল, না খেয়ে তিলতিল করে মরাটা যে কী ভীষণ ব্যাপার, যারা দুবেলা খায় তারা বুঝতে পারবে না। এই ভাব নিয়ে তুমি যা ভেবেছ সেগুলি গল্পের চেহারায় ভাবা হয়নি।

কালাচাঁদের গোটা গোটা হস্তাক্ষরে লেখা কাগজগুলি তুলে নিয়ে খালেক আবার বলে, তুমি আরম্ভ করেছ : ওই যে ফুটপাথের ধারে ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়া কঙ্কালসার মানুষটা ধুঁকিতেছে

উহার কী যন্ত্রণা হইতেছে আমি কেমন করিয়া বুঝিব ? যেমন হোক দুইবেলা আমি শাকভাত খাইতে পারি। এইভাবে মাঝে মাঝে তুমি লোকটার কথা উল্লেখ করেছ আর নানাভাবে তোমার মূল ভাবটা প্রকাশ করেছ। শেষ করেছ এই বলে যে, তিন দিন পরে লোকটিকে ওখানেই পড়ে পড়ে থাকতে দেখে তুমি ভাবছ—উপোস দিয়ে মরণ না হলে তুমি মরেও ওর যন্ত্রণা বুঝতে পারবে না।

খালেক একটু থামে। কালাচাঁদ যে কী আগ্রহ ও মনোযোগের সঙ্গে তার কথা শুনছে লক্ষ করে সে একটু আশ্চর্য হয়ে যায়।

বলে, ভাবটা সুন্দর, মাঝে মাঝে ঝাঁঝটা ফুটেছে চমৎকার কিন্তু গল্প আছে কতটুকু ? একজন দুর্ভিক্ষপীড়িত লোক ফুটপাতে বসে ঝুঁকছিল, তিন দিন পরে দেখা গেল যে সে মরে পড়ে রয়েছে।

মানব খুশি হয়ে বলে, বাঃ, তুই তো চমৎকার বলেছিস খালেক ! আমি ভেবেই পাচ্ছিলাম না কীভাবে ওকে বোঝাব যে কেন এটা গল্প হয়নি, কেন এতে গল্প নেই। বুঝতে পেরেছ তো কালাচাঁদ ? খেতে না পেয়ে একজন ফুটপাতে ধঁকছে, তিন দিন পরে মরে গেল—শুধু এইটুকু নিয়ে কি গল্প হয় ? এ তো সবাই দেখেছে, দেখে সবার প্রাণেই জ্বালা ধরেছে—গল্পে আরও অনেক কিছু দিতে হবে, পড়ে যাতে সকলে বুঝতে পারে যে ফুটপাত ধুঁকতে ধুঁকতে একজনের মরণ দেখে জ্বালা শেষ করাটাই সব নয়, সংসারের আরও অনেক বিরাট ব্যাপার এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে, এ মরণের মানে আরও গভীর।

বুক ফেটে যেতে চেয়েছে কালাচাঁদের। আরেকটুকু যদি লেখাপড়া কেউ তাকে শেখাত !

আরেকটু বিদ্যা যদি তার পেটে পড়ত !

স্কুল থেকে ছিনিয়ে এনে তাকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল সিসাব অ-আ ক-খ-আকার-ইকার সাজাবার কায়দা শিখতে।

মানব বলে, হাল ছেড়ো না, গল্প লেখাও অনেক চেষ্টা করে শিখতে হয়। তোমার কয়েকটা ভালো ভালো নামকরা গল্প পড়া উচিত। এমনি পড়লে হবে না, কেটে কেটে খুটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে হবে। বিষয় কী, ঘটনা কী, চবিত্র কেমন, কীভাবে গল্প সাজানো হয়েছে—

কালাচাঁদ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, থাক, আর গল্প লিখে কাজ নেই মোর। আমাব অনেক ভাগ্যি যে আপনাদের লেখা কোনোমতে পড়তে পারি।

মানব স্থিবদৃষ্টিতে তার বকম-সকম লক্ষ করতে করতে বলে, কী বলতে চাও ঠিক বুঝতে পারছি না ভাই। কথাটা হল লেখাপড়া। লেখা আর পড়া একসাথে চলে—যে ক-খ লেখে সে ক-খ পড়ে। যে বড়ো জ্ঞানের বই লেখে সে বড়ো জ্ঞানের বই পড়ে। কিন্তু ব্যাপারটা কী খোলসা করে বলো তো শুনি ?

ওমনি করে তলিয়ে বুঝে গল্প পড়ার বিদ্যা পেটে আছে ? কে পড়াবে, কে বোঝাবে ?

মানব হেসে ওঠে—আমবা পড়াব—আমরা আছি কী করতে ? ভাবছ কেন—স্কুলের মতো পড়া নয় ! তোমায় আগেই তো বলেছি, আমাদের মতো পণ্ডিতদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লিখতে চাইলে তোমার চলবে না। তোমায় কি আর ও রকম সূক্ষ্মভাবে বিচার করে গল্প পড়তে বলছি ? তুমি গল্প লেখার মোটা মোটা কায়দা বুঝবার চেষ্টা করবে। যা বুঝবে না, আমাদের জিজ্ঞাসা করবে।

কালাচাঁদ খুশি হয়ে বলে, জ্বালাতন হবেন না তো ?

এবারের রস সাহিত্য পত্রিকায় মানব ও খালেকের দুটি লেখা ছাপা হয়েছে। দুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখা গল্প এবং কবিতা। লেখক কবিমানুষ, কালাচাঁদের দুর্ভিক্ষের গল্প না হলেও লেখাটার মধ্যে যে প্রাণের জ্বালা প্রকাশ পেয়েছিল সেটা মর্ম স্পর্শ করেছিল। পরামর্শ করে না লিখলেও দুজনেই বোধ হয় তাই দুর্ভিক্ষের গল্প আর কবিতা লিখে ফেলেছে !

মহেশ পড়ে বলেছিল, তোমরা কি পরামর্শ করে লেখো নাকি ? দুজনেই তো এক ছবি এঁকেছ। এক সুর গেয়েছ। একটা গল্প আরেকটা কবিতা—এইটুকু শুধু তফাত।

ছোটোগল্প আর কবিতা খানিকটা সমধর্মী।

এই নিয়ে তুমুল তর্ক বেধে যেতে পারত কিন্তু তর্ক বাধাবাব মতো অন্য কেউ উপস্থিত ছিল না।

মহেশ তর্ক করে না।

মাঝে মাঝে লাগসই মন্তব্য করে, তর্ককে আরও উছলে দেয় কিন্তু নিজে কখনও তর্কে যোগ দেয না—না তার খোলা সম্পাদকীয় দপ্তরে, না নিজের বাড়ির বৈঠকে।

দুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখা গল্প-কবিতা।

কবিতাটি আবার একজন মুসলিম তরুণের লেখা। তবে গল্পটি শুধু দুর্ভিক্ষের চিত্র—কবিতাটিও দুর্ভিক্ষেব ক্ষুধাব কাব্যরূপ।

একটু ইতস্তত করে মহেশ গল্প আর কবিতা ছেপে দেয়।

দুটি লেখাই বড়ো সুন্দর হয়েছে। মনকে অভিভূত করে, নাড়া দেয়।

এতকাল পরের কাগজে সম্পাদকত্বের জোযাল ঘাড়ে নিয়ে বুড়ো হতে চলেছে, লেখা দুটো পড়ে তার প্রাণটাও আনচান করে উঠেছে।

কবিতাটি খালেক লিখেছে বিছানায় শুয়ে। শখের শোয়া নয়, রোগের বাধ্যতামূলক শোযা। কী রোগ সেটা সঠিক জানা যায়নি। তবে জানবার জন্য যথানিয়মে পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেই অবশ্য জানা যাবে। কী রোগ হয়েছে সেটা ঠিকভাবে পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা করাও কী সোজা হাঙ্গামা, সহজ দায় এ দেশের গরিব মানুষের পক্ষে।

তবে খালেকেব কী হয়েছে সেটা প্রায় সকলেই অনুমান করতে পেরেছিল, মানবও টের পেয়েছিল। একটা জোয়ান মানুষ কী দিন দিন অকারণে রোগা হযে যায় ? তার অল্প জ্বর হতে শুরু করে ? অকাবণে থেকে থেকে কাশে ?

কেশে কেশে রক্ত তোলার অবস্থায় পৌঁছোতে শুধু বাকি।

খালেকের মতো তারও বিছানা নিতে ক-মাস ক-বছর বাকি আছে কে জানে !

কবিতাটি সেখানেই লেখা—তাকে দেখতে গিয়ে মানব নিজে এসেছিল।

একটা খটকা লেগেছিল মানবের মনে। কোন কাগজে দেবে তার গল্প আর খালেকের কবিতাটি ?

মহেশের কাগজে দেওয়ার কোনো সার্থকতা আছে কী ? ছাপতে মহেশ সাহস পাবে কি ?

হঠাৎ সে ডেকে পাঠিয়েছিল আত্তিকে।

তখন দুপুরবেলা। আত্তির মা যে ঘরে ছিল না, ভোরে উঠেই বোনের বাড়ি গিয়েছিল, এটা মানবের জানা ছিল না।

আত্তিকে ঘরে ডাকা যায় না, কারণ, কাজটা দু-চারমিনিটে শেষ হবে না—আত্তিকে বেশ খানিকক্ষণ থাকতে হবে। বেশির ভাগ পুরুষেরা কাজে গেছে, যার কাজ নেই সেও বেরিয়েছে কাজের চেষ্টায়।

চোখ পাতা আছে মেয়েদের। এই সব মেয়েদের চোখ আর মনকে মানব চেনে। বেচারাদের সে দোষ অবশ্য এতটুকু দেয় না, সে জানে যে মনের এই গড়নের জন্য ওরা নিজেরা দায়ি নয়।

দরজা যে সটান খোলা এটা হয়তো ওদের চোখেই পড়বে না, অথবা চোখে পড়লেও মন সেটা গ্রাহ্য করবে না।

খাঁখাঁ দুপুরে আত্তি অনেকক্ষণ তার ঘরে একলা ছিল এটাই শুধু চোখ দেখবে এবং মন বুঝবে।

রোয়াকে উবু হয়ে বসে অব্দাত্তিকে বসতে বলে মানব বলে, একটা গল্প আর একটা কবিতা শোনো দিকি আত্তি—কেমন লাগে বলবে। পড়তে পারো না—তোমায় নিয়ে এই তো হয়েছে মুশকিল।

আত্তি খুশি হয়ে মাটিতে জাঁকিয়ে বসে।

প্রথমে মানব কবিতাটি পড়ে শোনাতে যায়।

তখন কোথা থেকে এসে দাঁড়ায় কুঞ্জর মা। বেঢপ রকমের মোটা প্রৌঢ়বয়সি বিধবা—যেমন ঝগড়াটে তেমনি কড়া মানুষ মেয়েবউদের চালচলনের ব্যাপারে।

কী হচ্ছে বাছা তোমাদের ?

মানব হেসে বলে, ব্যাপার কিছুই হচ্ছে না মাসি, বলি শোনো। কাগজে ছাপাবার জন্য একটা রূপকথা লিখেছি আর একটা ছড়া লিখেছি। লিখেছি গরিব মুখ্যুদের জন্যে। তা ভাবলাম কী, পেটে তো বিদ্যে জমিয়েছি ঢের, অল্পস্বল্প লেখাপড়া শিখেছে যারা, তারা পড়ে বুঝতে পারবে তো কী লিখেছি ? মুখ্যু মেয়েটাকে তাই শোনাচ্ছি রূপকথা আর ছড়াটা। ও যদি না বুঝতে পারে তবে বুঝব ঠিকমতো ফাঁদা হয়নি।

মানব আবার হেসে বলে, তুমিও বসো না মাসি, শুনে বলো না কেমন লাগল ? তোমার পেটেও তো বিদ্যের বালাই নেই, তুমিও যাচাই করতে পারবে কেমন হয়েছে।

কুঞ্জর মা ফোলাফোলা চামড়া-ঝোলা মুখে গালভরা হাসি হাসে।

সামান্য একটুখানি হাসি তার মুখে কোনোদিন দেখেছে কিনা মনে করতে পারে না মানব।

দেঁড়িয়ে দেঁড়িয়েই শুনছি বাবা।

খালেকের কবিতাটি আবৃত্তি করে শুনিয়ে মিনিট খানেক চুপচাপ দুজনের মুখের ভাব লক্ষ করে মানব আত্তিকে জিজ্ঞাসা করে, কেমন লাগল ?

আত্তি বলে, ইস্ ! খিদের জ্বালায় এমন করে মানুষ ! তা সত্যিই তো, করেই তো !

কুঞ্জর মা-কে প্রশ্ন করতে হয় না, সে নিজেই কপাল চাপড়ে বলে, পোড়া পেটের ঝঞ্ঝাট—বাবা রে !

মানব তারপর নিজের গল্পটা পড়ে। আত্তি আর কুঞ্জর মা-র থমথমে মুখের দিকে চেয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না মানবের।

আত্তি ঢোক গিলে কাঁপাকাঁপা জড়ানো গলায় বলে, ছড়াটা আরেকবার শোনাও দিকি ?

মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। তাদের মুখের দিকে চেয়ে কবিতাটি আরেকবার আবৃত্তি শুরু করার পরই দুজনের চোখে জল জমে ঝরে পড়ার প্রক্রিয়াটা দেখতে দেখতে মানবের গলাও কেঁপে যায়।

আবৃত্তি শেষ হওয়ামাত্র দুজনের তারা একভাবে কিন্তু দুরকম ভাষায় যেন ফেটে পড়ে—যার মর্মার্থ হল : কেন ? কেন ? কেন না খেয়ে মরবে মানুষ ?

তারা মরুক, ভিটেয় তাদের শকুনি চড়ুক, সর্বাঙ্গে তাদের কুষ্ঠ হোক যারা মানুষকে খেতে না দিয়ে মারে !

প্রায় হতভম্ব মানব ভাবে, ও বাবা, আমি তো তবে সহজ লেখক হইনি ! খালেক তো সহজ কবি হয়নি !

কালাচাঁদ গল্প লিখতে চায়, তার কাছে গল্প লেখার কায়দা শিখতে চায়—প্রায় গুরুর মতোই তাকে সম্মান করে।

কিন্তু মুখ্যুদের জন্য লেখা গল্প কবিতা তার বয়স্থা মেয়েকে প্রকাশ্যভাবে দাওয়ায় বসে কুঞ্জর মা-র চোখের সামনে লেখা দুটো পড়ে শুনিয়ে যাচাই করবার চেষ্টা করলে কালাচাঁদ যে এমন ভীষণভাবে রেগে যাবে, মানব তার কল্পনাও করতে পারেনি।

কালাচাঁদ যেন অমানুষ হয়ে গেছে।

কী রাগত ভাব কালাচাঁদের ! কী কটাংকটাং কথা !

আবছা ভোরে উঠে দরজা খুলতেই মানব দেখতে পায়, রোয়াকে কালাচাঁদ উবু হয়ে বসে আছে।

কী ব্যাপার ভাই ?

বলে মানব দাঁতনটা চিবোতে শুরু করে।

মেয়েটাকে টানাটানি ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না মানুবাবু ! আত্তির মা বলেছিল সেবারের ব্যাপার, আমিও তোমায় জানি। আমার কোনো ডর নেই। কিন্তু পাঁচজনে তো বুঝবে না !

বুঝেছি ব্যাপার।

ছোটো তো নেই—একলাটি থাকে। এইটুকু মেয়েকে ফুসলাবার জন্য ক-টা বজ্জাত যে উঠে পড়ে লেগেছে কী বলব তোমায় মানুবাবু।

আমি জানি না ? করুক না একটু বাড়াবাড়ি ! আত্তির সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে গেলে ভালো করে টের পাবে যে মানুবাবু শুধু কলম পেষে না, ডান্ডা চালাতেও জানে।

জোরে জোরে মাথা নেড়ে কালাচাঁদ বলে, না না, সে ব্যাপার নয়। তোমায় কেন ডান্ডা চালাতে হবে ? কুঞ্জর মা দেখছে না মেয়েটাকে ? ওর মুখের তোড়ে ভেসে যাবে না বজ্জাত ক-টা ?

কালাচাঁদ আবার সখেদে মাথা নাড়ে।

মানব একটু দমে গিয়ে বলে, কী তবে ব্যাপারটা ? আত্তিকে তো একলা ডেকে লেখা শোনাইনি ? কুঞ্জর মা সাথে ছিল।

ওরা রটাচ্ছে, তুমি উছলে উছলে বিগড়ে দিয়ে মেয়েটাকে বাগাবার চেষ্টা করছ।

ব্যাপারটা তাহলে সত্যই গুরুতর দাঁড়িয়েছে !

সিসার হরফ সাজানোর কাজে টাইম আর ওভারটাইম মিলিয়ে সারাদিন খাটে যে কালাচাঁদ, তার কথা বলার ভঙ্গি আর ভাষার বাঁধুনি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় মানবের !

আত্তি আর তাকে নিয়ে সস্তা একটা ছ্যাঁচড়ামির পালা শেষ হয়ে চুকেবুকে যাবে দুদিনে—কিন্তু কালাচাঁদের এমন নিখুঁত সুন্দর জীবন্ত ভাষায় কথা বলা তো সম্ভব হয়নি এতকাল—এই অদ্ভুত ব্যাপারের জের তো দু-চারবছরে মেটার নয় !

আত্তির প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায় মানব।

তুমি কদ্দুর পড়েছ কালাচাঁদ ?

এইটে উঠলাম, বাবার হল অসুখ। লেখাপড়া হবে না টের পেয়েছিল নিশ্চয়, স্কুল ছাড়িয়ে বলল, পড়ে তোর ঘোড়া হবে, হাতের কাজ শিখবি যা, খেটে খাবি। আট-নমাস শিখে যেই অ্যাপ্রেন্টিস হলাম আট আনায়, চোখের সামনে বাবা একদিন পুজো সংখ্যার একটা লেখা কম্পোজ করতে করতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে পটল তুলল।

কালাচাঁদকে একটা বিড়ি দিয়ে মানব শেষ বিড়িটা ধরায়। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। যেভাবে এসে থাক, যেভাবে কথা বলে থাক, যতই আপশোশের আওয়াজ করে থাক—কালাচাঁদকে আজ আশ্চর্য রকম তাজা আর জ্যান্ত মনে হচ্ছে।

বিড়িটা কালাচাঁদ শেষ পর্যন্ত টেনে ক্ষয় করে। তারপর গেঞ্জির তলা থেকে বার করে ভাঁজ করা ছোটো খাতাটা।

লেখাটা পড়বে মানুবাবু ?

পড়ব না ? তোমার লেখা পড়ব না তো কার লেখা পড়ব !

বলবে কিন্তু কেমন হয়েছে।

নিশ্চয় বলব !

মানব শব্দ করে হাসে।

শেষ পর্যন্ত আমার সাথে পাল্লা দিলে কালাচাঁদ ?

কালাচাঁদও হাসে।

তোমাব সাথে পাল্লা ? তুমি একলা লেখ নাকি ?

মানব আর খালেকেব দুর্ভিক্ষের ভীষণতা নিয়ে লেখা গল্প আর কবিতা বস সাহিত্যে ছাপানো নিয়ে কী সংঘর্ষই যে হয়ে গেল মহেশ আর ধনদাসের মধ্যে !

সংঘর্ষ ?

কীসেব সংঘর্ষ ? ধনদাসের একটি মুখের কথাই তো যথেষ্ট যে—কাল থেকে আর আসবেন না। বাস। ফুরিয়ে যাবে মহেশের চাকবি।

তবু সংঘর্ষ বইকী !

মহেশকে ওভাবে হঠাৎ লাথি মেরে তাড়ানোর অসুবিধা আর বিপদ ধনদাস জানে।

প্রেসের কম্পোজিটররা পর্যন্ত মানুষটাকে খাতির করে।

অনেক লেখক শুধু তার খাতিরে মজুরি কম নিয়ে রস সাহিত্যে লেখা দেয।

কয়েকটা বড়ো বড়ো লাইব্রেরি বই কেনার ব্যাপাবে তার পরামর্শ চায। মহেশের এই সব গুণগুলি যতদূর সম্ভব কাজে লাগিয়ে এসেছে—মানুষটার ওই গুণগুলিই যে এমন ঝঞ্ঝাট হয়ে দাঁড়াবে কে জানত !

সে পয়সা দিযে লোক রাখবে, মফতে তো নয়। যাকে খুশি রাখবে—যাকে খুশি তাড়াবে। এটুকু স্বাধীনতাও তাব নেই ? পয়সা দিয়ে লোক রেখে তবে লাভ কী !

কী দিনকাল যে হয়েছে !

মানব আর খালেকের গল্প-কবিতা বুকে নিয়ে রস সাহিত্যের সংখাটা বাব হবার প্রায দু-সপ্তাহ পরে ধনদাসের টনক নড়ে।

ছাপা হবার পর বাঁধাই কবা প্রথম সংখ্যাটি তাকে দেওয়া হয়—কাগজ হয়তো বাজারে বেরোবে পবদিন। পড়ে উঠতে চার-পাঁচদিন সময় লাগে ধনদাসের। তার পড়াব সময় কই ?

রস সাহিত্য তার সাহিত্যচর্চার শখেব কাগজ নয। সাহিত্যের কিছু সে বোঝেও না, সাহিত্য নিয়ে তার কিছুমাত্র মাথাব্যথাও নেই।

কাগজটা বার কবে নগদ লাভও খুব বেশি হয় না। তবে কি না প্রেসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে কাগজটা বার করায় লোকের কাছে তার নিজেরও মর্যাদা বেড়েছে।

নানাবকম যোগাযোগের নানারকম কাজও জুটে যায় প্রেসের।

জহরের কবিতার বইটা ছাপিযে দেবার সুযোগ পাওয়া তারই একটা আদর্শ নিদর্শন।

দিন পাঁচেক পরে প্রেসে একপাক দিয়ে মহেশের টেবিলে হাত বেখে দাঁড়িয়ে ধনদাস বলছিল, বাঃ, এবার তো খাসা খাসা লেখা দিয়েছেন কাগজটায়। ক-দিনে একশো কপিব বেশি বিক্রি হয়েছে। পাঁচ কপির বেশি হাজারিমল কোনোবার নেয়নি—এবার আরও পাঁচ কপি বেশি নিয়েছে।

ধনদাস উদারভাবে হাসে, গুণের কদর জানি মশায় আমি ! আমি তেমন লোক নই, কাউকে ঠকাই না।

মহেশ খুব বেশি খুশি হবার ভান না দেখিয়ে বলে, আপনাদের কাছে কদর না থাকলে সেটা কীসের গুণ ? আজ এখানে কাল ওখানে ভেসে বেড়াতাম—আপনার কাছে চোদ্দো-পনেরো বছর কেটে গেল। গুণের কদর জানেন বইকী।

ধনদাসের আগেই ভাবা ছিল, আগেই সিদ্ধান্ত করা ছিল। দ্বিধামাত্র না করে সে বলে, দশ টাকা মাইনে বাড়াবার কথা বলেছিলেন না ? কাজ দেখালে মাইনে বাড়বে এ তো জানা কথাই ! দশ কেন, পনেরো টাকা বেশিই নেবেন সামনের মাস থেকে।

মহেশ ধীরস্বরে বলে, আপনাকে বলিনি আমি—কাগজটা কিছু একেলে করা দরকার ? সময় পালটে গেছে—সেকেলে কাগজ চলে না।

তাই তো পনেরো টাকা বাড়িয়ে দিলাম আপনাব মাইনে। একটু একেলে করুন কাগজটাকে—আমার ইন্টারেস্ট বজায় রেখে করুন। আপনি তা পারবেন—এটাই তো আপনার আসল গুণ।

ইংরেজি মাসের পনেরো তারিখে ধনদাস আইন-মাফিক লিখিত নোটিশ জারি করে মহেশকে বরখাস্ত করে দেয়।

তার মূর্তি অন্য রকম। ব্যবহার অন্য রকম। কথাবার্তার ধরণধারণ অন্য রকম।

পনেরো দিনের নোটিশ পেয়ে মহেশ নোটিশটা হাতে নিয়ে ধীরে সুস্থে বার্নিশ-করা কাঠের তক্তায় ঘেরা আপিসঘরে গিয়ে বলে, ব্যাপারটা তো বুঝলাম না !

ওই লেখা দুটো ছাপলেন কেন ? দুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখা গল্প আর কবিতাটা ?

লেখা দুটো ছাপানোর জন্য দুশো কপি বিক্রি বেড়েছে। আপনিই তো গিয়ে আমার পিঠ চাপড়ে এলেন।

বিক্রি বাড়লে আমাব লাভ কী ? চারটে বড়ো বিজ্ঞাপন বন্ধ করতে লিখেছে। আরও বিজ্ঞাপন বন্ধ করা হবে জানিয়েছে। আপনার কাণ্ডজ্ঞান নেই, দায়িত্বজ্ঞান নেই—এই সেদিন পরিষ্কার বলে এলাম আমার চাকরি করতে হলে আমার স্বার্থ দেখতে হবে—সব হদিস হারিয়ে ফেলেছেন। নিজের খামখেয়ালে লেখা ছাপবেন—আমার পাঁচ-ছশো টাকার বিজ্ঞাপন নষ্ট হবে ! আসল ব্যাপার বুঝতে পারিনি ভেবেছেন, আপনি নিজে মতলব করে এ সব করছেন। আপনাকে রেখে ডুবব ?

মহেশ ধীরে ধীরে বলে, পলিসিটা আপনার—আমার নয়। আপনিই আমায় বলেছিলেন যে কাগজের সার্কুলেশন বাড়া দরকার—সার্কুলেশন বাড়ালে আপনি বেশি বিজ্ঞাপন জোগাড় করতে পারবেন। আমি তখন আপনাকে বলেছিলাম যে সার্কুলেশন বাড়াতে হলে কাগজটাতে খানিকটা একালের সুর আনবে হবে, কিছু কিছু কড়া লেখা দিতে হবে। আপনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন, স্পষ্ট বলেছিলেন—আমার দিক বাঁচিযে একটু হিসেব করে কড়া করুন না কাগজের সুর। আমি শুধু তাই করেছি—কোনো বিপ্লব করার লেখা ছাপিনি। দুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখা পর্যন্ত না ছাপিয়ে কী করে কাগজের সুর কড়া করব ? আপনিই বললেন কাগজের সুর পালটাতে, কাগজের বিক্রি বাড়ায় আপনিই খুশি হয়ে আমার গুণ গাইলেন, পনেরো টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলেন—আজ হঠাৎ উলটো কথা বলে আমায় একেবারে তাড়িয়ে দিচ্ছেন ? আপনি বললেই সামনের মাস থেকে আগের মতো কাগজ বার করব। কাগজ আপনার—আপনি যে নীতি চালাতে বলবেন আমি সেই নীতি চালাব।

ধনদাস খানিকক্ষণ চুপ করে ভাবে, বোধ হয় নতুন সমস্যা নিয়ে নতুন ধরনের চিন্তার কূলকিনারা না পেয়েই বলে, আচ্ছা, নোটশটা ফেরত দিন। দু-একদিন ভেবে দেখে আপনাকে জানাব।

বরখাস্তের নোটিশ মহেশের হাতেই ছিল—নোটিশটা সে ধনদাসের টেবিলে রাখে।

নাম সই করে আইনসঙ্গতভাবে তাকে নোটিশটা নিতে হয়েছিল, আইনসঙ্গতভাবে নাম সই করে ধনদাস সেটা ফেরত না নিলে যে নোটিশটা ফেরত নেওয়ার কোনো আইনসঙ্গত মানেই হয় না—মহেশ তা ভালোভাবেই জানে।

তবে সে এটাও জানে যে আইন ধনদাসের পক্ষে। তাকে আইন মানতে অনুরোধ করার কোনো মানেই হয় না।

মন্দ্রা বলে, কেন ভাবছ বাবা ? কাল থেকে আমরা শাড়ি তুলে রেখে সায়া-শেমিজ ঘাগরার মতো পরব। কাল থেকে আমরা ছোটো উনুন ধরিয়ে চাল-ডাল লতাপাতা একচড়া রেঁধে খাব। তুমি কিছু ভেবো না। এতবড়ো আস্পর্ধা ব্যাটার, তোমায় চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেয় !

মহেশ হেসে বলে, এখনও তাড়ায়নি—তবে মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত আমায় তাড়াবেই। মাথায় কোনো মতলব ঢুকেছে।

কী মতলব ?

আমি কী জানি মনে মনে কী মতলব ভাঁজছে ? তবে মনে হয় এভাবে বিক্রি না বাড়িয়ে কাগজটাকে সস্তা আর নোংরা করে বিক্রি বাড়াবার কথা ভাবছে।

৮

কালাচাঁদের কাছে মানব খবর শোনে যে মহেশকে ধনদাস তাড়িয়ে দিয়েছে। তাদেবই লেখা ছাপাবার অপরাধে !

আমি যে বছর ঢুকলাম সে বছর ওনার চাকরি হল, কাগজ বেবোল। কী খাটুনিটাই খেটে এসেছেন বললে প্রত্যয় যাবে না মানুবাবু। এদিকে প্রেসের কাজ দেখছেন, ওদিকে কাগজ বার কবার জন্য খাটছেন।

কালাচাঁদ মানবকে একটা বিড়ি দিয়ে নিজে একটা বিড়ি ধরিযে টেনে কেশে কফ তুলে থুতু ফেলে বলে, বড়োই বোকাসোকা মানুষ। মজুরি যেমন হোক, মোদের টাইমেব খাটুনি। বাড়তি টাইম খাটালে বাড়তি মজুরি। উনি দিনরাত খেটেই আসছেন বরাবর—টাইম ঘণ্টাব কোনো হিসেব নেই। অ্যাদ্দিন খেটে পনেরো দিনের নোটিশে বরখাস্ত হলেন।

মানব চিন্তিত হয়েও তার কথা শুনে হেসে বলে, ঘণ্টা টাইমের হিসেবে মহেশবাবু বেশি খেটে এসেছেন বলছ ? এ জগতে আজ কারও ও রকম বেহিসেবে খাটিয়ে নেবাব ক্ষমতা কিন্তু আছে কি কালাচাঁদ ? কারও নেই, হিসাবে কিছু কিছু ঠকাতে পারে—একেবারে ক্রীতদাসেব মতো বেহিসেবি বেশি খাটাবার সাধ্য পাবে কোথায় ? মহেশবাবুর মাসিক মজুরির হিসাবটা বাঁধা আছে কিন্তু ওঁর খাটার কোনো ঘণ্টা-ধরা হিসাব—এ রকম কখনও হতে পারে ? এলোমেলো খাটেন তো, খানিক খাটেন কাগজে, খানিক খাটেন প্রেসে। হিসেব করলে দেখতে পাবে ঘণ্টা হিসাবেই উনি খেটে আসছেন—ওঁর মজুরিটা অবশ্য একটু বেশি—সামান্য বেশি বেশি খাটার সুযোগ আছে কি না—দুডবল তিনডবল ওভারটাইম খেটে উনি বেশি পয়সা কামান।

কালাচাঁদ মাথা চুলকে বলে, মোর সাথে তফাত শুধু এই ?

মানব বলে, তবে কী ? মহেশবাবুর অবশ্য অনেক বছরের খাটুনি জমা ছিল আগে থেকে। তুমি সোজাসুজি স্কুল থেকে প্রেসের কাজে ঢুকলে, দু-চারমাস আলগা হাতখরচে খেটে বাঁধা মজুরির কাজে লেগে গেলে। মহেশবাবু আবও সাত-আটবছর বাপ-দাদার পয়সা জলের মতো খরচ করে তারপর পয়সা রোজগারের চেষ্টায় নেমেছিলেন। তারপরেও কিছুকাল হয়তো ছ-মাস এক বছর কাজ করেছেন—ছ-মাস এক বছর বেকার থেকেছেন। অনেক বছর এমনিভাবে কাটিয়ে তারপর তোমাদের ওখানে ঢুকে পড়লেন।

কালাচাঁদের মুখ দেখে মানব বলে, যোগ-বিয়োগের সোজা হিসেবটা জানো তো কালাচাঁদ ? তোমায় লিখিয়ে-পড়িয়ে রোজগেরে করার খরচ আর মহেশবাবুকে রোজগেরে করার খরচটা হিসাব

কষে ফেল না ? দেখবে—মজুরি প্রায় সেই এক রকম। মহেশবাবু শুধু বাড়তি ওভারটাইম খাটার সুযোগ পেয়েছেন।

জরুরি একটা লেখার কাজ ছিল। প্রায় শেষ হয়েও এসেছে লেখাটা। মানসিক চিন্তার হ্রদে আরেকবার অল্পক্ষণের জন্য ডুব দিলেই লেখাটা সম্পূর্ণ করে ফেলা যায়।

কিন্তু কী যেন ঘটেছে দেহমনে, কীভাবে কোথায় যেন বিগড়ে দিয়েছে জীবনের সঙ্গে বাস্তব সম্পর্ক, লিখতে মানবের মন বসে না।

লেখাটায় মন বসানোর জন্যই নগদ পয়সা খরচ করে রবির দোকানে চা খেয়ে এসে ঠিক তিনটি লাইন লিখে মিনিট পনেরো কলম হাতে চুপ করে বসে থেকে মানব উঠে পড়ে, পাট করে রাখা ধোপদুরস্ত ধুতি পরে গায়ে চাপায় তার একমাত্র পাঞ্জাবি।

পাঞ্জাবির নীচে গেঞ্জি পরা নিয়ম কিন্তু একটা গেঞ্জিও তার নেই।

প্রেসের আর কাগজের কাজ চালাবার জন্যই সকাল সকাল চান করে খেয়ে উঠে জামাকাপড় পরে তৈরি হয়ে ভাঙা খাটের বিছানায় বসে মলয়ার এনে দেওয়া ওষুধটা সবে মহেশ গিলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ব্যাপার জানতে মানব গিয়ে হাজির হয়।

ঠোঁটে ঠেকানো ওষুধের গেলাসটা নামিয়ে মহেশ তার চিরন্তন হাসি হেসে রসিকতার সুরে বলে, এক সেকেন্ড কি দু-সেকেন্ডের জন্য বিষম-খাওয়া থেকে বাঁচলাম। এক মিনিট চুপচাপ বসবে কি—ওষুধটা নিশ্চিন্ত মনে গিলে নেব ?

মানব হেসে বলে, আপনাকে তবে সত্যি সত্যি তাড়ায়নি ? প্রেসের কাজেই যাচ্ছেন ?

ওষুধ খেয়ে কোমরটাকে একটু আরাম দেবার জন্য এক মিনিটের জন্য দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে মহেশ বলে, তাড়িয়ে দিয়েছিল রে ভাই—ব্যক্তিত্ব খাটিয়ে কোনোরকমে সামলে নিয়েছি। তবে মন বলছে, আর বেশি দিন চলবে না, বরখাস্ত হবই হব। তোমরা এসে কীভাবে যে বিগড়ে দিলে মনটা আমার, লেখা বাছাই করে করে বুড়ো হয়ে আজ লেখা বাছতে ভুল হয়ে যাচ্ছে !

সত্যি কি ভুল হচ্ছে ? না, ঠিক বাছাই করছেন ?

মহেশ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কোমরের ব্যথায় মুখ বাঁকিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তবু হালকা সুরেই বলে, যে বাছাই করে এ বয়সে চাকরি যায় সেটা কী ঠিক বাছাই ? তোমরা আমার মাথা গুলিয়ে দিলে বুড়ো বয়সে।

শেষ পর্যন্ত মহেশের আশঙ্কাই সত্য হয়ে দাঁড়ায়। আশঙ্কা অবশ্য তার আকাশ থেকে জাগেনি, ধনদাসের রকম-সকম দেখেই চাকরি যাবার কথা মনে হয়েছিল।

আইনের হিসাবে ওই পনেরো দিনের নোটিশেই চাকরি তার খতম হয়ে গেছে কিন্তু ধনদাস ওই নোটিশের কথা উল্লেখ করে না, নতুন কোনো নোটিশও দেয় না। মুখে খুব ভদ্রভাবে দুঃখ প্রকাশ করে জানিয়ে দেয় যে পরের মাস থেকে আর তার কাজ করতে হবে না।

মহেশ হাসিমুখেই বলে, আবার কী অপরাধ করলাম ?

ধনদাস তাড়াতাড়ি বলে, না না, অপরাধ কিছুই করেননি। কী জানেন, কাগজটা আমি একটু অন্য রকম করতে চাই !

মহেশ বলে, বলুন না কী রকম কাগজ চান, আমিই করে দিচ্ছি, এতকাল সম্পাদকগিরি করলাম, আপনার মনের মতো কাগজ বার করে দিতে পারব না ! কিন্তু মুখ ফুটে আমায় তো বলতে হবে আপনি ঠিক কী জিনিস চান ?

ধনদাস ইতস্তত করে অস্বস্তির সঙ্গে বলে, আমি একজন কমবয়সি লোক রাখতে চাই।

তাই বলুন ! এ বুড়োকে আর পছন্দ হচ্ছে না ?

লোক ঠিক না করে ধনদাস অবশ্য মহেশকে তাড়ায়নি। পরীক্ষামূলকভাবে তিন মাসের জন্য উমাকান্তকে মহেশের পদে বসিয়ে দিয়েছে।

মহেশের যেদিন থেকে কাজে যাওয়া খতম সেদিন প্রেসের প্রায় সকলেই নির্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা আগে প্রেসে হাজির হয় এবং একসঙ্গে জড়ো হয়ে বসে জটলা আরম্ভ করে।

মহেশকে এ রকম আচমকা বিদায় করায় তাদের সকলের মনেই প্রচুর অসন্তোষ জেগেছে। কিন্তু ব্যাপারটা তারা ভালোমতো বুঝতে পারেনি।

খারাপ লেখা ছাপিয়ে কাগজের ক্ষতি করার অপরাধে মহেশকে বরখাস্ত করা হয়েছে ?

কোন লেখাটা খারাপ ছাপা হয়েছে তাদের অল্পবিদ্যা নিয়ে তারা বুঝে উঠতে পারে না। এবারও দু-একটা জোরালো লেখা ছাপা হয়েছে। কিন্তু মানব আর খালেকের লেখার মতো তেজি নয়। জোরালো লেখা থাকলে, তেজি লেখা থাকলে, কোন হিসাবে কাগজের ক্ষতি হয়, সে কথাটা একেবারেই তাদের মগজে ঢোকে না।

একজন বলে, এবার বরং আরও ভালো হয়েছে কাগজটা।

কালাচাঁদ বলে, ভাই, লেখা বড়ো কঠিন কাজ। জীবনযৌবন পণ না করলে কেউ ভালো লিখতে পারে না। মানুবাবু আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে কোঁচা উড়িয়ে ফুর্তি করে বেড়াতে পারে, কিন্তু কেবল লেখার খাতিরে মোদের বস্তির ঘরে পচছে, মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া জ্বরে অজ্ঞান হচ্ছে। ব্যাপারটা কী বুঝিনে মোটে, কিন্তু জীবনপাত করে তো লিখছে, তার লেখা ছাপিয়ে এতকালের চাকরি যাচ্ছে মহেশবাবুর ! মোর পেটে যদি বিদ্যা থাকত, লিখতে যদি পারতাম—কত্তাব্যাটাকে এক-চোট ঠুকে লিখে দেখিয়ে দিতাম মজা !

ধনদাস আসে এগারোটায়।

মহেশ বরাবর ঠিক টাইমে এসে কাজ শুরু করে দিত, আজ মহেশ আসবে না। সুতরাং জানা কথাই যে ঠিক সময়ে কাজও শুরু হবে না।

যথাসময়ে উমাকান্তকে সঙ্গে করে ধনদাসকে আসতে দেখে তারা থ বনে যায়। দেখেই টের পাওয়া যায় যে উমাকান্ত স্নান করে খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরিয়েছে। ঠিক এই সময়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে প্রেসে আসার মানে বুঝতেও তাদের এক মুহূর্ত বিলম্ব হয় না।

হতভম্ব কালাচাঁদ ভাবে, শেষ পর্যন্ত মহেশের জায়গায় বহাল হল উমাকান্ত ! প্রকারান্তরে তার বউকে এক রকম খুন করবার জন্য যে দায়ি, মহেশকে চাকরি থেকে এক রকম অকারণেই যে তাড়িয়েছে—উমাকান্ত তার কাছে সেই চাকরি পেতে নিতে পারল ! উমাকান্ত যে এই দরের মানুষ এটা তো কোনোদিন সে কল্পনাও করতে পারেনি !

ধনদাস হাসিমুখে অমায়িকভাবে উঁচুগলায় সকলকে শুনিয়ে উমাকান্তকে বলে, আপনাকে তো আর কাগজের কথা বুঝিয়ে বলতে হবে না—সবই আপনার জানা আছে।

মহেশের প্রায় চোদ্দো বছর ব্যবহাব করা টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে উমাকান্ত বলে, মোটামুটি জানা আছে, তবে কিনা কোনোদিন হাতনাতে করিনি—প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হবে।

সে তো বটেই ! আপনি তবে নিজের জায়গায় বসুন, এক-একজন করে ডেকে জেনে-বুঝে নিন কে কী কাজ করছে। কাগজটার ফাইল আর লেখা দেখিয়ে শুনিয়ে ব্যাপার সব হরেন আপনাকে বুঝিয়ে দেবে—

ওর নাম হরেন।

কাগজের ও প্রেসের বহুদিনের প্রুফ রিডারকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিয়ে ধনদাস বলে, একবার ভেবেছিলাম মহেশবাবুকেই বলব আপনাকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে মাইনে নিয়ে যাবেন—সব

আপিসে যেমন নিয়ম। তারপর আপনার দিকটা বিবেচনা করে সেটা আর করলাম না—আপনার চেনা লোক মহেশবাবু, আপনি হয়তো লজ্জা পাবেন।

মহেশের সঙ্গে চাকরির ব্যাপার নিয়ে উমাকান্তের যে অনেক কথা হয়েছে সেটা ধনদাস জানত না, কালাচাঁদও জানত না।

তাই ঘরে ফিরেই মানবকে সবিস্তারে ব্যাপার জানিয়ে উমাকান্তের বিরুদ্ধে প্রায় গালাগালির মতো তীব্র একটা মন্তব্য করা সত্ত্বেও মানবকে হাসতে দেখে কালাচাঁদ অবাক হয়ে যায়।

আপনি হাসছেন ?

মানব গম্ভীর হয়ে বলে, সে ভাব থেকে হাসছি না কালাচাঁদ—না জেনে না বুঝে কীভাবে একজন মানুষ আরেকজনের সম্পর্কে ভুল বিচার করে বসে, তাই ভেবে হাসছি। তুমি জান না যে উমাবাবু মহেশবাবুর কাছে গিয়েছিলেন, তাঁকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তাঁর চাকরিতে ফিরে যাবার কোনো চান্স আছে কি না, উনি চাকরি নিতে রাজি না হলে মহেশবাবুর কোনো লাভ আছে কি না !

কালাচাঁদ তবু সন্তুষ্ট হয় না, ব্যঙ্গের সুরে বলে, সে তো বুঝলাম—লুকিয়ে-চুরিয়ে তলে তলে কাজটা বাগাননি। কিন্তু বউ মরছে শুনে যে দেড়শো টাকায় বড়ো একটা বইয়ের কপিরাইট কিনতে চায়—স্রেফ টাকার অভাবে বউটা মরার পরেও তার কাছে কোনো মানুষ চাকরি করতে পারে মানুবাবু ?

তার দিকে ধীর চোখে চেয়ে মানব খানিকক্ষণ ভেবে বলে, তোমায় জানি বলেই বলছি কালাচাঁদ। তাছাড়া, এবার থেকে উমাবাবু তোমারও কাজকর্ম দেখবেন—মনে এ রকম বিরাগ থাকলে তোমারও কাজ করতে অসুবিধা হবে। কিন্তু আমাকে কথা দাও—কানে যা শুনবে এখন, মুখে কখনও উচ্চারণ করবে না।

কথা দিলাম মানুবাবু !

উমাবাবু ধনদাসকে খুন করার কথা ভাবছিলেন।

কালাচাঁদ চমৎকৃত হয়ে বলে, বটে !

মানব বলে যায়, কিন্তু লেখক মানুষ তো, ভালো করেই জানেন যে একজনকে খুন করাটা কোনো শাস্তিই নয়। লোকে বলে মরার বাড়া গাল নেই—কিন্তু মরলে তো সব ফুরিয়েই গেল, মরে গেলে আর কীসে কী আসে যায় ? চলতি কথাটা কিন্তু মিথ্যে নয়, সত্যিই মরতে বলার চেয়ে বড়ো গাল, বড়ো শাপমন্যি আর নেই। বাঁচতে চাওয়াটাই মানুষের সব চেয়ে বড়ো ধর্ম কিনা—মরতে বলাটা তাই সব চেয়ে বড়ো গাল। মৃত্যুভয় জাগানো খুব বড়ো শাস্তি—মেরে ফেলাটা কিন্তু কোনো শাস্তিই নয়।

একটু থেমে মানব যোগ দেয়, আমি কিন্তু বক্তৃতা করছি না, তোমায় উমাবাবুর কথাগুলি শোনাচ্ছি কালাচাঁদ।

কালাচাঁদ একটু অভিভূতভাবে বলে, উমাবাবু কি এইভাবে কথাগুলি বলেছিলেন ? না আপনি ওনার কথা নিজে সাজিয়ে-গুছিয়ে বললেন ?

উমাবাবুর মনের অবস্থা বোঝ তো ? এ: ঘণ্টার বেশি একটানা এলোমেলো কথা বলে গিয়েছিলেন। আমি তোমায় মোট কথাটা বললাম। উমাবাবু ব্যাপারটা শুধু অনুভব করেছেন—মাথায় তেমন স্পষ্টভাবে ধরতে পারেননি। তুমি সাফ বুঝতে পারবে। খুন করা ফাঁসি দেওয়ার আসল মানে কী ? যে খুন হল, যে ফাঁসি গেল তার কোনো শাস্তি নয়। যারা বাঁচতে চায় তাদের জানিয়ে দেওয়া যে এ রকম কাজ কোরো না, এ রকম করলে মরতে হবে। বুঝেছ ব্যাপারটা ?

বুঝেছি মানুবাবু !

ধনদাসকে খুন না করে উমাবাবু তাই ওকে ফাঁসিয়ে ফাঁসিয়ে ডুবিয়ে ডুবিয়ে সাজা দেবার সুযোগ হিসাবে চাকরিটা নিয়েছেন।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে কালাচাঁদ বলে, পারবেন না। উনি গায়ের জ্বালায় মিথ্যা প্রতিশোধের স্বপন দেখছেন। সবকিছু বড়োকত্তার হাতের মুঠোয়—ওনাকে গোলামের মতো চাকরিই করতে হবে। উনি কিছুই করতে পারবেন না।

মানব খুশি হয়ে বলে, ঠিক ধরেছ। এভাবে চাকরি নিয়ে গোলাম হয়ে কি ধনদাসদের ফাঁসানো যায় ? নিজের মনের জ্বালায় শুধু জ্বলে মরা ! তবু আমি উমাবাবুকে বারণ করিনি। পুতুলদির জন্য প্রাণের জ্বালা তো আছেই—ঘরেই থাকুন আর জ্বালা জুড়োবার সুযোগ খুঁজে চাকরিই করুন—জ্বালা ওঁর নিভবে না। ছ-মাস এক বছর যদি পারেন তো করুন চাকরিটা—ছেলেমেয়েগুলো খেয়ে বাঁচবে।

আত্তি আগের মতোই ঘরে আসে যায়, কথা বলতে বলতে যেন খেলার ছলেই টুকটাক কয়েকটা কাজ সেরে দেয় —সে না করলে যা মানবকেই করতে হত।

কালাচাঁদের লেখার নমুনা এনে শোনায়। বলে, বাবাকে ধমকে দিয়েছি। মা ফিরে এসেছে, কুঞ্জর মা চোখ পেতে রেখেছে, সবাই দেখেছে—কেন আসব না ? বদনাম মোদের দেবেই বদ লোকে—সে ভয়ে কি কুঁকড়ে থাকব ?—আত্তি হাসে।

সবাইকে বলেছি—বেতন নিয়ে তোমার ঘরে ঝি-র কাজ করি। একেবারে মিছে কথা হবে—তাই তোমায় ঘরটা ঝেঁটিয়ে দিই, উনানটা ধরিয়ে দিই—

আমায় বলে কয়ে উনানটা ধরাতে তো হয় ? রাঁধব কি না খাব কি না ঠিক নেই—মিছিমিছি উনান ধরিয়ে কয়লা পুড়িয়ে ছাই করা !

আত্তি রেগে মাথা উঁচু করে দুচোখে অনুশাসন ফুটিয়ে বলে, রাঁধবে কি না ঠিক নেই মানে ? দুবেলা রাঁধবে, দুবেলা পেট ভরে খাবে। না খেয়ে মানুষ বাঁচে ? না খেয়ে মানুষ খাটতে পাবে ? অমন ছাই লেখা দিয়ে কাজ নেই, লেখা চুলোয় দিয়ে সেই চুলোয় ভালো ভালো রান্না বেঁধে পেট ভরে খেলে অনেক ভালো হয়। আরশিতে একবারটি তাকিয়ে দ্যাখো না কী চেহারা হয়েছে নিজের ?

ভালো ভালো জিনিস রেঁধে খাবার পয়সা কে দেবে ?

আদায় করবে। তোমার লেখা যাদের দরকার তারা পয়সা না দিলে লিখবে না !

আত্তির নির্ভয় নিশ্চিন্ত ভাব—আদায় করাটা যেন সংসারে এমনি সহজ ব্যাপার !

তবে হ্যাঁ, লেখকের খামখেয়ালি করতে হওয়ার কুসংস্কারে কতগুলি বাজে ঝোঁকে মানব যে এত কষ্টে রোজগার করা পয়সা নষ্ট করত—আত্তি ও রকম কয়েকটা পাগলামি সামাল দিয়ে সে পয়সাটা দুবেলা পেটে অন্ন দেবার ভোঁতা বিশ্রী একঘেয়ে দরকারে লাগাতে তাকে বাধ্য করেছে। ধোঁয়ার চেয়ে খাদ্য যে ঢের বেশি দামি এই সহজ সত্যটা তার মাথায় ঢোকাবার চেষ্টা করে চলেছে অবিরাম।

হয়তো লিখতে লিখতে মুখ না তুলেই মানব বলে, বেশি বকবক না করে এক প্যাকেট সিগ্রেট আনিয়ে দিলে সত্যিকারের কাজ হত আত্তি। বালিশের নীচে পয়সা আছে।

বালিশের নীচের পয়সার পরিমাণটা দেখে আত্তি হিসাব করে পয়সা নিয়ে যায়—দুটো সিগারেট, এক বান্ডিল বিড়ি আর একজোড়া ডিম নিয়ে আসে !

গনগন করে উনান জ্বলছে। চটপট অল্প তেলে একটা ডিমের মামলেট ভেজে চা করে এনে দিয়ে বলে, বুদ্ধির গোড়ায় খালি ধোঁয়া দিলেই হয় না—পেটের পূজা না করলে বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়।

বেশি খেলে লিখতে পারি না যে !

আত্তি গালে হাত দেয়।

একটা ডিমের মামলেট আর এক কাপ চা তোমার বেশি খাওয়া ? না খেয়ে লিখে লিখে কী ছুঁচিবাইটাই করেছ ! মোদের তুমি আবার ছুঁচিবাইয়ের খোঁচা দাও !

মুখে যাই বলুক মানব সাগ্রহে মামলেট মুখে দিয়ে পরম আয়াসে চা খেতে শুরু করেছে দেখে আত্তি খুশি হয়ে বলে, মা-র ক-টা কাজ সেরে আসি। বাবার একটা লেখা শোনাব।

কালাচাঁদ নতুন নিয়ম করেছে লেখার সাধনা চালাবার।

সারাদিন খেটে এসে সে মানবের ঘরে বাতির আলোয় শুধু পড়ে—আধঘণ্টা পড়ে হাই তুলতে শুরু করে কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় আরও আধঘণ্টা পড়া চালিয়ে যায়।

অরপর কাঁকর-ভরা চালের ভাত বা পচা আটার রুটি এবং ডাল-তরকারি যা আত্তির মা দেয় তাই গোগ্রাসে গিলে বিছানায় চিত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

রোজ একসময়ে না হলেও খানিকটা রাত্রি বাকি থাকতেই সে জাগে এবং আলসেমির অভ্যস্ত মোহ কাটিয়ে গায়ের জোরে উঠে পড়ে মুখে চোখে জল দিয়ে এক জামবাটি জল খেয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে লিখতে বসে যায়। লেখার জন্য মানবের জোর আলোর বড়ো ল্যাম্পের মতোই একটা ছোটো ল্যাম্প সে কিনেছে।

মানবের ল্যাম্পটা সমস্ত ঘর আলোকিত করে—একেবারে লেখার কাগজের মাথার কাছাকাছি বসালে কালাচাঁদের ছোটো ল্যাম্পটা ঘরে আলো ছড়ায় সামান্য—কিন্তু তার লেখার কাগজে প্রায় মানবের বড়ো ল্যাম্পের মতোই আলোকপাত করে।

একটা মানুষ খাটতে যাবে। খেটে যেমন হোক কিছু সে পয়সা আনবে। সারাদিন খাটতে যাওয়ার জন্য তাকে খাইয়ে পরিয়ে তৈরি করে দিতে হবে বইকী।

কালাচাঁদ খেতে বসলে তার নতুন লেখার নমুনা নিয়ে আত্তি মানবের ঘরে আসে, বলে, শোনো দিকিনি বাবার এ লেখাটা কেমন হয়েছে ?

লেখাটা পড়া চলতে চলতেই কোনোদিন কালাচাঁদ খাওয়া শেষ করে এসে একপাশে বসে, কোনোদিন লেখা পড়ে শেষ হবার পর মানবের মন্তব্য শুরু হওয়ার পর আসে।

সেদিন বড়োই উৎফুল্ল মনে হয় আত্তিকে। ঘরে এসেই চাপা উত্তেজনার সুরে সোৎসাহে বলে, বাবা একটা কবিতা লিখেছে মানুবাবু !

মানব প্রুফ দেখছিল। মুখ তুলে বলে, কবিতা লিখেছে ? হতেই পারে না। কালাচাঁদের কবিতা লেখার ক্ষমতা নেই আত্তি। কালাচাঁদ ছড়া লিখেছে। কবিতার মতো যা কিছু লিখবে, সব ছড়া হয়ে যাবে।

আত্তি ফুঁসে উঠে, বটে নাকি ? তবে শুনে কাজ নেই। কবিতা লিখবে তোমরা আর মোর বাবা কবিতা লিখলে তা হবে শুধু ছড়া ! অত খায় না !

মানব হেসে বলে, ছড়া কি কবিতার চেয়ে ছোটো রে পাগলি ? একটা ছড়া মুখস্থ হয়ে যায় সব মানুষের—হাজার কবিতা শূন্যে মিশে যায়।

আত্তি নম্র হয়ে বলে, তাই বলো—ও সব কী আমরা জানি বুঝি ? কথা শুনে ভাবলাম কবিতা না লিখে ছড়া লেখা মহাপাপ—মোর বাপটা বুঝি পাপ করেছে।

ছড়াটা শোনা না আত্তি, বেশি বকবক না করে ?

ছড়া শুনে মানব অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে।

তার ভাব দেখে আত্তিও মুখ ফুটে তার মতামত জিজ্ঞাসা করতে সাহস পায় না।

শেষে বিরক্ত হয়ে বলে, কী হল ? কিছু বলবে তো ?

কিছু বলতে পারছি না যে ? একবার মনে হচ্ছে অদ্ভুত রকম ভালো হয়েছে—আবার মনে হচ্ছে সবটা ছেলেমানুষি ব্যাপার !

তার এই মন্তব্যে আত্তি কিন্তু খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

উড়িয়ে দিতে পারছ না তো ? বলতে পারছ না তো বাজে হয়েছে ?

মানব মাথা নেড়ে বলে, না—উড়িয়ে দেওয়া যায় না, বাজে বলা যায় না। কালাচাঁদ তোকেও পয়দা করেছে, ছড়াটাও পয়দা করেছে। মনে হচ্ছে, ছড়াটাকে উড়িয়ে দিলে বাজে বললে, তোকেও উড়িয়ে দিতে হয় বাজে বলতে হয় !

আত্তি খুশির হাসি হেসে বলে, এবার যেদিন খুশি যখন খুশি মোকে আদর কোরো। তোমায় জেনে গেছি চিনে গেছি—তোমার আদর সস্তা নয়। তোমার আদর পাওয়া মোর ভাগ্যির কথা।

খালেকের সাম্প্রতিক কবিতার সঙ্গে কালাচাঁদের ছড়ার একটা আশ্চর্য মিল আছে মনে হয়---সরলতার মিল।

খালেকের যায়-যায় অবস্থা। তবু হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে সে কবিতা লিখছে। যখন চলে ফিরে বেড়াত, জীবনের স্তরে স্তরে খোঁজ করত কবিতার প্রাণবস্তু--তখন সে এর সিকি কবিতাও লেখেনি।

জীবনদীপ নিভে আসছে জেনে হাসপাতালে রোগশয্যায় শুয়ে সে যেন তার বক্তব্যকে কাব্যরূপ দিতে ব্যাকুল হয়েছে।

তার কবিতা পড়ে উমাকান্ত মানবকে বলে, এ কবিতা না ছেপে তো পারব না। কেন তুমি ওর কবিতা এনে আমায় শোনাও ? এই কবিতা ছাপিয়ে জেলে গেলে ভালো হবে ?

মানব কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলে, যান না একবার জেলে ! এ দেশে জেল না খেটে অনেক কাল বেঁচেছেন, একবার নয় জেলের অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করবেন। খালেক যে আটাশ বছরে মরছে ?

ওর কবিতাটা তাই ছাপাতেই হবে ? আটাশ বছরে মরছে বলে ?

না না, আপনি সম্পাদক—লেখা ছাপানো না ছাপানো আপনার খুশি। আমরাও কি আপনার ঝঞ্ঝাট জানি না ? এ কবিতা না ছাপতে পারলে কিছুমাত্র দোষ ধরব না।

এ কবিতা না ছাপিয়ে পারব না।

তবেই দেখুন, আমার কোনো দোষ নেই।

উমাকান্ত নিচু গলায় বলে, কবিতাটা এ মাসেই ছাপিয়ে দেব—গল্প বুঝি আর লিখছ না ?

গল্প একটা লেখা আছে—আপনার জন্যেই। এ মাসে খালেকের কবিতাটা যাক—সামনের মাসে আমার গল্পটা যাবে। এক মাসে আমাদের দুজনের লেখা ছাপলে আপনার তো আবার বিপদ ঘটবে !

যা হবার হবে তোমার গল্পটা এনে দাও।

এক সংখ্যায় মানবের কড়া গল্প আর খালেকের বাঘা কবিতা বার হয়, দিন কাটে কিন্তু ধনদাস একটি কথাও বলে না। উমাকান্ত আশ্চর্য হয়ে ভাবে, লেখা দুটো কি তার চোখ এড়িয়ে গেছে ?

মানবের সেদিন হঠাৎ জ্বর এল। সাধারণ সর্দি-জ্বর নয়, একেবারে হাড়কাঁপানো খাঁটি জাতের জ্বর।

শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল ক-দিন, দুপুরে সস্তা হোটেলে দু-একটা রুটি আর দু-একআনার আলুর দম খেয়ে আসবে ভেবে সে আর সকালবেলা রান্নার আয়োজন করেনি।

একটা জরুরি লেখা লিখতে বসেছিল।

লেখা কিন্তু কিছুতেই এগোলো না। বেশ শীত শীত করতে লাগল বেলা দশটা নাগাদ।

এগারোটায় দড়ির খাটিয়ায় বিছানো ছেঁড়া শতরঞ্চিতে পুরানো তোশকটা গায়ে চাপিয়ে গুঁড়িমুড়ি হয়ে শুয়েও ভিতরের হাড়কাঁপানো শীতে সে কাঁপতে লাগল ঠকঠক করে।

জ্বর যেন লাফিয়ে লাফিয়ে চড়তে থাকে, মাথার মধ্যে ভাবনা-চিন্তা কেমন গোল পাকিয়ে যায়, একটা আধা-সচেতন অবস্থায় সে আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকে। কিন্তু তার মধ্যেই সে টের পায় যে আত্তি এসে শিয়রে বসে কপালে জলপটি দিয়ে মাথায় হাওয়া করতে আরম্ভ করেছে। কুঞ্জর মা-র তর্জনগর্জনও তার কানে আসে।

আত্তির তীক্ষ্ণ চিৎকারে চমকে উঠে রক্তবর্ণ চোখ মেলে একবার দেখবার চেষ্টাও করে তার মুখ।

জ্বরে গা আগুন হয়েছে, হুঁশ হারিয়েছে—মরে যাবে না মানুষটা ? চেঁচাসনে। গিয়ে ঘাড় মটকে দিয়ে থামালে ভালো হবে ?

সন্ধ্যার পর কখন কালাচাঁদ আসে, উবু হয়ে থাকে, চুপচাপ বসে। আত্তি বরফ এনে দিতে বললে কখন সে বরফেব সঙ্গে দুবছর ডাক্তারি পড়া লাইসেন্সহীন ডাক্তার শশাঙ্ককেও ডেকে আনে—দুবছর ডাক্তারি শেখা বিদ্যা আর চোদ্দো বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে শশাঙ্ক তার গা ফুঁড়ে কী ওষুধ দেয়, কিছুই মানব জানতে পাবে না।

শেষরাত্রে ঘাম দিয়ে তার জ্বব কমে যায়।

কেরোসিনের বড়ো ল্যাম্পটা জ্বালানোই ছিল। নিজের এতকালেব চেনা ল্যাম্পের আলোয় জেগেও মানবের মনে হয় কোনো এক অজানা জগতে যেন তার ঘুম ভেঙেছে।

কালাচাঁদ মেঝেতে একটা মাদুরে চিত হয়ে নাক ডাকাচ্ছে। আত্তি বসে আছে শিয়রে।

বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগে মানবের সে কোথায় আছে, কেন আছে, কী হচ্ছে, ব্যাপার বুঝতে।

কয়েকবার চোখ খুলে চোখ বুজে আত্তিকে একভাবে শিয়রে নিথর মূর্তির মতো বসে থাকতে দেখে নিয়ে, কয়েকবার এপাশ ওপাশ ফিরে মানব ক্ষীণকণ্ঠে বলে, একটু জল খাব।

দিচ্ছি জল।

তারই কুঁজো থেকে তারই কাচেব গেলাসে জল ভরে এনে আত্তি এবার আর শিয়রে বসে না। খাটিয়ায বিছানার পাশে বসে বাঁ হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে খানিকটা উঁচু করে ধরে ডান হাতে গেলাসটা তার মুখে ধরে বলে, খাও—জল খাও।

কী মিষ্টি লাগে ভাঙা টিউবওয়েলের জল !

কী মধুর লাগে আত্তির গায়ের আলগা আলগা স্পর্শ !

এক গ্লাস জল খেয়ে খাটিয়ায় জোড়াসন হয়ে বসে মানব ক্ষীণ জড়ানো গলায় বলে, সারারাত জেগে আছ বুঝি ?

আত্তি মৃদুস্বরে বলে, কী জ্বরটাই তোমাব হয়ে গেল। ডাক্তার বললে এ নাকি এক রকমের ম্যালেরিয়া—তখন স্বস্তি পেলাম।

আমার জ্বর হলে তোমার কীসের অস্বস্তি ?

ডাক্তার আরও কী বলল শুনবে ? এই বয়সে তোমার গায়ে মোটে জোর নেই—জ্বরটা তাই এত কাবু করেছে। ভালো ভালো খাবার খেতে বলেছে ডাক্তার—বুঝলে ?

মুখের কাছে মুখ এনে হাত নেড়ে তাব কথা বলার ভঙ্গি দেখে মানব একটু হেসে বলে, বুঝলাম।

মানবের আসল জ্বর ছেড়ে গিয়ে উলটো পালা শুরু হয় কুইনিনের জ্বরবোধ আর নেশার।

যেহেতু ম্যালেরিয়া জ্বর, ঠেসে কুইনিন দাও। হাতুড়ে ডাক্তার শশাঙ্ক সোৎসাহে গা ফুঁড়ে কুইনাইন দিয়ে, দৈনিক তিনবার করে খাবার জন্য কুইনাইন মিকশ্চার দিয়ে সগর্বে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল—দুটাকা দক্ষিণা আদায় করে।

মানবের শরীর কমজোরি বলে জ্বরের প্রতাপ বেশি হয়েছিল এটা ধরতে পেরেও তার খেয়াল হয়নি যে এই রোগীকে একটু হিসেব করে কুইনিন দেওয়া উচিত।

কালাচাঁদের ঘুম ভাঙলে মানব কাতর কণ্ঠে বলে, একবার ডাক্তারের কাছে যাবে কালাচাঁদ ? বলবে যে জ্বর নেই কিন্তু আমার ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে, গা ঘামছে !

কালাচাঁদ ঘুরে আসে। ডাক্তার আর কী বলবে, সবাই যা জানে সেই চিরকেলে কথা—বেশি করে দুধ খাও !

দুধ !

মানব বালিশের তলাটা হাতড়ায়। বালিশের নীচে গোটা তিনেক টাকা ছিল, সেটা খুঁজে পাওয়া যায় না।

আত্তি কি তার দিকে নজর পেতে রেখেই ঘরের কাজ করছিল ? কোথা থেকে এসে বলে, টাকা নেই—ডাক্তারকে দিয়েছি, ওষুধের দাম লেগেছে। কুলোয়নি ওতে, মোদের কাছে কিছু ধার করেছ।

তবে আর কথা কী !

আত্তি কিন্তু জোগাড়ে মেয়ে। কালাচাঁদের কাছেই বোধ হয় সে ব্যাপার শোনে, পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যে একবাটি দুধ হাতে করে এসে বলে—ধার আরও বাড়ল, সেরে উঠে শোধ দিয়ো।

যে লেখাটা লিখতে লিখতে জ্বর এসে গিয়েছিল সেটা শেষ করলেই ধার শোধ হবে। কিন্তু শশাঙ্কের কুইনিনের এমনি তেজ যে তিন দিনের মধ্যে মানব লিখতে বসতেই পারে না।

আগেকার চেনা একজন ভালো ডাক্তারের কাছে গিয়ে সে সব কথা খুলে বলে, ডাক্তার মন দিয়ে শুনে একটু হাসে।

বলে, ব্যাপারটা বুঝে দেখুন ! কুইনিন দিয়েছে ঠিক তাতে ভুল নেই। কিন্তু অতিরিক্ত রকম বেশি দিয়েছে। জানে না যে তা নয়, আসলে মেশাল দেওয়া কমজোরি ভেজাল ওষুধ বেশি ডোজে দিয়ে থাকে, আপনাকেও তাই দিয়েছে। কোনো কারণে আপনার বেলা পড়েছে খাঁটি ওষুধ।

মানবও হেসে বলে, আমারই সৌভাগ্য !

কুইনিনের নেশা কাটে তিন দিন পরে। জ্বরের নেশা আর ওষুধের নেশা কাটিয়ে উঠে মানব ভোরবেলা খাটিয়ার বিছানায় ছটফট করে—কী দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে তার খাটিয়ার ময়লা বিছানা থেকে !

লেখক হিসাবে খাঁটি থাকার জিদের ফলে তার যেন বেশি রকম দুর্দশা দাঁড়িয়েছে। অনেক দিন পরে প্রাণটা বড়ো জ্বালা করে—যতক্ষণ না খালেককে মনে পড়ে।

৯

প্রেসের ম্যানেজার আর কাগজের সম্পাদক হয়ে ভেতরে ঢুকে ধনদাসকে একেবারে ফাঁসিয়ে দেবার কল্পনা ছিল উমাকান্তের। মুখে আনুগত্য জানাবে, কাজও মোটামুটি ঠিকমতো করে যাবে, এদিকে তাকে তাকে থাকবে আর সুযোগ পেলেই ডুবিয়ে দেবে ধনদাসকে।

মানব কালাচাঁদের কাছে দ্বিধাহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিল যে ধনদাসের কিছুই করতে পারবে না উমাকান্ত—এভাবে ধনদাসদের ফাঁসানোর চেষ্টা নিছক পাগলামি।

তবু তারা পুতুলের শোকে কাতর উমাকান্তের পাগলামিতে সায় দিয়েছিল এই ভেবে যে সে যখন ধনদাসকে নিয়মসঙ্গতভাবে ফাঁসাবার ইচ্ছাই পোষণ করে, হঠাৎ খাপছাড়া কিছু সে যখন করবে না, কারও যখন কোনো ক্ষতি নেই—মহেশের স্থানে করুক সে কিছুদিন চাকরি। ছেলেমেয়েরা বাঁচুক, সে নিজেও একটু সামলে-সুমলে উঠুক।

মানবের ভবিষ্যদ্বাণী শুধু সার্থক প্রমাণিত হয় না—দেখা যায় সে খুব কম করেই বলেছিল। উমাকান্ত কাজে লেগে ধনদাসকে ফাঁসিয়ে দেবার বদলে তাকে যেন ফাঁপিয়ে দেয়।

রস সাহিত্যের বিক্রি বাড়ে, বিজ্ঞাপন বাড়ে।

প্রেসের কাজ—ভালো ভালো পার্টি থেকে পাওয়া কাজ—এত বেড়ে যায় যে ধনদাসকে কয়েক মন নতুন টাইপ আর কয়েকজন নতুন কম্পোজিটার আমদানি করতে হয়।

উমাকান্তকে ধনদাস প্রায় খাতির করতে আরম্ভ করে জামাইয়ের মতো। তাদের সম্পর্ক যে শুধু মাইনে-দেনেওলা মনিব আর খেটে-খাওয়া চাকুরের—এটা বাতিল করার জন্য উমাকান্তের চেয়ে তারই যেন গরজটা বেশি দেখা যায়।

শবীর ম্যাজম্যাজ করলেই, লেখার কাজে জমে গেলেই, উমাকান্ত কাজে যায় না। মাস হিসাবে নয়, হপ্তায় সে গড়পড়তা দু-একদিন কামাই শুরু করেছে। তবু ধনদাস কিছুই বলে না। শুধু একবার জিজ্ঞাসা করে যে কী হয়েছিল-- উমাকান্ত যে কৈফিয়ত দেয় তাই সে উদারভাবে প্রশান্তমুখে মেনে নেয় !

প্রেসের উন্নতির কার্য-কারণটা বুঝে উঠতে পারেনি, বুঝবার মতো মাথাও ধনদাসের নেই। ও সব জটিল হিসাব বুঝবার সাধও তার নেই। ধনদাস শুধু বোঝে যে মহেশকে তাড়িয়ে উমাকান্তকে সেই পোস্টে এনেই তার ভাগ্য খুলে গেছে।

কাজে এত ফাঁকি দেয় উমাকান্ত, মৃত্যুশয্যাশায়ী খালেকের কবিতা ধনদাসের নিষেধ সত্ত্বেও রস সাহিত্যে ছাপিয়ে দেয়—মানবের একটা ধারাবাহিক উপন্যাস পর্যন্ত তাকে জিজ্ঞাসা না করেই ছাপতে শুরু করে—তবু ধনদাস বছর ঘুরতে না ঘুরতে উমাকান্তকে বিনামূল্যে অফার করে শতকরা পঞ্চমাংশ শেয়ার।

একটু যেন লজ্জিতভাবেই বলে, যা করেছেন তার তুলনা হয় না। মালিকানাব সামান্য একটু অংশ দিচ্ছি—আরও বেশি আপনার পাওয়া উচিত ছিল।

আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে চান ?

বাঁধা তো পড়েই গেছেন—আর বাঁধনে ভয় কী ? মাইনে যা আছে তাই রইল—মাসিক কাজেব হিসাবে একটা কমিশন পাবেন। সাবাবছরের হিসাবে লাভের এই পাঁচ পার্সেন্ট পাবেন।

উমাকান্তের মুখ কেন খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না, ধনদাস বুঝতে পারে না। লেখকেরা খাপছাড়া মানুষ সন্দেহ নেই।

কিছু অবশ্য আসে যায় না তাতে। প্রেস আর কাগজের উন্নতিই তার আসল হিসাব—একমাত্র হিসাব। আবাব ধনদাস হেসে বলে, গা লাগিয়ে কাজ কবছেন--আরও একটু গা লাগান না ? আমার লাভ বাড়িয়ে দিলে আপনার কোনো লাভ নেই, আপনি কোনো ভাগ পাবেন না, এ ধারণা মনেও স্থান দেবেন না। ফাইভ পার্সেন্ট লাভের মালিকানা এমনিতেই দিলাম—পুরস্কার হিসেবে। চেষ্টা করে যত বাড়াবেন তত আপনার মালিকানার শেয়ার বাড়বে। একদিন হয়তো আমার সমান বখরাদার হয়ে যাবেন।

কালাচাঁদ সবই শুনতে পায়।

উমাকান্ত এ সব কথা মানব, মহেশদের যা বলে তাতে মিথ্যার ছাপ না থাকায়, কিছুই বানিয়ে না বলায়, কী খুশিই যে হয় কালাচাঁদ !

কে কোন দরের লেখক ভগবান জানেন কিন্তু এরা খাঁটি মানুষ, মিথ্যার সঙ্গে এরা কারবার করে না।

উমাকান্ত হঠাৎ প্রাণান্তকর আপশোশের সঙ্গে বলে, কী ভেবে গেলাম, কী দাঁড়াল ! চুটিয়ে চাকরি করছি—কাগজটাকে ফাঁপিয়ে দিচ্ছি।

মানব বলে, করে যান না চাকরি, কী আসে যায় ? একজন জাত-সাহিত্যিক, কাগজটাকে ভালো না করে তাজা না করে কী আপনি পারেন ? ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা নিয়ে মেতে থাকলে কি সাহিত্যিকের চলে উমাদা—সাহিত্যিকের অনেক বড়ো ধর্মপালন করতে হয়। কী রকম জ্যান্ত করে তুলেছেন কাগজটাকে !

ধনদাসকেও ফাঁপিয়ে দিচ্ছি।

দিন না ফাঁপিয়ে—ফাঁপতে ফাঁপতে ফটাস করে ফেটে যাবে।

তার বলার ভঙ্গিতে কালাচাঁদ সশব্দ হাসিতে ফেটে পড়ে অনেক চেষ্টায় নিজেকে সামলে নেয়।

উমাকান্তের চাকরি বছর পার হয়ে গেছে। যে উদ্দেশ্যে চাকরি নিয়েছিল, ফল অবশ্য হয়েছে তার বিপরীত—ধনদাসকে ডুবিয়ে দেবার বদলে তার ছাপাখানা আর কাগজ দুয়েরই অনেক শ্রীবৃদ্ধি স্বেচ্ছায় না হলেও তার জন্যই হয়েছে সন্দেহ নেই।

প্রাণের জ্বালা কি কমে গিয়েছে উমাকান্তের ? পুতুলেব শোচনীয মরণের স্মৃতি কি মুছে গেছে তার মন থেকে ? নিভে গেছে প্রতিহিংসার আগুন ?

এ আগুন নিভবার নয়। কিন্তু কী করবে—কাজে ফাঁকি দেওয়ার সাধ্য তার নেই। কাজে ছুটকো ফাঁকি দিয়ে ধনদাসের সর্বনাশ করার সাধও অবশ্য তার মিটবে না, দুশো-পাঁচশো টাকা ক্ষতি করিয়ে দিলে কী আসবে যাবে ধনদাসের !

না, ধনদাসকে সুযোগ-সুবিধামতো প্রাণে মেরে ফেলার কথা সে আগেও ভাবেনি, আজও ভাবে না। মাঝে মাঝে সে শুধু ভাবে যে ওকে মারা কত সহজ !

ধনদাস চোখের সামনে এলেই সে তার মুখে মৃত্যুর ছাপ দেখতে পায়,—সদাজাগ্রত মৃত্যু যেন একটা ঘুমন্ত ভাবের ছাপ হয়ে তার মুখে সব সময় সেঁটে আছে।

পুতুলের গলা ছিল মাখনের মতো নরম, শুধু একটা দাড়ি-কামানো ক্ষুরেব ঘাযেই জল বা বাতাস কাটার মতো অনায়াসে তার গলাটা ফাঁক করে দেওযা যেত। কিন্তু ওভাবে পুতুলকে কেউ খুন করেনি।

ধনদাসের শুষ্ক-শীর্ণ কাঠির মতো বিসদৃশ গলাটা দেখে উমাকান্তের মনে হয় যে ওর গলাব জন্য একটা পেনসিল-কাটা সাধারণ ছুরিও দরকার হয় না, খালি হাতে মুঠো করে ধরে মোচড় দিলেই গলাটা মটকে যাবে।

মাঝে মাঝে তার চাউনি দেখে ধনদাস দারুণ অস্বস্তিবোধ করে।

কী দেখছেন হাঁ করে ?

উমাকান্ত চমকে উঠে। দ্রুতবেগে কয়েকবার চোখ বন্ধ করে আর খোলে, মাথায় ঝাঁকি দেয়।

না না, কিছু নয়।

শুনেছেন তো যা বললাম ?

শুনেছি বইকী।

ধনদাসের বিশ্বাস হতে চায় না। কিন্তু জেরা কবে দেখা যায় উমাকান্ত সব কথাই মন দিয়ে শুনেছে এবং ভালো করে বুঝেছে। কাজের কথা একটিও তার কান এড়িয়ে যায়নি।

ধনদাস তখন একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে, আপনার ভাব দেখে মনে হচ্ছিল অন্য কোনো জগতে বুঝি চলে গেছেন ! একাই থাকেন নাকি বাড়িতে ?

ছেলেমেয়ে ক-টা আছে।

তা জানি। আপনার ছেলেমেয়ের খবর আর রাখি না মশায় আমি ? আপনি তো আর ডাকবেন না, সেদিন বাড়ি খুঁজে নিজে গিয়ে পরিচয় করে এসেছি।

ওদের কাছে শুনছিলাম।

একা থাকেন মানে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে মেয়েছেলে তো কেউ থাকে না ? সংসার দেখবার কেউ নেই ?

না।

ধনদাস একটু চুপ করে থেকে বলে, আর কেন উমাবাবু, এবার একটা বিয়ে-থা করে ফেলুন। শোক-দুঃখ সব সয়েই বাঁচতে হবে তো মানুষকে, হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন ? একটি ডাগর মেয়ে দেখে বিয়ে করে ফেলুন, ছেলেমেয়েদের দেখাশোনাও করতে পারবে।

বিয়ে ? কী বলছেন আপনি ?

উমাকান্তের ব্যাকুলতা দেখে ধনদাস একটু ভড়কে গিয়ে বড়োই বিবক্ত হয়। কে জানে কী অদ্ভুত মতিগতি হয় লেখক মানুষদের !

ধনদাস চলে যাওয়ার পর উমাকান্ত বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবে। আজ স্পষ্ট রূপ নিয়েছে কিন্তু তার সম্পর্কে ধনদাসের এই আগ্রহ ও মনোযোগের ভাবটা সে কিছুদিন থেকে লক্ষ করছিল।

একটা স্নেহপুষ্ট উদার মনোভাব যেন তার সম্পর্কে গড়ে উঠেছে ধনদাসের মধ্যে, তার সে মঙ্গল চায়, তাকে সে সুখী করতে চায়।

চাকরির সাদামাটা সম্পর্ক ছাড়াও তার সঙ্গে খানিকটা পোষ্য-পোষকের সম্পর্ক গড়ে তোলার সাধ যেন জেগেছে ধনদাসের। মুখের তোষামোদ নয়, পা-চাটা নম্রতা নয়—বয়স্ক তেজস্বী পুত্রের কাছে বাপ যেমন অকৃত্রিম সমাবোহহীন সহজ আনুগত্য পায় তেমনি একটু ব্যক্তিগত আত্মীয়তা এবং নিশ্চিন্ত নির্ভরতার ভাব।

মানুক বা না মানুক তার কথাগুলি অন্তত নীরবে শুনে যাবার সম্মানটুকু দেখাবে, তার উদারতা এবং উপকার খুশি হয়ে গ্রহণ করবে।

উমাকান্ত বুঝতে পারে, অনেক অপরাধের ক্ষমাই তার জুটবে ধনদাসের কাছে। মহেশের যে ভুলত্রুটি সহ্য করাই সম্ভব হত না, তার সে রকম ভুলত্রুটি হয়তো তাকিয়ে না দেখেই উপেক্ষা করবে ধনদাস।

একটা কথা মনে হওয়ায় হাসবে না কাঁদবে উমাকান্ত ভেবে পায় না। একটু নম্র আর নত হয়ে যদি সে কিছুদিন চলে, একটু যদি খাতির করে চলে তার প্রতি ধনদাসের পিতৃত্বমূলক পক্ষপাতের সাধটাকে—কিছুদিন পরে আবদার ধরলে তার উপন্যাসের কপিরাইটও হয়তো ধনদাস এমনি তাকে ফিরিয়ে দেবে !

অনুতাপ নয়, অনুতাপের ধার ধনদাস ধারে না। সুযোগ পেলেই মানুষের ঘাড় ভেঙে লাভ করা তার স্বভাব এবং পেশা—ওদিকে পুতুল মরছে বলেই উদারভাবে তার তাড়াতাড়ি উমাকান্তকে বেশি টাকা রয়ালটি দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, না দিয়ে সে মহাপাপ করেছে—এ সব কথা আজও ধনদাসের কাছে হাস্যকর ঠেকবে। মানেই সে বুঝতে পারবে না, ও সব হিসাবনিকাশ বিচার-বিবেচনার !

উমাকান্ত বুঝতে পারে ব্যাপারটা। বছর খানেক তার সঙ্গে কারবার করে ধনদাস জেনেছে যে সে সাদাসিদে ভাবুক চিন্তাশীল মানুষ, ঠকামি ও জুয়াচুরির সুযোগ-সুবিধা পেলে সেটা কাজে লাগাবার কথা সে কল্পনাও করতে পারে না, কখনও কখনও অলস মনে হলেও যখন কোনো কাজে মন দেয় তখন প্রাণপণে না খেটে সে পারে না।

এটাও ধনদাস টের পেয়েছে যে পক্ষপাত ও উদারতা দেখালেও সে কোনোদিন সেটা নিজের কাজে লাগিয়ে তার অসুবিধা করার চেষ্টা করতে পারবে না। ওটা তার ধাতেই নেই।

ওদিক থেকে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। বরং উমাকান্তের কোনো উপকার করতে ইচ্ছা হলে তাকেই নিজে থেকে যেচে করতে হবে।

সব শুনে মানব হেসে বলে, পছন্দ হয়ে গেছে, বাঁধবার চেষ্টা করছে ? করুক না ! আপনাকে আমাকে বাঁধবার সাধ্য কি ওর আছে ?

তারপর বলে, ঠিক আমার কাকার মতো। আমার জন্য ওই ধরনের এক রকম মনোভাব—মমতা বলব না, জিনিসটা স্নেহ-মমতার মতো কিছু নয়—ঝোঁক আছে বলাই ভালো। উনিও চান যে আমি গিয়ে খুব অনুগত হয়ে থাকি। খুব ভালো ব্যবহার করবেন, স্নেহ দেখাবেন, সবকিছু করবেন—শুধু ওই বোঝাপড়াটুকু চাই যে, আমার ভালো চেয়েই উনি আমায় চালাচ্ছেন, আর উনি যেমন চান আমি তেমনিভাবে চলছি।

বড়োই বিশ্রী লাগছে। ভাবলাম এক রকম, হয়ে যাচ্ছে আরেক রকম।

যদ্দিন পারেন চালিয়ে যান। এদিকে মহেশবাবুর কাগজ গজাচ্ছে, আপনার কদর আরও বাড়বে।

পুতুলের দাদা মনোহর পাটনায় চাকরি করে। পুতুলেব মা এবং ভাইবোনেবা সেখানে তার কাছেই থাকে।

পুতুলের আপনজনদের ভুলে থাকার স্বস্তিবোধ কবার জন্য উমাকান্ত নিজের মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছিল যে ওদের সঙ্গে তার সম্পর্কের সূত্র পুতুলেব সঙ্গেই ছিঁড়ে গেছে। প্রথম দিকে যন্ত্রের মতো দু-একখানা চিঠির জবাব দিয়েছিল, তারপর মানসিক বিপর্যয় চরমে ওঠার পব অন্যান্য চিঠির মতো পাটনার চিঠিও আর খুলে পড়ে দ্যাখেনি।

পরে অনেকের সঙ্গে আবার তার চিঠিপত্রের যোগাযোগ গড়ে উঠেছে, কিন্তু পাটনা থেকে আর কোনো চিঠি আসেনি। তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে, তার ওপর চিঠি লিখে জবাব পায় না—কী এমন তাদের গরজ পড়েছে যে গায়ে পড়ে চিঠি লিখে লিখে একতরফা সম্পর্ক বজায় রাখবে ?

কতগুলি বইপত্রের নীচে না-খোলা না-পড়া চিঠিগুলি চাপা ছিল—একদিন নজর পড়ায় খুলে উমাকান্ত পড়ে দেখেছিল। পুতুল মারা যাওয়ার দুমাস পবে লেখা চিঠিতে পুতুলেব বোন মুকুলেব বিয়ের কথা প্রথম উল্লেখ করা হয়েছিল—তারপর তিন-চারখানা চিঠিতে মনোহর বিশদভাবে জানিয়েছে যে মুকুলের বিয়ের জন্য তারা কী রকম ব্যস্ত হয়ে পড়েছে—চেষ্টা তারাও কবছে, উমাকান্তও যেন চেষ্টার ত্রুটি না করে।

এতই কি বড়ো হয়ে গেছে মুকুল তিন-চারবছরে ? তিন-চারবছর আগে পুতুলকে নিয়ে যখন সে পাটনায় গিয়েছিল তখন তো তেমন বড়ো মনে হয়নি তাকে !

ফাল্গুনের গোড়ায় উমাকান্ত মনোহরের আরেকখানা পত্র পায়। সে তিন মাসের ছুটি নিচ্ছে, সকলকে নিয়ে কলকাতায় এসে ছুটিটা কাটাবে—তার জন্য কম ভাড়ায় ছোটোখাটো একটি বাড়ি যেন উমাকান্ত খুঁজে পেতে ঠিক করে রাখে।

মুকুলের কথা উল্লেখ করেনি কিন্তু আত্মীয়তা-ভরা চিঠি। খবরাখবর আদান-প্রদান না করার জন্য অনুযোগ, ছোটোবড়ো দরকারি সব ব্যবস্থা ঠিক করে রাখার জন্য অকুণ্ঠ দাবি, তার জন্য সকলের গভীর চিন্তায় দিন কাটানোর সংবাদ !

পুতুলের মা নাকি তাকে একবার দেখবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে, তাকে দেখলে নাকি মনে খানিকটা শান্তি পাবে।

তার জন্য শাশুড়ির এ রকম উতলা হবার তাৎপর্য উমাকান্ত একেবারেই বুঝতে পারে না। মরা মেয়ের স্বামীকে দেখে মনে শান্তি পাবে ? মেয়েব জন্য শোক তো আরও উথলে উঠবে !

দার্শনিকের উদারতায় আশেপাশের মানুষগুলিকে জানবার বুঝবার ও আপন করার মধ্যেই পৃথিবীর সকলের সঙ্গে কাল্পনিক কুটুম্বিতা হয়েছিল, আসল কুটুম্বের একখানা চিঠির আঘাতেই সেটা যেন ভেঙে গেল।

পুতুলের জন্য বেদনা বৈরাগ্যে রসালো হওয়ায় ইতিমধ্যে হৃদয় কি তার অনেকটা শান্ত হয়েছিল—যে প্রক্রিয়ায় মানুষ সময়ের সঙ্গে শোক-দুঃখের তীব্রতা ও গভীরতা দুই-ই একদিন ভুলে যায়, তারা বেলাতেও কি, সে প্রক্রিয়া তেমনিভাবে ঘটে চলেছিল ?

অসংখ্য বাস্তব স্মৃতির ঘূর্ণাবর্তে হৃদয় যেন আবার মুচড়ে যায়। পুতুল নেই, পুতুলকে সে খুন হয়ে যেতে দিয়েছে, পুতুলের আপনজনেরা তবু তার কাছে দাবি করেছে আত্মীয়তা। সত্যই তো, পুতুলের সন্তান আছে এবং ওরা তাদেব মামা মাসি দিদিমা হয়—এ কথাটা সে যেন ভুলেই গিয়েছিল।

হৃদয় মুচড়ে যায় কিন্তু উমাকান্ত বুঝতে পারে এই বেদনা নিষ্ফল হয়ে যাবে। ধনদাসের প্রিয়পাত্র হয়ে চাকরি করে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই—এমনিভাবেই সে জড়িয়ে পড়েছে চাকবিতে।

পবদিন সে মনোহরকে জবাব লিখে দেয় যে বাড়ি ভাড়া করার দবকার নেই, তার বাসাতেই সকলে কয়েকটা মাস আরামে থাকতে পারবে। আরামে থাকার কথাটা সে কেন লিখল একবার খেয়ালও হল না উমাকান্তের।

মনোহবদের যেদিন পৌঁছবার কথা সেদিন একটা অভিনব অভিজ্ঞতা জুটে যায় উমাকান্তেব। প্রেসে এসেই ধনদাস তাকে সেদিন দুপুরে তার বাড়ি খাওযাব নিমন্ত্রণ জানায়।

বলে, দুপুরে আজ আপনি আমাব বাড়িতে খাবেন উমাবাবু ! কিছু মনে করবেন না, আগে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। কোন সকালে খেয়ে বেরিয়েছেন, এদিকে খেতে খেতেও বেলা হবে—অসুবিধা হবে না মনে হয !

হঠাৎ খেতে বললেন ?

আমাব বাড়িতে দূব সম্পর্কের এক পিসি থাকে, তার মেযে একটা ব্রত নিয়েছে। এই উপলক্ষ আব কী—বড়ো ব্যাপার কিছু নয। মেয়েটি বড়ো ভালো। এমন ভালো মেয়ে আমি আর দেখিনি।

বেশ তো যাব।

আমি একটু ঘুরে আসছি। আপনাকে তুলে নিযে যাব।

স্টেশনে আর যাওয়া গেল না। উপায় কী ? স্বযং ধনদাসের নিমন্ত্রণ তো প্রত্যাখ্যান কবা যায় না, পৃথিবী উলটে গেলেও না। ধনদাস চলে গেলে বিস্মিত উমাকান্ত মনে মনে ভাবে যে হঠাৎ এ কীসের নিমন্ত্রণ ? একটি তুচ্ছ আশ্রিতা মহিলার অতিশয় ভালো একটি মেযে ব্রত করেছে, সে জন্য ধনদাসের বাড়িতে বিশেষভাবে তার নিমন্ত্রণ ? স্বয়ং ধনদাস তাকে গাড়িতে করে বাড়ি নিয়ে যাবে ?

ভাত খেয়ে উমাকান্ত আপিসে এসেছে। কিন্তু নিজের বাড়িতে পুতুলের ভাইবোনদেব আসন্ন আবির্ভাবের উত্তেজনায পেট ভবে খেতে পারেনি। নিমন্ত্রণের মর্যাদা রাখতে পারবে। কিন্তু কেন এ নিমন্ত্রণ ?

রিকশাগাড়িতে বসে ধনদাসের বাড়ির দিকে এগোতে এগোতেও এই কথাটাই উমাকান্ত ভাবে।

ধনদাস এ কথা ও কথার পর বলে, এই নিয়ম সংসারে, জানেন, এই হল সংসারের নিয়ম। একজন রোজগার করবে, দশজন তার ঘাড়ে বসে খাবে। তবে কী জানেন, মেয়েটি বড়ো ভালো। চোদ্দো পেরিয়ে পনেরোয় পা দিয়েছে—সংসাবের এমন কাজ নেই যা জানে না। সেলাই ফোঁড়াই গান-বাজনা এ সবও জানে।

আজকাল এ সব তো শেখাতেই হয় মেয়েদের।

বড়ো স্নেহ করি মেয়েটাকে। পাত্র খুঁজছি—আমি সেকেলে মানুষ, মেয়েদের অল্পবয়সেই পাব করা ভালো মনে কবি। পণ-টন বিশেষ দেব না—তবে নাতজামাযের উন্নতি করিয়ে দেব। ওটা কবতেই হবে, ওটা কর্তব্য, কী বলুন ?

তা বইকী।

অল্প মোটা শ্যামবর্ণা ব্রতচারিণী মেয়েটি তাদের দুজনকে পরিবেশন করে। মেয়ে দেখানো নয়, এ নিমন্ত্রণ। ধনদাস কি মেয়ের দালাল না ঘটক যে তাকে বাড়িতে ডেকে মেয়ে দেখাবে ? কিন্তু লজ্জায়, ভয়ে, ঘামে ও অকাল যৌবনের অসীম কৌতূহলে আত্মহারা বেচারি মেযেটিকে একবার দেখে ঘাড় হেঁট করে উমাকান্ত ভাববার চেষ্টা করে যে ধনদাসের কাছে না জানি সে কত বড়ো অর্থলোভী ভিক্ষুক, লম্পট এবং ছোটোলোক। নতুবা তাকে এভাবে এই বেশে মেযেটিকে দেখানোর কথা ধনদাস কী কবে ভাবতে পারল ?

মেয়েটির গাযে শেমিজ নেই, ব্লাউজ নেই, পরনের শাড়িখানা প্রায় মশাবির কাপড়ের মতো স্বচ্ছ !

এ কী সত্যই ধনদাসের পরিকল্পনা ? ধনদাস বোকা নয়। সে নিশ্চয় জানে এভাবে মানুষকে উত্তেজিত করা যায় কিছুক্ষণের জন্য, কিন্তু সে উত্তেজনা থেকে সামাজিকভাবে বিযে করে কোনো মেযেকে জীবনসঙ্গিনী করাব সুস্থ কামনা মানুষেব জাগে না।

ব্যাপাব সে বুঝতে পারে, খাওয়ার পর বৈঠকখানার বদলে দোতলার একটি সুন্দব সুসজ্জিত ঘরে বিশ্রামের অনুরোধ পেযে।

গড়গড়ায় তামাক আসে—সুগন্ধি তামাক। দু-চাবটা টান দিয়ে ধনদাস নলটা তাব দিকে এগিযে দিয়ে বলে, বিশ্রাম কবুন। প্রেসে যান তো যাবেন, নইলে ছুটি নিন আজকের দিনটা। আমিও শুইগে একটু।

তারপর আসে মেয়েটি, তাব হাতে পানের রেকাবি। ইতিমধ্যে তার বেশ কিন্তু বদল হযে গেছে। শাযা-ব্লাউজ গায়ে উঠেছে, তাঁতের একখানা ডুরে শাড়ি পবেছে।

পান নিন।

উমাকান্তের কেমন ভয় করতে থাকে। মেয়েটিকে তাব ঘাড়ে চালান করে দিতে এমন মবিযা হযে উঠেছে কেন ধনদাস যে সাধাবণ কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত তার লোপ পেয়েছে ?

কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান কি কখনও লোপ পায়, ধীর-স্থিব চালাক-চতুর ধড়িবাজ ধনদাসের ? মতলব না ছকে সে কোনো কাজ করে না। সস্তায় দূর সম্পর্কেব আশ্রিতা মেয়েটির একটি পাত্র জোটানোর মতলবটা সহজেই বোঝা যায়, উমাকান্ত শুধু বুঝতে পারে না তাকে ফাঁদে ফেলবার জন্য বিশেষ কী ফন্দিটা সে এঁটেছে। শুধু মেয়েটিকে এভাবে সামনে ধরার মতো স্থূল উদ্ভট উপায়েব উপরে ধনদাস নির্ভর করেছে এ কথা বিশ্বাস হয় না। অত কাঁচা মানুষ ধনদাস নয। তাছাড়া মেয়েটিকে পাব কবার কীসের এত তাগিদ যে, খেলিয়ে তোলার বদলে বর্শায গাঁথবার মতো এই স্পষ্ট অভদ্র উপায়টা তাকে অবলম্বন করতে হযেছে।

তোমাব নাম কী ?

সুধা।

আচ্ছা সুধা, এবার তুমি যাও। আমার আর কিছু দরকার নেই।

আমায় গল্প করতে বলেছে আপনার সঙ্গে।

আর কী বলেছে ?

বলেছে—সুধা এক মুহূর্ত ইতস্তত করে, তারপর সোজা তার চোখের দিকে চেয়ে বলে, বলেছে আপনি আমার হাত-টাত ধরলে যেন—

চেঁচিয়ে ওঠ ?

না, চুপ করে থাকি।

সুধা পাগল নয়, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি এখন উন্মাদিনীর মতো।

দরজা খোলাই আছে। সেটা কিন্তু কোনো ভবসার কথা নয়। ধনদাসের মতলব সে বুঝে গিয়েছে।

সুধার হাত সে ধরবে কী ধরবে না সেটা তুচ্ছ কথা। খালি ঘরে একলা পেয়ে সুধাকে সে অপমান করেছে, ওতে তার বিয়ে করতেই হবে নইলে তাকে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে আদালতে বিশ্রী মামলা রুজু করা হবে—এ সব হুমকি খাটাবার বুদ্ধি ধনদাস করেনি।

সে আরও নিমন্ত্রণ পাবে, আরও কয়েকবার এমনিভাবেই নিজের হাতে পরিবেশন করে তাকে খাইয়ে নির্জন ঘবে পানের রেকাবি হাতে তার সঙ্গে সুধা গল্প কবতে আসবে। তারপর ধনদাস একদিন আবেদন জানাবে তার বিবেকের কাছে। তাব ভদ্র সভ্য মার্জিত আত্মার কাছে। ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে তাতে বিয়ে না করলে সুধার জীবনটাই নষ্ট হবে যাবে।

বিয়ে করলে দোষই বা কী ? তেমন সুন্দরী নয়, কিন্তু মেয়েটি ভালো ! প্রাণ দিয়ে তার ছেলেমেয়েকে ভালোবাসবে, তার সেবা করবে, বিলাস-ব্যসনের কোনো দায় তার ঘাড়ে চাপাবে না। তাছাড়া ধনদাস তো রইলই দায়িক !

উমাকান্ত মিষ্টিসুরে বলে, বসো। খানিকক্ষণ গল্পই করা যাক।

নিজে খাটেব এক পাশে বসেছিল, অন্য পাশ দেখিয়ে সুধাকে সেখানে বসিয়ে খানিকটা কাছে সরে এসে বলে, আমি বিয়ে কবেছিলাম জানো তো ? ছেলেমেয়ে আছে। বউ মোটে মরেছে বছর খানেক।

জানি।

ছ্যাবলা ছোঁড়া নই। সুযোগ পেয়েছি বলেই হাত-টাত ধরব—সে ভয় কোবো না। বুঝলে ?

সুধাব ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফোটে।

চোখের চাউনি ছিল উন্মাদিনীব মতো, কয়েকবাব উমাকান্তের মুখের দিতে চেয়ে অনেকটা শান্ত আর স্বাভাবিক হয়ে আসে তার চোখ।

ধনদাসবাবু তোমায় খুব ভালোবাসেন—না ?

সুধা চুপ করে থাকে।

মাঝে মাঝে ঝোঁকের মাথায় হাত-টাত ধরেন তো ?

সুধা দুহাতে মুখ ঢাকে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু !

উমাকান্ত অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, একটু চালাক-চতুর হও না ? কেঁদে কোনো লাভ আছে ? ভুল তো তোমার নয়। যে ভুল করেছে সে কাঁদবে ! নষ্ট হয়ে গেছ ভেবো না। নিজেরা নষ্ট না হলে মেয়েদের কেউ নষ্ট করতে পারে না। রামায়ণ মহাভাবত পড়েছ ?

পড়েছি।

তবে অবুঝের মতো ভড়কে গিয়ে কাঁদছ কেন ? কত দৃষ্টান্ত আছে মনে নেই ? শক্ত হও, মনে জোর করো !

সুধা মুখ থেকে হাত সরায় জলে থইথই করছে চোখ কিন্তু আঁচল দিয়ে চোখ সে মোছে না। জড়ানো গলায় জিজ্ঞাসা করে, আপনি রাজি হবেন না তো ? দোজবরে বিয়ে আমি মানব না, ঠিক করেছি। পালিয়ে যাব কিংবা সুইসাইড করব।

সুইসাইড ! লেখাপড়া ভালো শেখেনি কিন্তু সুইসাইড কথাটার উচ্চারণ কী রকম খাঁটি আর চমৎকার !

কোটি কোটি টাকা পেলেও তোমায় আমি বিয়ে করব না সুধা। যার সঙ্গে ভাব হয়েছে তাকে একটু শক্ত হতে বলো, নিজেও একটু শক্ত হও—

কী করে জানলেন ?

এ তো সবাই জানে। দোজবরে বিয়ে মানবে না, সুইসাইড করবে—তার মানেই একবারও বিয়ে করেনি এমন কোনো জোয়ানের সঙ্গে ভাব হয়েছে।

এবার মারাত্মক সমস্যার কথা তোলে সুধা।

উনি যে দুচোখে দেখতে পারেন না তাকে ? পুলিশে ধরিয়ে জেলে দিতে চান !

উমাকান্ত হাসে।

জেলে দেবেন ? তুমি জেলের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে—বলবে যে দুজনকে একসঙ্গে জেলে না দিলে তুমি গেট ছাড়বে না।

এক দিন ছুটি নেবার কথা নিজে থেকে ধনদাস যাই বলে থাক, নিমন্ত্রণ খেয়ে ফেরার পথে প্রেসে গিয়ে কাজকর্মের মোটামুটি হিসাব জেনে নিয়ে উমাকান্ত বাড়ি ফেরে।

আত্মীয় মানুষদের ভিড় করা জমজমাট বাড়িতে বসার এবং লেখার ঘরেই মুকুল সাজিয়ে রাখছিল তার বই, তার খাতাপত্র—দেখে মনে হয় অবিকল যেন প্রথম বয়সের পুতুল !

কখন এলে ?

মুকুল মুখ ফেরায় না।

তা দিয়ে কী দরকার ? একবার স্টেশনেও যেতে পারলেন না লাটসায়েব ! আপনাকে খাতির করার জন্য ঘর সাজাচ্ছি গোছাচ্ছি ভাববেন না কিন্তু। নিজের খুশিতেই করছি।

অবিকল পুতুল !

চেহারা ! কথা ! দাঁড়ানোর ভঙ্গি !

সাজসজ্জার কায়দা পর্যন্ত। পুতুল, মরেনি মনে করলে, পুতুল তার ছড়ানো বইগুলি সাজিয়ে রাখছে মনে করলে শুধু এইটুকু ভুল হয় যে, এ মেয়েটা সত্যি সত্যি পুতুল নয়, যে পুতুল মরে গেছে এ মেয়েটা তার বোন মুকুল। আত্মীয়তা টানতে হয় রাত এগারোটা অবধি, কিন্তু উমাকান্তের খারাপ লাগে না।

পুতুলের মতোই তার রাত্রের শয্যা রচনা করতে আসে মুকুল। বিছানা পেতে মুকুল ঠিক পুতুলের মতো সুর ও কথা বলার ভঙ্গিতে বলে, দয়া করে এবার খাবেন মহারাজ ?

স্বেচ্ছায় নয়, আপনা থেকেই মুকুল নকল করছে পুতুলকে। উমাকান্ত পুরানো জীবন নকল করে বলে, আগে তোকে খাব।

খান। বাগে পেলেই খাওয়ার জন্যই আপনাদের জন্ম। পুরুষদের এমন ঘেন্না করে আমার !

সুধাকে স্মরণ করে উমাকান্ত হেসে বলে, তাহলে তো মুশকিল, খাওয়া চলবে না। পুরুষ জাতটার ওপর ঘেন্না ! এ মেয়ে কোন পুরুষের হজম হবে ?

বলতে বলতে সে গম্ভীর হয়ে যায়, তোকে দেখে পুতুলের জন্য মনটা বিগড়ে গেল মুকুল। ঠিক পুতুলের মতো দেখাচ্ছে তোকে। পুতুলও ঠিক এমনিভাবে শাড়ি পড়ত। পুতুল ঠিক এমনিভাবে আমায় ডেকে খেতে দিত।

নীরবে সে ভাত-ডাল মাছ-বুটি খেয়ে যায়। রেঁধেছে নাকি মুকুল, অবিকল যেন পুতুলের রান্না !

হঠাৎ সে বলে, পেট ভরালে হবে না। প্রাণ ভরাতে হবে।

মুকুল হঠাৎ কেঁদে ফেলে।

প্রাণ তো ভরাবই। ক-দিন পেট ভরে খেয়ে চেহারাটা ঠিক করুন, কলিতে অন্নই প্রাণ জানেন তো ?

১০

আত্তির মা-র অসুখের কথা বলে কালাচাঁদ দুদিন আগে কিছু টাকা আগাম চেয়ে নিয়েছিল, উমাকান্ত জিজ্ঞাসা করে জেনেছিল আত্তির মা-র জ্বর হয়েছে।

ধনদাস উমাকান্তকে ডেকে বলে দেয়, কালাচাঁদকে এক মাস কাজে আসতে বারণ করবেন। ওর বউয়ের বসন্ত হয়েছে। সামনের মাসের পূর্ণিমার পরদিন থেকে যেন কাজে আসে।

পূর্ণিমার পর কেন ?

আছে আছে, কারণ আছে। এ রোগ হবার পর একটা অমাবস্যা ও একটা পূর্ণিমা কেটে গেলে ছোঁয়াচ লাগে না।

ধনদাস একবার শিউরে ওঠে !

ব্যাটা কী কাণ্ড জানেন মশায় ? একেবারে বাড়িতে গিয়ে হাজির—বউয়ের ওপর মা-র দয়া হয়েছে, কিছু টাকা দিতে হবে ! সটান বৈঠকখানায় ঢুকে পড়েছে, বললেও কি নড়তে চায় ? শেষে ধমক দিতে রাস্তায় নেমে গেল।

কালাচাঁদকে সে টাকা দিয়েছে কি না এ প্রশ্ন উমাকান্ত জিজ্ঞাসা করে না, অবিকল পুতুলের মতো চেহারা নিয়ে মুকুল এবং মনোহরেরা আসবার পর থেকে ক-দিন মনটা তোলপাড় করছিল, লোকটার উপর তীব্র আক্রোশ আবার নাড়া খেয়ে জেগে উঠেছিল।

ধনদাস হঠাৎ তাকে জিজ্ঞাসা করে, কী ব্যাপার, মুখ এত শুকনো কেন ? চেহারা এমন হচ্ছে কেন ?

কী হয়েছে চেহারায় ?

রোগা হয়ে শুকিয়ে যাচ্ছেন যে দিন দিন !

ধনদাসের সরু গলাটার দিকে চেয়ে অনেক দিন পরে আবার উমাকান্তের হাত নিশপিশ করতে থাকে।

কালাচাঁদ দুদিন কাজে আসে না। পরদিন সে আসতেই উমাকান্ত তাকে ডেকে ধনদাসের হুকুম শুনিয়ে দেয়।

ছুটি কী রকম বাবু ? মজুরি পাব তো ?

কাজ করবে না মজুরি পাবে কী হে ! ধনদাসবাবু ও রকম মজুরি কাউকে দেয় ? তবে তোমায় বরখাস্ত করা হচ্ছে না, এক মাস পরে এসে যেমন কাজ করছিলে তেমনি করে যাবে।

কালাচাঁদ তবু প্রতিবাদ জানায়—বাড়িতে রোগ, এখনই আমার রোজের দরকার বেশি, এখন বলছেন বিনে মাইনেয় ছুটি নিতে !

কালাচাঁদ উমাকান্তকে বোঝাতে চায় যে ঘরে রোগব্যারাম থাকলে টাকার দরকারটা বেশি হয়। উমাকান্তের জানতে যেন বাকি আছে ! সে বলে, আমি বরং নিজের দায়িত্বেই আরও ক-টা টাকা তোমায় আগাম দিচ্ছি। মানুষটাকে তো চেনো কালাচাঁদ, আমার কী করার আছে বলো ?

তিন দিন পরে কালাচাঁদ আবার এসে দাঁড়ায়।

উমাকান্ত দম নেয়। কালাচাঁদ ঢোঁক গেলে।

আবার তুমি কেন এলে কালাচাঁদ ? বাবুর স্পষ্ট হুকুম তোমায় এক মাস প্রেসে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ছোঁয়াচে রোগ কিনা !—ওনাব ভয়ানক আতঙ্ক, তোমার দূরে থাকাই ভালো কিছুদিন।

স্তিরি আজ মারা গেছে বাবু ! ভোরবেলা।

মারা গেছে ? ওঃ !—

উমাকান্ত স্তব্ধ হয়ে থাকে।

কিছু টাকা নিতে এসেছিলাম বাবু ! স্তিরির সৎকাবে লাগবে। ও মাসে কেটে নেবেন। আর ছুটিফুটি দেবেন না বাবু, ছুটি চাইনে ! ছুটি নিলে কি মোদেব চলে ?

কী করা যায় ! কী করে একে বুঝানো যায় যে, বাড়িতে এ সব রোগ হলে বরখাস্ত করার বদলে বিনা বেতনে এক মাস ছুটি দেওয়া ধনদাস বিশেষ অনুগ্রহ বলে মনে করে !

গভীর বিতৃষ্ণায় উমাকান্তের দেহমনে কেমন একটা অস্থিরতা ঘনিযে আসে। ধনদাস হুকুম দিযেই খালাস—এদের সঙ্গে সরাসরি খারাপ ব্যবহার করার দায়টা চাপিযে দেওয়া হয় তার ঘাড়ে।

যার স্ত্রী আজ সকালে মারা গেছে, অমানুষ দানবের মতো কী কবে তাকে বলা যায যে, আব আগাম টাকা হবে না, অবিলম্বে তুমি প্রেস থেকে বেরিযে যাও !

অথচ না বলেও উপায় নেই।

খেদেব সঙ্গে সে বলে, টাকা তো হবে না কালাচাঁদ।

ঘবে মড়া পচবে বাবু ?

উমাকান্ত চোখ বোজে। বলে, ধার-টার করে জোগাড় করে নাও।

কে আর ধার দেবে বাবু ?

কালাচাঁদ যেন হন্যে কুকুরের মতো ঘেউঘেউ করে কথা বলে, যদিও কথাগুলি বলে অতি সাধারণ—স্তিরি, আর পিসিকে ধরেছেন শেতলা ! অ্যাদ্দিন চিকিৎসে হল কীসে ? ধার করতে বাকি বেখেছি কোথাও ? আপনিই তবে ধার দেন বাবু ক-টা টাকা। ও মাসে ঘটিবাটি বেচে শোধ কবে দেব।

উমাকান্ত ধাব দেবে ? টাকা কই তার কাছে ! পুতুলেব আপনজনদের আবামের ব্যবস্থা কবতে নিজেকেই তাব টাকা ধার করতে হয়েছে মাসেব মাঝামাঝি—বেতনেব টাকায কুলায়নি।

তবে সামনেব মাস থেকে ওদের খবচ হবে আলাদা।

আমার হাত একেবাবে খালি।

জানি বাবু, জানি !

কালাচাঁদ খেঁকিয়ে ওঠে। নিরীহ গোবেচাবি কালাচাঁদ যেন সব জানে তাই তার আব কিছু বলবার নেই ! সে যেন জানে যে, উমাকান্তরা নিজেদের স্ত্রীদের খুন হতেও দেয় আবার কালাচাঁদের স্ত্রীরা মরে গেলেও দশটা টাকা ধার দেওয়া কর্তব্য মনে কবে না।

ব্লটিংয়ে আঁচড় কাটে উমাকান্ত। নিজেকে সত্যই তার অপরাধী মনে হয়—বউ মরে গেলে তাকে পোড়াবার জন্য টাকার খোঁজে হন্যে হয়ে বার হতে হয় কালাচাঁদের—এ অবস্থার জন্য সে-ই যেন দায়ি।

মুখ তুলে সে ধীরে ধীরে বলে, আমার কাছে টাকা থাকে না জানো তো ? একটু অপেক্ষা করো, বাবু আসুন। উনি অবশ্য স্পষ্টই বলে দিয়েছেন তোমায় আব আগাম টাকা দেওয়া হবে না। তবু একবার বলে-কয়ে চেষ্টা করে দেখি।

কালাচাঁদ সহকর্মীদের কাছে যায়। সকলেই কাজ বন্ধ করে তাদের কথা শুনছিল।

কুড়ি-বাইশবছরের ভুবন হরফ সাজানোর কাজ শিখছে। কালাচাঁদকে ইশারায় কাছে ডেকেও সে গলা চড়িয়ে সকলকে শুনিয়ে বলে, তা হবে না। ক-টা টাকার অভাবে কালাদার বউ মরে গিয়ে ঘরে পচবে—আমরা তা হতে দেব না।

কোণের দিক থেকে বুড়ো নকুড় আরও জোরে চেঁচিয়ে বলে, নিশ্চয় হতে দেব না। টাকা না দিলে সবাই মিলে টাইপের কেসগুলো নিয়ে গিয়ে আত্তির মা কে পোড়াব।

কুঞ্জ অত জোরে চেঁচায় না কিন্তু জোরের সঙ্গে বলে, দেবে দেবে—টাকা দেবে। এত বছর খাটছে-- বউকে পোড়াবার জন্য ক-টা টাকা আগাম দেবে না, ইয়ার্কি নাকি !

উমাকান্ত ব্লটিংয়ে আঁচড় কেটেই চলেছিল—হঠাৎ সে মুখ তুলে বলে, চেঁচামেচি হইচই করছ কেন তোমরা ? কাজ চালিয়ে যাও। কালাচাঁদ টাকা পাবে—ব্যবস্থা করে দেখি। টাকা না দিলে আমিও আজকেই ইস্তফা দেব কাজে।

সকলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কালাচাঁদকে টাকা দেওয়া না হলে একেবারে চাকরি ছেড়ে চলে যাবে--তার কাছে এমন কথা কেউ প্রত্যাশা করেনি। সকলেই কাজ শুরু করে দেয়।

ধনদাস এসে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে নিজের কামরায় চলে যায়—কালাচাঁদ যে তার নজরে পড়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সবাই নিজের নিজের জায়গায় বসে কাজ করেছে, একটা গেঞ্জি গায়ে কালাচাঁদ শুধু দাঁড়িয়ে আছে উদ্‌ভ্রান্ত একটা মূর্তির মতো।

উমাকান্ত ধনদাসের কামরায় যায়।

ধনদাস আপশোশের সুরে বলে, এত করে বললাম, তবু ওকে প্রেসে ঢুকতে দিয়েছেন ?

উমাকান্ত বলে, ওর স্ত্রী আজ সকালে মারা গেছে। পোড়াবার টাকা নেই—ক-টা টাকার জন্য মরিয়া হয়ে এসেছে।

উমাকান্তের মুখের গম্ভীর ভাব দেখে মৃদু হেসে ধনদাস বলে, বাজে কথা। একটা মানুষকে পোড়াতে কত টাকা লাগে ? দরকার হলে পাড়া প্রতিবেশীরাই ওই সামান্য টাকা জুটিয়ে দেয়। আসলে ওদের হল সুযোগ পেলেই আদায়ের মতলব। যাকগে, গোটা পনেরো টাকা দিয়ে দিন।

উমাকান্ত কাঠের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে .

অত্যন্ত বিচলিতভাবে ধনদাস কয়েক মুহূর্ত তার ভাব লক্ষ করে। তারপর সেও গম্ভীর হয়ে যায়।

ও, ঠিক কথা, একদম খেয়াল ছিল না। একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি—এবার থেকে আপনার কাছে একশো টাকার মতো সব সময় জমা থাকবে। আমারই ভুল হয়েছে, এ সব ছুটকো ব্যাপার মেটাবার জন্য আপনার কাছে কিছু টাকা রাখা উচিত ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে একশো টাকার নোট বার করে গুনে উমাকান্তের হাতে দিয়ে, তাকে দিয়ে আরেকবার গুনিয়ে লিখিত রসিদ নিয়ে ধনদাস হেসে বলে, আপনার রাগ হবার কথাই। এ সব ছুটকো ব্যাপারেও যদি কিছু করার স্বাধীনতা না থাকে, একজন পুরানো লোককে পনেরো-বিশটা টাকা পাইয়ে দিতে আমার কাছে আসতে হয়—আপনি তাহলে কাজ চালাবেন কী করে ?

উমাকান্ত প্রায় গলে গিয়ে বলে, হ্যাঁ আমিও জ্বালাতন হই, আপনিও জ্বালাতন হন।

ধনদাস বলে, একশো টাকা সব সময় পুরো করে রাখবেন। কাকে কী দিলেন রসিদ নিয়ে হিসেবটা পাঠাবেন—টাকাটা রোজ পূরণ করে দেব। তবে একটা কথা মনে রাখবেন—

এবার কড়া শোনায়, ধনদাসের গলা।

চাইলেই যেন টাকা দিয়ে বসবেন না। কালাচাঁদের বউ মরেছে, পোড়াতে হবে—এ রকম সিরিয়াস ব্যাপারেই শুধু দেবেন।

কালাচাঁদ চলে যাবার পর ভিতরে একটা তোলপাড় চলতে থাকে উমাকান্তের।

কালাচাঁদের বউকেও মরতে হল টাকার অভাবে ঠিকমতো চিকিৎসা না হওয়ার জন্য ? পুতুলের মতোই মৃত্যুবরণ করতে হল আত্তির মা-কে—তারই মতো নিরুপায় কালাচাঁদকেও যেন মেনে নিতে হল সেই মরণ ?

চোখের সম্মুখ থেকে একটা কালো পর্দা যেন সরে যায় উমাকান্তের। এইখানে চেয়ারে বসে চারিদিকে সে দেখতে পায় এই রকম অজস্র ও বিচিত্র প্রক্রিয়ার হত্যাকাণ্ড।

চিকিৎসার অভাবে যারা মরে, রোগ তো তাদের মৃত্যুর কাবণ নয় ! ডাক্তাব থাকতে, দোকান-ভবা ওষুধ থাকতে সেরে ওঠার বদলে যে মরে যায়, হত্যাই তো করা হয় তাকে। পুষ্টির অভাবে যাদের দেহ রোগ ঠেকানোর ক্ষমতা হারায়, আলো-বাতাসহীন নোংরা আবর্জনাময় রোগের ডিপোতে যাদের রোগের সঙ্গে বসবাস করতে হয়, আত্মরক্ষার সহজ রীতিনীতি যাবা জানবার সুযোগ বা মানবার মনোভাব পায় না, তাদের অকালমৃত্যু, হত্যা ছাড়া আব কী ? দেশজুড়ে অনিবার্য গতিতে চলেছে মানুষের এই খুন হবার একটানা ব্যাপক প্রক্রিয়া—কারও বেলা আকস্মিক, কারও বেলা দ্রুতবেগে, কারও বেলা তিলে তিলে মন্থর গতিতে।

উমাকান্ত শিউরে ওঠে, তার মাথা ঘুবে যায়।

এই প্রকাশ্য ও বিরাট হত্যালীলার মধ্যে এতকাল বেঁচে থেকে এটা সে খেয়াল করেনি, মুখে মুখে অপমৃত্যুর যে অদৃশ্য নোটিশ লাগানো থাকে সেটা চোখে পড়েনি ! শুধু কি তাব একাব ?

ক-জনের এ কথা মনে হয়েছে যে আইনের সংজ্ঞার দু-দশটা খুন ছাড়াও জগতে অগণ্য খুন চলছে অনিয়মের ?

উমাকান্ত বসে বসে ভাবে।

প্রেসের কর্মব্যস্ত মানুষগুলিকে দেখতে দেখতে ধনদাসের প্রতি এক অভূতপূর্ব তীব্র ঘৃণায তার হৃদয় ভরে যায়। এমন ঘৃণা সে জীবনে কখনও অনুভব করেনি, পুতুলের অপমৃত্যুর পবেও নয়। মৃদু হোক, জোরালো হোক, ঘৃণার সঙ্গে চিরদিন সে অবজ্ঞা আর কেমন একটা অস্থিবতার কষ্ট অনুভব করেছে। আজ এমন প্রচণ্ড ঘৃণায় হৃদয়মন ভরে গেলেও ও সবকিছুই সে বোধ কবে না, এক অসাধারণ ধৈর্য ও দৃঢ়তার অনুভূতির মধ্যে নিজেকে মহৎ ও শক্তিশালী মনে হতে থাকে।

সে যেন সত্য দর্শন করে আজ ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত ঘৃণা-বিদ্বেষের বহু ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছে। ধনদাস যেমন লক্ষ লক্ষ মানুষের খুনেদের প্রতীক, সে তেমনি তাকে ঘৃণা করছে—তাদের সকলেব প্রতিনিধি হিসাবে—যারা খুন হয়েছে এবং হচ্ছে। সে নিজেও ওদেবই দলে।

১১

উমাকান্ত মনেপ্রাণে বিশ্বাস কবে যে ধনদাসকে খুন করা এক অর্থহীন অবান্তর চিন্তা। ওকে প্রাণে মেরে তার বা কালাচাঁদদের কোনো লাভ নেই—প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার লাভটুকু পর্যন্ত নয় !

পুতুলের মতো ওর যদি কোনো প্রেযসী বউ থাকত, ছেলেমেয়ের মা থাকত—তাকে মারলেও বরং নিজেকে ভোলানো গেলেও যেতে পারত যে প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে।

বউ অবশ্য আছে ধনদাসের—ছেলেমেয়ের মা-ও সে বটে। কিন্তু ধনদাসেব অত্যাচারে সে বেচারাই হয়তো ভগবানের কাছে দিবারাত্রি নিজের মৃত্যু কামনা করছে !

ধনদাসও হয়তো চায় পুরানো সেকেলে রোগজীর্ণ গিন্নিটা এবার তার গত হোক—আরেকটি বেশ টুকটুকে বউ সে ঘবে আনতে পারুক।

সে তার বউ মেরে তাকে কাঁদিয়ে জ্বালিয়ে প্রতিশোধ নিতে চায় জানলে, ধনদাস নিজেই হয়তো তাকে সব রকমে সাহায্য করবে, তার যাতে কোনো শাস্তি না হয় সে ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেবে—বড়ো রকম পুরস্কারও দেবে !

এত জটিল মানুষের জীবন ! এই জীবনের মর্ম অনুভব করা—জীবন-সত্য ধরতে পারা—তবে লেখক হওয়া ?

এবং লেখক হয়েও জীবন-সত্য আবিষ্কার করে করে চলা—আরও সহজভাবে জীবনকে জেনে, আরও সোজা ভাষায় জানাটুকু দশজনকে জানিয়ে দেবার একটানা চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া !

মা-র জন্য আত্তি বেশি কাঁদেনি।

কালাচাঁদও খুব বেশি মুষড়ে যায়নি। মাস খানেকের বাধ্যতামূলক ছুটিটা ঘরে বসে কাটাবার সাধ তার ছিল না। এদিক-ওদিক আলগা কাজ খুঁজছিল।

জহর আর মহেশের সঙ্গে কথা বলে মানব তাকে একটা দায়িত্বপূর্ণ সাময়িক কাজ জুটিয়ে দেয়। এক লাইন কম্পোজ করতে হবে না। জহর ও মহেশের নতুন প্রেসটা চালু করার খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলি সব সে ঠিকঠাক করে দেবে। উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা, পরিদর্শক হিসাবে সে কাজ করবে !

কালাচাঁদ গোমড়া মুখে বলে, একেবারে নিয়ে নিলে হত না ? এ সব খুঁটিনাটিও দেখতাম, কম্পোজও চালিয়ে যেতাম ?

মানব বলে, ওখানে কাজটা যখন বজায় আছে ছাড়বে কেন ? চাদ্দিকে কত যে বেকার কালাচাঁদ ! এ প্রেসে যারা খাটবে তাবা মজুরি কম পাবে, পরে লাভের ভাগ পাবে। দু-চারবছর ওভাবে চালানো কি পোষাবে তোমার ?

কালাচাঁদ বলে, বউটাকে খুন করল। ওর প্রেসে গিয়েই খাটব আবার !

তখন আত্তির মা-র মরণের জন্য ধনদাসের দায়িত্ব নিয়ে দুজনের কথা হয়। মানব তাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে যে পুতুলকে প্রকারান্তরে খুন করেছে বলা গেলেও আত্তির মাকে খুন করার প্রধান দায়টা খাটুয়েদের জন্য চলতি অব্যবস্থায়, ধনদাসের একার দায় নয়।

কালাচাঁদ রেগে আগুন হয়ে বলে, কী বলছেন মানুবাবু ? আপনিও শেষে ও ব্যাটার দিকে টানছেন ? দেহপাত করে কত বছর খেটে এলাম, ব্যাংকেও ব্যাটার টাকা পচে যাচ্ছে। ছ-মাসে শোধ করে দেব বলে একশোটা টাকা ধার চাইলাম—যদ্দিন না টাকা শোধ হয় গোলাম হয়ে খাটার খত লিখে দেব বললাম—তবু টাকা দিলে না !

কালাচাঁদ একটা বিড়ি ধরায়।

টাকাটা পেলে বাঁচাতে পারতাম আত্তির মাকে। টাকাটা না দিয়ে উমাবাবুর বউয়ের মতো আমার বউকেও ও ব্যাটা খুন করেছে। সোজা কথা আপনি আজকাল জড়িয়ে ফেলছেন মানুবাবু, ব্যাপারটা কী ?

মানব তার কাছ থেকে একটা বিড়ি চেয়ে নিয়ে ধরিয়ে বলে, ব্যাপার খুব সোজা। পুতুলদিরা, আত্তির মায়েরা খুন হবেই—সে জন্য আমরা দিশেহারা হব না। আমরা বুঝব ব্যাপারটা কী, কার দায় কতখানি, বুঝে ব্যবস্থা করব।

কালাচাঁদ বলে, বটে নাকি !

মানব বলে, নিশ্চয়। হৃদয় নিয়ে অনেক হাজার বছর মেতে থেকেছি। এবার আর হৃদয় নয়—নেশা নয় ! এবার শুধু হিসাব।

একেবারে বিনা চিকিৎসায় না হলেও আত্তির মা-ও ভালো চিকিৎসার অভাবেই মারা গেছে। তবে পুতুলের মরণের মতো সোজাসুজি আত্তির মা-র মরণের দায়টা একা ধনদাসের উপর চাপানো যায় না।

অন্য অবস্থায় উমাকান্ত একটা নতুন উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে এলে ধনদাস খুশি হয়ে দরদস্তুর করে আরও কিছু বেশি দাম দিতে রাজি হয়ে প্রথম সংস্করণের রাইটটাই কিনে নিত সন্দেহ নেই। এবং চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করার সময় শ-দেড়েক টাকা নগদ দিতেও আপত্তি করত না।

পুতুল মরণাপন্ন জেনেই, উমাকান্তকে নিরুপায় জেনেই, সে সামান্য টাকায় একেবারে বইটার কপিরাইট কিনে নেবার দাঁও মারতে চেয়েছিল। পুতুলের মরণের জন্য সেই তাই প্রধান দায়িক।

কিন্তু চলতি নিয়ম আর নীতি অনুসারে তার কাছে কোনো পাওনা ছিল না কালাচাঁদের। যে রকম চিকিৎসা আব সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা হলে আত্তির মা হয়তো বেঁচে যেত, আত্তির মায়েদের জন্য সে রকম চিকিৎসা আর সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা বর্তমান অবস্থায় অসম্ভব। ধনদাসের উদারতার প্রশ্ন তোলাও মূর্খামি। একজনের উদারতায় লাখ লাখ আত্তির মায়েদের রোগ সারাবার উপায় হয় না !

কালাচাঁদ নীরবে মানবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুনে যায়। আর কোনো মন্তব্য করে না বা প্রতিবাদ জানায় না।

আত্তির মা-র মরণ কালাচাঁদের জীবনে একটা বিপর্যয় এনে দেবে জানাই ছিল। সেই সঙ্গে একঘেয়ে কাজ থেকে কিছুদিনের বিরাম !

কালাচাঁদ একটা অদ্ভুত রকম তাজা গল্প লিখে ফেলে —নাম দেয়, হরফ।

ধনদাসকে ঘৃণা করে লেখা গল্প—পড়লেই বোঝা যায়। সেই সঙ্গে চাঁছাছোলা ব্যঙ্গ মেশানো থাকায় আঘাতটা হয়েছে তীব্র !

মানব বলে, তোমার এই লেখাটা আমি নামকবা বড়ো কাগজে ছাপাতে পাবব না কালাচাদ। এ রকম লেখা ওদের কাছে বিষের মতো। ছোটো নতুন কাগজে ছাপিয়ে দেব—পয়সাকড়ি কিন্তু পাবে না কিছু।

কালাচাঁদ হাত বাড়িয়ে বলে, থাকগে তবে, লেখা ছাপিয়ে দিয়ে কাজ নেই। হাড়কালি কবে খাটব, মজুরি পাব না, ও ব্যাপারে আমি নেই মানুবাবু !

আমার আর খালেকের লেখা ছাপিয়ে মহেশবাবুর চাকবি গেল দেখলে না ?

চাকরি তো অমন কত শত লোকের যাচ্ছে, কত শত লোক চাকরি পাচ্ছে না। তার সাথে মোর লেখা ছাপানোর সম্পর্ক কী ? যে কাগজে ছাপিয়ে দেবেন লেখাটা, সে কাগজটা বিনি পয়সায় বিলি হবে নাকি ? বিজ্ঞাপনের জন্য পয়সা নেওয়া হবে না। শুধু মোব লেখাব খাটুনির মজুরি হবে না !

প্রায় কথকতার ভাষায় লেখা অদ্ভুত রকম সতেজ আর মর্মস্পর্শী গল্পটা পড়েই, প্রায় উত্তেজিত হয়ে মানব যেভাবে হোক যে কোনো মাসিকে হোক গল্পটা ছাপিযে দেবে বলেছিল।

ভেবেছিল প্রথম গল্প ছাপা হবে, কালাচাঁদ নিশ্চয় ধন্য হয়ে যাবে ! কিন্তু বিনা মজুরিতে প্রথম লেখা ছাপতে দিতে কোনোমতেই রাজি নয় কালাচাঁদ।

মানব তাকে লেখা ছাপানোর ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে। বলে, সামান্য ক-টা টাকার জন্যে কেন বোকামি করছ কালাচাঁদ ? নতুন লেখক কাউকে লেখার জন্য টাকা দেয় না, তোমার জন্য কী করে টাকা চাইব বলো ?

খেটেছি—মজুরি চাই।

তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না ব্যাপারটা। এই লেখাটা ছাপিয়ে একটা হইচই সৃষ্টি করে আমি তোমায় তাড়াতাড়ি তুলে দিতে চাই। আমি নিজে একটা ভূমিকা লিখে তোমার লেখাটা ছাপাব। একজন অল্পশিক্ষিত শ্রমিক যে নিজের চেষ্টায় এমন জোরালো গল্প লিখতে পেরেছে এটা তুলে ধরব, তোমার গল্পের আসল গুণ কী ধরিয়ে দেব। তারপর সকলকে লেখাটা পড়াব, সাহিত্য বৈঠকে লেখাটা নিয়ে আলোচনা করব। নাম হলে যেচে তোমার লেখা নেবে, টাকাও দেবে। নামের জন্য লেখকেরা প্রথমে কত ত্যাগ স্বীকার করে, তুমি সামান্য ক-টা টাকার মায়া ছাড়তে পারছ না ?

একগুঁয়ে কালাচাঁদ তবু সতেজে মাথা নাড়ে, মাপ করবেন মানুবাবু। বিনা মজুরিতে খাটুনি বেচব না। আপনাদের বিচারবিবেচনা মাথায় ঢোকে না মোটে। পয়সা দিয়ে কাগজ কিনবেন, পয়সা দিয়ে ছাপাবেন, সম্পাদককে পয়সা দেবেন, এজেন্টদের কমিশন দেবেন, নামকরা লেখককে পয়সা দেবেন, লোক পাঠিয়ে পাঠিয়ে পয়সা দিয়ে লেখা ভিক্ষে চাইবেন—নতুন লেখকের লেখা ছাপবেন বিনা পযসায় ?

কালাচাঁদ জ্বালাভরা হাসি হাসে।

চটবেন না মানুবাবু, এত খেটে লিখে বিনা পয়সায় লেখা দিয়ে নাম করে মোর কাজ নেই। সবাই খাটুনির মজুরি পাবে, নতুন লেখক পাবে না ? এ উল্টট নিয়ম চলবে কেন গো মানুবাবু ? অ্যাপ্রেন্টিসও কিছু পায—নতুন লেখক খাতিরে লিখবে কেন ?

নতুন লেখক খেটেও মজুরি পায় না—এ অবস্থা পালটাবার জন্য যে কাগজ লড়ছে—সে কাগজে জোরালো লিখবে।

কালাচাঁদ হেসে বলে, সে তো আলাদা কথা হল মানুবাবু ! খাটুয়েদের লড়ায়ে কাগজেও বিনা মজুরিতে কেউ লেখে কি ? খেটে লিখেছি, মজুরি পাওনা হবেই—তবে কি না নগদ না পেয়ে ওটা জমা হল ফান্ডে। অমনি কোনো কাগজে ছাপবেন কি লেখাটা, যে কাগজে কোনো লেখার নগদ মজুরি দেয় না ?

মানব খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলে, এদিকটা তো খেয়াল কবিনি কালাচাঁদ !

কালাচাঁদ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, নিয়ম-অনিয়ম খেয়াল করতে ভুলে যান বলেই তো মোদের এই দুর্দশা। খেয়াল হয়নি বলে আপশোশ করলেন, ফুরিয়ে গেল। খেয়াল না হওয়ার জন্য কানমলার কেউ তো নেই !

মানব বলে, তোমায় আজ বড়ো গরম দেখছি কালাচাঁদ ?

কালাচাঁদ মাথা নাড়ে।

গবম মোটেই নই মানুবাবু। আপনাদের কত জ্ঞান, কত বিদ্যা, কত পড়াশোনা। মোদের ওভারটাইমের ঝগড়া নিয়ে জেল খেটে এলেন। তবু আপনার সোজা কথাটা খেয়াল নেই যে খাটালে মজুরি দিতে হয় !

লেখাটা আমার কাছে থাক। দেখি কী করা যায়।

মহেশকেই গল্পটা পড়তে দেয় মানব। প্রেস চালু হবার পর মহেশের সম্পাদনায় একটা মাসিকও বার করা হবে।

মহেশ গল্পটা লুফে নেয়।

বলে, শুধু মজুরি দিয়ে ছাপব ! এই গল্পের নামে কাগজের নাম হবে। লাগসই একটা নাম খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

পড়তে পড়তে মনে হয় সে যেন লেখার জন্য লেখেনি, লেখক হবার জন্য লেখেনি, তার মতো সকল মানুষের প্রাণের তারে সুর মিলিয়ে লেখায় একটি মর্মান্তিক অভিশাপ-বর্ষণ ঝরেছে, ধনদাসের মতো জগতে যত মানুষ আছে, তাদের উপর।

লেখাটা ছাপাবার আগে মানবকে দিয়ে কালাচাঁদকে মহেশ তার নতুন সম্পাদকীয় দপ্তরে সন্ধ্যার পর চা খাবার নেমন্তন্ন জানিয়েছিল।

মানব আর কালাচাঁদ আসে প্রায় একসঙ্গে—দু-চারমিনিট আগে পরে।

কালাচাঁদকে রীতিমতো সমাদর করে বসিয়ে মহেশ বলে, কম্পোজিটার হিসাবে নয়—তোমায় চা খেতে ডেকেছি লেখক হিসাবে। কাজেই চেয়ারে জাঁকিয়ে বসো—ভুলে যাও যে তুমি কম্পোজিটার। তোমার লেখার নামে কাগজের নাম হবে ঠিক করেছি, তোমার লেখাটা প্রথম ছাপাব ঠিক করেছি।

চেয়ারে কালাচাঁদ জাঁকিয়েই বসে, কিন্তু শান্ত নম্রসুরে বলে, আমি কম্পোজিটার এটা ভুলতে হবে কেন, মহেশবাবু ?

তুমি লেখক হিসাবে এসেছ বলে !

কম্পোজিটার বুঝি লেখক হয় না ? বারণ আছে ?

মহেশ লজ্জা পায়—খুশিও হয়। বলে, তুমি ঠিক বলেছ, আমারই ভুল হয়েছে, ও কথা বলে তোমায় তুলতে গিয়ে নামিয়ে দিয়েছি।

ততক্ষণে মানব এসে গেছে।

মহেশ তখন বলে, একটা গুরুতর কথা বলতে তোমায় ডেকেছি কালাচাঁদ ! তোমার লেখাটা অন্য কাগজে ছাপা হলে এমনিতে ধনদাসের চোখেও পড়বে না—ব্যাটা প্রেস করেছে, কাগজ বার করে, কিন্তু সাহিত্যের দিকে তাকায় না।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে একটু হেসে কালাচাঁদ বলে, তাকালে কি ব্যাটা নিজের সর্বনাশ টেনে আনত ? আপনাকে বরখাস্ত করত ?

মহেশ বলে, আমার কাগজ বলে ধনদাস নিজেই কিন্তু কাগজটা পড়বে কিংবা অন্যেবা এ লেখাটা দেখাবে ধনদাসকে। লেখাটা পড়ে ধনদাস যদি তোমায় তাড়িয়ে দেয় ?

কালাচাঁদ ফুঁসে ওঠে, ইস্ ! তাড়িয়ে দেবে ! একটা লেখা ছাপার জন্য তাড়িয়ে দেবে ! প্রেস বন্ধ হয়ে যাবে না সঙ্গে সঙ্গে ?

মানব বলে, লেখাটা আপনাকে দেওয়ার আগে একটা বৈঠক করিয়েছিল প্রেসের লোকেদের নিয়ে। আমিও হাজির ছিলাম। কালাচাঁদ লেখাটা পড়ল—তারপর আমি সকলকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ লেখা ছাপালে যদি কালাচাঁদের কাজ যায় তবে কী উপায় হবে ?

মহেশ হেসে বলে, আটঘাট বেঁধেই তবে সব করেছ।

মানব বলে, আটঘাট না বেঁধে কি কাজ হয় ? সব কাজে আটঘাট বাঁধতে হয়। এই যে প্রেস করলেন, কাগজ বার করবেন—এ সব কি আটঘাট না বেঁধে হচ্ছে ?

জহর প্রশ্ন করে, বৈঠকে কী ঠিক হল বলুন না ?

মানবকে মুখ খুলতে হয় না ! কালাচাঁদ বলে, সবাই বলল, এ লেখা ছাপালে যদি আমায় তাড়ায়, সবাই কাজে গিয়ে জায়গায় বসে শুরু থেকে শেষতক হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। এক লাইন হবফ সাজাবে না।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটে।

মহেশ বলে, তোমার লেখার নামে আমাদের পত্রিকার নাম দিলে তোমার কোনো আপত্তি নেই তো ?

জহর বলে, নামটা আমাদের সকলের পছন্দ হয়েছে।

মানব তামাশা করে খেদের সুরে বলে, ইস্ ! আমার যদি একবার খেয়াল হত ! এই নাম দিয়ে কাগজ বার করে আমিই লাখ টাকা কামিয়ে নিতে পারতাম !

কালাচাঁদ বলে, মানুবাবু, ফাঁকতালে যারা লাখ টাকা কামাতে চায়, তাদের হাতের লেখা দেখেও হরফ সাজিয়েছি অনেক বছর। প্রত্যেকটি অক্ষর গাঁথি, কমা-সেমিকোলনের হিসেব রাখি—কে কেন লেখে টের পেতে কি বাকি থাকে মানুবাবু ?

মহেশ গম্ভীর হয়ে বলে, ধনদাস কিন্তু তোমাকে তাড়াবেই। প্রেসে সবাই তোমার জন্য হাত গুটিয়ে থাকলে একটা আপস করবে--তোমাকে আবার কাজে ফিরিয়ে নেবে। কিছুদিনের মধ্যে তোমায় চোর কিংবা খুনি বানিয়ে শেষ করে দেবে।

দেবে ? দিলেই হল ? সবাই চুপচাপ মেনে নেবে বজ্জাতিটা ? কী যে ভাবেন, কী রকম যে হিসাব করেন আপনারা—

গোড়াতেই কালাচাঁদের হরফ গল্প বুকে নিয়ে নতুন বাংলা বছরেব বৈশাখের মাঝামাঝি হরফ পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

নতুন প্রেস, নতুন কাগজ, নতুন ব্যবস্থা বলে কাগজ বার করতে পয়লা দোসবার বদলে মাসের মাঝামাঝি হয়ে যায়নি, মহেশের নীতি অনুসারেই এই সময় কাগজটা বার করা হয়েছে।

লোক মাইনে পায় ইংরাজি মাসের গোড়াতে--বাংলা মাসের কোনো হিসাব ধরাই হয় না।

মাসকাবারি মাইনে পেয়ে যারা কাগজ কিনবে তাদের হিসাব না কষে বাংলাদেশে কাগজ বার করারও নাকি কোনো মানে হয় না !

মানব প্রতিবাদের সুরে বলেছিল, কেন ? বাংলা পনেরো-ষোলো তারিখে ইংরেজি পয়লা হয়। এমন কাগজ বার করবেন যা পনেরো-ষোলো দিনেই বাসি হয়ে যাবে, লোকে কিনবে না ?

এ দেশে তাই হয। মাসিকপত্র হল ভাজা মাছের মতো। যত ভালো করেই ভাজ, জুড়িয়ে গেলে কেউ কিনবে না।

কথাটা মানলাম না কিন্তু প্রতিবাদ ফিরিয়ে নিলাম। যে বিষয়ে জানি না, যে বিষয়ে ভাবিনি, সে বিষয়ে কথা বলা বোকামি।

কোনো খবরই অজানা ছিল না ধনদাসের। হরফ যে বেরোচ্ছে, সে খবর সে ভালোভাবেই জানত।

নিজের কাগজ পড়া শুরু করতে তাব হপ্তা খানেক সময় লাগে, হরফ বাজারে বার হওয়ামাত্র একখানা কাগজ আনিয়ে অন্য সব কাজ ফেলে পাতা ওলটাতে শুরু করে।

কভারটা পরীক্ষা করতে তার বিশেষ কৌতূহল জাগে না—কভারে এক লাইন বিজ্ঞাপন নেই।

কভাবের পর বিজ্ঞাপনের তিনটি পাতা সযত্নে উলটিয়ে দেখে সে প্রথম পাতায় ঠেকে যায়।

প্রথম পাতায় ভণিতা নেই, মুখপত্র নেই, নিবেদন নেই, হরফ-এর জন্মের কোনো কৈফিয়ত নেই—শুধু আছে কালাচাঁদ নামে একজনের লেখা হবফ নামে একটা গল্প । নতুন মাসিক বার করার এ কোন নতুন কায়দা ?

গল্পটাতেই অনেকক্ষণ আটকে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ গল্পটা ঘেঁটে পাতা উলটে মাসিকপত্রে গল্পের পর সম্পাদকীয় ছাপার নতুনত্ব চাক্ষুষ করে তার মনে প্রশ্ন জাগে যে, গল্পটা কি কাগজের নাম নিয়ে বিশেষভাবে লেখা ?

গল্পটা পড়তে শুরু করে আর থামতে পাবে না, পড়া শেষ করে বুকটা ধড়াস করে ওঠে ধনদাসের !

মহেশের সম্পাদকীয়ের আগে তাকে খোঁচা দিয়ে লেখা কালাচাঁদ এই ছদ্মনামের লেখকের গল্প ছাপিয়ে নতুন কাগজ বার করেছে মহেশেরা, তার কাগজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ? বরখাস্ত হবার রাগে মহেশ তার সঙ্গে শত্রুতা চালিয়ে যাওয়া, কাগজের একটা নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছে !

দুপুর পর্যন্ত ধনদাস গুম হয়ে ভাবে। তারপর উমাকান্তকে ঘরে না ডাকিয়ে নিজেই তার কাছে গিয়ে একটা চেয়ারে মুখোমুখি বসে বলে, কাগজ চালানো বড়ো দায় উমাবাবু !

দায় বইকী ! দশজন যারা যেমন ভাবছে তাদের মনের মতো করে না চালালে কাগজ চালানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

উমাকান্তের কাছে এ রকম জবাবই ধনদাস আশা করেছিল। নিজের বিচলিত ভাব যথাসাধ্য গোপন রেখে সে জিজ্ঞাসা করে, হরফ দেখেছেন নাকি ?

দেখেছি বইকী !

আগাগোড়া উলটিয়ে-পালটিয়ে দুমড়িয়ে-মুচড়িয়ে পড়া মাসিকটা উমাকান্ত তার সামনে এগিয়ে দেয়।

পাল্লা দিতে পারবেন ?

কেন পারব না ? পাল্লা দেওয়া কঠিন কিছুই নয়, আমাকে পাল্লা দেবার সুযোগ দিলেই পাল্লা দিতে পারব !

ধনদাস প্রথম লেখাটা বার করে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে, এ লেখাটা কার জানেন—ভদ্দরলোককে চেনেন ? কাগজের নামে লেখা গল্প—একেবারে প্রথমে ছেপে দেওয়া হয়েছে !

উমাকান্ত বলে, কাগজের নামে লেখা গল্প নয়—গল্পের নামেই কাগজের নাম হয়েছে। লেখক খুব গরিব, এই লাইনেই আছেন।

বলতে বলতে উমাকান্ত ধনদাসের মুখের ভাব লক্ষ করে। ধনদাসের অবশ্য একবার মনেও পড়বে না তার ছাপাখানাতেই একজন কালাচাঁদ কাজ করে, বলে দিলেও হয়তো বিশ্বাস করবে না যে তার প্রেসের কম্পোজিটার ওই কালাচাঁদই গল্পটির লেখক !

ধনদাস জিজ্ঞাসা করে, কোথায় থাকেন ? আসল নামটা কী ? কোন কাগজে কাজ করেন ?

উমাকান্ত সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে যায়,—তার মনে পড়ে যায় যে হরফ গল্পে ধনদাসেব চরিত্রের একটা দিক আছে এবং তাকে মর্মান্তিক ব্যঙ্গের আঘাত করা হয়েছে।

সে বলে, অত কে খবর রাখে বলুন ? কোনো সাহিত্য সভা-টভায় আলাপ হয়েছিল—ওই পর্যন্তই পরিচয়। নতুন লেখক—কোথায় থাকে কী করে জিজ্ঞাসাও করিনি।

ধনদাস বলে, অ !

১২

অপর্ণার উপদেশ ও ব্যাখ্যা নিদারুণ আতঙ্ক জাগালেও চন্দ্রা ভেবেছিল যে, এখনও যখন সর্বনাশ হয়নি এবং জহর নিজে থেকেই তাকে নিতে এসেছে এবার নিশ্চয় সামলে নেওয়া যাবে।

ব্যাপার যখন বুঝে গিয়েছে ভুল তো আর সে করবে না, সুতরাং ভয়েরও আর কারণ নেই।

কিন্তু দেখা যায় দুপক্ষ দীর্ঘদিন ধরে বিষম একটা ভুল করে এলে তার জের অত সহজে মিটে যায় না, হঠাৎ সমস্ত বোঝাপড়া হয়ে গিয়ে সব গোলমাল চুকে যায় না।

বিশেষত ভুল বোঝার ধাক্কায় একজন যখন রাত্রে ঘুমের জন্য মদ খাবার অবস্থায় গিয়ে পৌঁছোয়।

সে আসবার পর থেকে জহর অবশ্য অনেক সংযত হয়েই ও জিনিসটা খেতে আরম্ভ করে কিন্তু পদার্থটা খানিক পেটে যাবার পর কী রকম অদ্ভুতভাবেই যে বদলে যায় মানুষটা !

কোনোদিন তার জন্য দরদ জাগে অস্বাভাবিক, কোনোদিন হৃদয়হীনতার অন্ত থাকে না।

কোনোদিন অতিরিক্ত দরদ বা নিষ্ঠুরতার, একটা নিয়ে আরম্ভ হয়ে অন্যটায় গিয়ে পৌঁছোয়।

চন্দ্রা মিনতি করে বলে, কেন গিলছ, বাদ দাও না ? ওটা বাদ দিলে যখনই ডাকবে, দেখবে আরও কত খুশিতে গদগদ হয়ে বুকে যাব।

যখন তখন বুকে ডেকেছি তোমায় কখনও ?

ডাকোনি বলেই তো ঝঞ্ঝাট হল। ডাকতে চাও—ভদ্রতার খাতিরে ডাকবে না। পুরুষ মানুষ—জোর করে ডেকে দেখতে হয় না ? ভাগ্যে বিগড়ে যাওনি তুমি !

জহর ভাবে, ন্যাকামি ! বাপের চাকরি গেছে। তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাপ উঠবার চেষ্টা করছে—তাই এই ন্যাকামি ?

জহর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তার চাউনি দেখে এমন অস্বস্তিবোধ হয় চন্দ্রার !

তারপর জহর বলে, কাগজ আর প্রেসটা যদি না চলে তুমিও মরবে আমিও মরব।

জানি না ? একশোবার জানি। কিন্তু হঠাৎ প্রেস আর কাগজের কথা তুললে কেন ?

জহর চুপ করে থাকে। চন্দ্রা যেন একটু রেগে যায়।

ভয় পাচ্ছ কেন ? আমি তো তোমার পক্ষেই আছি ! এসো না দুজনে মিলেমিশে চেষ্টা করে নেশাটা কাটান দিই ? আমায় যা বলবে আমি তাই করব।

ধীরে ধীরে জহর একটা সিগারেট ধরায়।

সম্পাদক বাবার চাকরি গেল। বড়োই মুশকিল হল খাওয়াপরার। বাড়ি বাঁধা রেখে ধার করে প্রেস আর কাগজের ব্যবস্থা করতেই ভালোবাসা যেন উথলে উঠল তোমার বুকে !

চন্দ্রা কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে - বিচারবিবেচনা করে স্থির করে নেয় রাগ করবে কি না।

উথলে উঠবে না ? এতকাল তো ছিলে ভীরু কাপুরুষ, আমার একটা বিশ্রী ভুল ধারণার তোষামোদ করতে। তুমি কী ভাবছিলে আমি আগেই টের পেয়েছি। ভাগ্যে মুখ ফুটে বললে, নইলে কথাটা খোলসা করতে সাহস পেতাম না।

কত বড়ো অপমানের কথা বলেছে জহর, তবু চন্দ্রার মুখে হাসি ফোটে।

বাপের বিপদে স্বামী উপকার করলে মেয়ে খুশি হবে না স্বামীর ওপর ? ওতে কোনো দোষ আছে নাকি ! ওটাই তো সংসারের সাধারণ নিয়ম। তবে সত্যি সত্যি ভালোবাসাটা কিন্তু সে জন্য উথলে ওঠেনি। ভালোবাসা আগেই ছিল, ভুল করে বোকার মতো চেপে রেখেছিলাম। অপর্ণাদি আমার ভুল ভেঙে দিয়েছে। অপর্ণাদিও আমার মতো ভুল করে ডুবতে বসেছিল।

জহর চেয়ে থাকে।

চন্দ্রা বলে, চায়ের দোকানে বসে মানুদার কাছে কী কাঁদুনি গেয়েছিলে মনে নেই বুঝি ? অপর্ণাদির পরামর্শে মানুদা তোমার সঙ্গে কথা বলেছিল। আমায় কেন নাও না, রাত্রে এলে কেন থাক না, আমি কি তার মানে জানতাম ? আমায় জিজ্ঞেস করে অপর্ণাদিও বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা। তোমার সঙ্গে কথা কয়ে মানুদা যখন এসে সব বলল—তখন অপর্ণাদি ব্যাপার বুঝল, আমাকেও বুঝিয়ে দিল।

বটে !

তবে কী ? দোষ তোমার ছিল না--সব দোষ আমার। আমি ভাবতাম, যদ্দুর পারা যায় দেহটা ছাঁটাই করে মনের প্রেমকে বড়ো করলে তোমার কাছে আমার দাম বাড়বে। নইলে আমি ছোটো হয়ে যাব তোমার চোখে।

একটু আগে হেসেছিল, এবার চোখে জল এসে যায়।

নিজে ভেতরে ছটফট করছি, ভাবছি যে চুলোয় যাক মানসিক ছাঁকা ভালোবাসা—তবু কীভাবে তোমায় ঠেকিয়েছি, মার্জিত রুচির ঢং আর ভান করে তোমার ভালোবাসার গলা টিপে ধরেছি !

চন্দ্রা এবার কেঁদে ফেলে। অবাধ কান্না !

এ সব মিথ্যে কথা নয়। প্রমাণ তো দিয়েছি আগেই। বিপদের সময় বাবার পাশে দাঁড়িয়েছ বলে ? ছাই বুঝেছ তুমি ! কেন, সেদিন যে গেলে, রাত্রে না থাকলে সুইসাইড করব বলে তোমায় যে আমি জোর করে রাখলাম—তখন কি বাবার চাকরি গিয়েছিল ? সেদিন প্রমাণ দিইনি ?

কিন্তু জহর কি আর তখন এ সব মানবার মুডে আছে ! সে একটু নরমও হয় না, নীরস গলায় বলে, ভালোবাসার আবাব প্রমাণ দিতে হয় নাকি ? কথাটা বলেই প্রমাণ দিলে, তোমার শুধু হিসাব কষা ভালোবাসা। যাকগে, কেঁদো না, এভাবে কাঁদলে মনে হবে তোমার বুঝি হিস্টিরিয়া হয়েছে !

জহর সেদিন বেশি মদ খায়। চন্দ্রার অনুরোধ-উপরোধ অগ্রাহ্য করে কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়ে।

চন্দ্রা মিনতি করে বলে, কিছু একটু খাও। খালি পেটে ওগুলি গিলে কিছু না খেয়ে ঘুমোলে পরদিন কী রকম শরীর খারাপ হয় মনে নেই ?

জহর তাকে এক ধমকে থামিযে দেয়।

মাঝরাত্রে চন্দ্রার ঘুম কিন্তু ভাঙে জহরের নিবিড় আলিঙ্গনে ও পাগলের মতো আদর করার চোটে।

গভীর অনুতাপের সুরে জহর বলে, তোমায় আজ অনেক যা-তা কথা বলেছি, না ? লক্ষ্মীটি, ও সব কথা ধরো না, রাগ কোরো না। মাথাটা কী রকম গবম হয়ে বিগড়ে গিয়েছিল।

অত মদ খেলে বিগড়ে যাবে না মাথা ?

কাল থেকে আর খাব না।

একটু কিছু খেয়ে নেবে ? সেই দুপুরে অল্প চাট্টি ভাত খেয়েছিলে, তারপব কিছুই পেটে পড়েনি—ওই জিনিসটা ছাড়া।

এতরাতে খাব ?

সামান্য কিছু খাও।

চন্দ্রা গরম করে খাবার এনে দেয। খেয়ে উঠে জহবের ঘুম আসে না, শুযে শুযে সে চন্দ্রার সঙ্গে জল্পনা-কল্পনা চালিয়ে যায়—কী করে মদ খাওয়াব অভ্যাসটা একেবারে ত্যাগ কবা সম্ভব।

জল্পনা-কল্পনা থেকেই বুঝতে পারা যায়, পরদিন থেকে জহব যে আব মদ খাবে না বলেছিল এ কথাটা সে রাখতে পারবে না।

জামাইয়ের সর্বস্ব, তাব নিজেব সর্বস্ব, অনেকেব সহানুভূতি, সদিচ্ছা এবং সহযোগিতা মূলধন।

জহর চাকরি করছে, তার দবকাব নেই। কিন্তু মহেশেব মাসে মাসে যেমন হোক একটা বেতন চাই।

নূতন প্রেস, কাগজটাও নতুন।

এত টাকা ঢেলে প্রেসটা চালু কবে অনেক চেষ্টাতেও চলতি খরচেব টাকাটা মাসে মাসে তোলা যায় না। প্রায় বিজ্ঞাপনহীন কাগজটায় মাসে মাসে লোকসান দিতে হয !

এটা জানাই ছিল। হিসাব করাই ছিল। নানাপার্টির সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলে কাজ বাড়াতে হবে, বিজ্ঞাপন আনাতে হবে—তাবপর হয়তো দেখা যাবে লাভের মুখ। বেশ কিছুদিন লোকসান দিয়ে চালাতেই হবে ছাপাখানা এবং মাসিকটা।

হিসাব করা থাকলেও চিন্তা-ভাবনার অন্ত থাকে না।

মহেশ ও জহর দুজনেই মানবের কাছে এক বিষযে কৃতজ্ঞতাবোধ করে। সে জোর করে বলেছিল বলেই এবং অনেকটা তারই খাতিরে, কালাচাঁদের বাধ্যতামূলক বেকারত্বের এক মাস সময়, প্রেসটা গড়ে তোলার খুঁটিনাটি ব্যাপার দেখার বিশেষ কাজটা তাকে দেওয়া হয়েছিল।

কত অপব্যয় যে কালাচাঁদ বাঁচিয়ে দিয়েছে।

কোনো একটা মোটা খরচ বাঁচানো নয়—অনেক রকম অনেকগুলি টুকরো খরচ। এতকাল একটা প্রেসের কাজ চালিয়ে এসেছে কিন্তু মহেশও হয়তো খেয়াল করত না অনেক টুকিটাকি অপব্যয়ের মোট কযলে কেমন একটা মোটা অঙ্ক দাঁড়িয়ে যায়।

মহেশ বলেছিল, লেগেই যাক না কালাচাঁদ ?

মানব বলেছিল, না। নীতিটা ঠিক রাখতে হবে। এখানে নেওয়া হয়েছে শুধু বেকারদের—যদ্দিন প্রেস আর কাগজটা না দাঁড়িয়ে যায় ওরা কম পয়সায় বেশি খাটবে। এক মাস বেকার ছিল, খেটে গেল—ওকে এ লড়ায়ে টেনে লাভ কী ? বউটা মারা গেল, বড়ো একটা মেয়ে আছে—মেয়েটার বিয়ে এবার দিতেই হবে। যেখানে খেটেছে সেখানেই খেটে যাক যতদিন পারে।

মহেশ ও জহর দুজনেই মানবকে হরফ কাগজের সহকারী সম্পাদকের চাকরি নিতে বলেছিল।

বেতন কম কিন্তু প্রেস আর কাগজের ভবিষ্যতের সঙ্গে গাঁথা হয়ে থাকবে তার চাকরি আর বেতন বাড়া।

প্রেস আর কাগজটার আয় যেমন বাড়বে তারই এক নির্দিষ্ট অনুপাতে তার বেতন বাড়বে। মুখের কথায় নয়, লিখিত চুক্তিপত্রে তাকে চাকরিতে বহাল করা হবে। হরফ বেঁচে থাকলে তার চাকরিও বজায় থাকবে। কোনো বিশেষ অপরাধ করলে প্রকাশ্য আদালতে বিচার হবার পর আদালতের নির্দেশ নিয়ে তবেই তাকে বরখাস্ত করা চলবে।

মানব কিন্তু চাকরি নিতে রাজি হয়নি। বলেছিল, বাঁধা টাইমে বাঁধা নিয়মে খাটতে পারব না। ধাতে সইবে না। তার চেয়ে এককাজ করুন—আমায় ছুটকো মজুর হিসেবে রাখুন। আমার নিজের লেখা যা ছাপা হবে কলম হিসেবে মজুরি দেবেন—প্রুফ যা দেখে দেব ফর্মা হিসেবে মজুরি দেবেন।

জহর রাজি হয়েছিল কিন্তু মহেশ আপত্তি করে বলেছিল, গাদা গাদা লেখা আসবে, সেগুলো যে পড়তে হবে তোমায় ! কয়েকটা লেখা ঘষে মেজে ঠিক করেও দিতে হবে। এর মজুরি কষা হবে কী হিসেবে ?

মানব হেসে বলেছিল, হিসেব খুব সোজা। বিনা পয়সায় হরফে কারও লেখা তো যাবে না—কবিতাও যেমন হোক কিছু দাম পাবে। ঘষামাজা করে যার লেখা ছাপতে হবে তার সঙ্গে আমার থাকবে একটা বখরা। কতটা ঘষামাজা দরকার হিসেব করে বখরা ঠিক হবে—লেখক রাজি না হলে সে লেখা যাবে না।

বাঁধা বেতনে বাঁধা টাইমের চাকরি নেয়নি—কিন্তু এই নিয়মে ক্রমে ক্রমে বাঁধা বেতনের সহ-সম্পাদকের চেয়ে ঢের বেশি খাটছে মানব।

লেখা পড়তে হয় অজস্র। কয়েকটা লেখা বেছে সংশোধন করে দিতে হয়। নামকরা লেখকের যে লেখা ছাপা হবেই, সে লেখারও অনেক বানান ভুল ব্যাকরণ ভুল, তাকে শুদ্ধ করে নিতে হয়।

নিজেকে নানারকম লেখা লিখেও দিতে হয় নানাবিষয়ে।

চুক্তিমাফিক চাকরি নিলে মানবকে সাড়ে দশটায় হরফের আপিসে পৌঁছে পাঁচটায় বেরিয়ে যাওয়া চলত।

যেমন খাটুনি তেমন মজুরির নিয়মে নিজেকে বহাল করে তাকে সকালে চা-খাবার খেয়ে যেতে হচ্ছে হরফের আপিসে—বস্তির ঘরে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাচ্ছে !

মহেশ বলে, সত্যি তুমি চালাক ছেলে। যে চাকরি নিলে ষাট-সত্তর টাকা মাইনে পেতে, সে চাকরি না নিয়ে মাসে ঢের বেশি কামাচ্ছ।

মানব হেসে বলে, আপনারও এ বিভ্রম হল ? লাভ করছি ভাবলেন ? চাকরি নিলে ক-ঘণ্টা কীভাবে খাটতাম আর এখন কীভাবে খাটছি হিসেব কষলেন না ? খাটুনির তুলনায় কিছুই তো পাচ্ছি না !

একলা মানুষ, টাকা দিয়ে কী করবে মানব ?

একলা মানুষ কী দোকলা মানুষ সে ভাবনা আপনার কেন ? টাকা নিয়ে ফুর্তি করব, টাকা উড়িয়ে দেব ! খেটেই তো রোজগার করছি টাকা ! দয়ার দান তো নিচ্ছি না !

মহেশ একটু হেসে বলে, আমি লক্ষ করেছি কয়েকটা বিষয়ে সাধারণভাবে—এমনকী তামাশা করে তোমায় কিছু বললেও তোমার মেজাজ গরম হয়ে ওঠে।

মানব লজ্জা পেয়ে বলে, না না, মেজাজ গরম হয়নি, তবে আপনিও যখন বলেন লেখকের টাকার কী দরকার—প্রাণে তখন লাগে।

সাত টাকা ভাড়ার একখানা ঘরে থাকে। নিজের মনে লেখে। কারও তোয়াক্কা রাখে না। তবু কেন তাকে বাঁধা পড়ে যেতে হল হরফের স্বার্থে ? সব দায় যেন তার ! সম্পাদক মহেশের নির্বাচিত লেখা বাতিল করার দায় পর্যন্ত তার ঘাড়ে চেপেছে !

তার অগোচরেই কম্পোজ হয়ে গিয়েছিল লেখাটা। প্রুফ দেখে সে ছাপাবার অর্ডার দেবে।

লেখাটা পড়ে মহেশেব টেবিলের সামনে সাজানো একটা চেয়ারে বসে সে বলে, ভীমরতি ধরে থাকলে হাসপাতালে যেতে পারতেন, হরফের কেন সর্বনাশ করছেন ?

মহেশ রাগ করে না, হেসেই বলে, আমায় হাসপাতালে পাঠিয়ে তুমি বুঝি হরফের সম্পাদক হতে চাও ?

আজ্ঞে না। সম্পাদক হবাব মোটেই শখ নেই। কিন্তু এ লেখাটা কি ছাপা চলে ? এ লেখাটা ছাপালে বলতেই হবে হরফের লেখা বাছাই করার কোনো নিয়ম-নীতি নেই, বিচাববিবেচনা নেই, হরফ একটা বাজে কাগজ।

বটে ! দেখি তো কোন লেখাটা ?

ছাপা লেখাটায় চোখ বুলিয়ে মহেশ প্রুফের কাগজ ক-টা কয়েক ফালা করে ছিঁড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দেয়। বলে, সত্যিই বলেছ, হরফে এ লেখা ছাপা যায় না।

জহর রেগে যাবে না ?

রেগে গেলে উপায় কী ? কাগজের মালিক আর আমার জামাই বলে কি এ লেখা ছাপা যায় ? জহরের লেখা আবার কী দেখব ভেবে আমিই অবশ্য না পড়ে লেখাটা ছাপতে দিয়েছিলাম—জহর এমন বাজে লিখবে ভাবতেও পারিনি। এখন বুঝতে পাবছি মদের ঝোঁকে লিখেছিল, নিজে আরেকবার না পড়েই দিয়ে গেছে।

জহর এলে হাতে-লেখা কপিটা তাকে ফেরত দিয়ে মহেশ বলে, লেখা শেষ করে আরেকবাব পড়ে দেখেছিলে ? পড়ে দেখো !

মনে মনে জহর রাগে কি না টের পাওয়া যায় না, মানব তবু ব্যাপারটা হালকা করে দেবার জন্য হেসে বলে, আপনার নিজের কাগজ—এখান থেকে লেখা ফেরত গেলে আপনার কিন্তু কোনো অপমান হয় না। বেশি রকম কড়া হয়েছে বলে আমার একটা লেখাও মহেশবাবু ফেরত দিয়েছেন।

শুধু লেখা ছাপিয়ে নয় লেখাটার নামে কাগজের নামকরণ করে কালাচাঁদকে এমনি উছলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রথম সংখ্যা কাগজ বার হবার পর সে আরেকটা গল্প এনে দেয়।

দ্বিতীয় সংখ্যায় উমাকান্তেরও একটা লেখা বার হবে।

হরফে সব লেখার উপরে স্পষ্টভাবে লেখার পরিচয় ছাপিয়ে দেওয়া হয় যে সেটা গল্প অথবা প্রবন্ধ অথবা কবিতা—কালাচাঁদের লেখাটার কোনো পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে না !

এটা কোন লেখার পর্যায়ে পড়ে ভেবে-চিন্তে পরামর্শ করে ঠিক করতে পারেনি মহেশ, মানব আর জহর।

খানিকটা যেন গল্প, খানিকটা আত্মজীবনী খানিকটা ব্যঙ্গরচনা, খানিকটা প্রবন্ধ, খানিকটা আগুনের শিখার মতো লেলিহান ঘৃণা ও জ্বালার উচ্ছ্বাস !

বেশ বড়ো লেখা—কারুকার্যহীন, সাদামাটা খানিকটা সেকেলে ধাঁচের গদ্যে কোনো রকম কায়দা খাটাবার চেষ্টা না করে সোজাসুজি গল্পটা বলে যাওয়া—পড়ে কিন্তু প্রাণটা বিশেষভাবে নাড়া খায়।

এ গল্পেও সে ধনদাসকে একচোট নিয়েছে।

লেখাটার আরম্ভ হল

> একজন নামকরা লেখক ছিলেন, তাহার নাম ছিল দুর্গানাথ। কেবল লেখার কাজ করিতেন বলিয়া দুর্গানাথের দারিদ্র্যের সীমা ছিল না।
>
> সুন্দরী পত্নীকে তিনি বড়োই ভালোবাসিতেন—বাসিলেন না ? অমন রূপবতী গুণবতী স্ত্রীকে ভালো না বাসিয়া কোনো স্বামী পারেন ! গরিব বলিয়া কোনো সাধ পূর্ণ করিতে না পারিলেও মাঝে মাঝে একটু ঝগড়াঝাঁটি করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইতেন এবং কর্মক্লান্ত স্বামীর শরীর ও মনকে তাজা রাখিতে হাসিমুখে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন।
>
> স্বামীর সেবা করার সঙ্গে তিনটি সন্তানকে জীবনপাত করিয়া লালনপালন করিতেন
>
> লেখক দুর্গানাথ স্ত্রীকে আদর করিয়া খেলনা বলিয়া ডাকিতেন—বলিতেন, তুমি সত্যি দামি খেলনা। এমন গুরুতর কাজ করি, এমন সব ভাবনায় মেতে থাকি, তুমি একটু খেলা দিয়ে না সামলালে অনেক আগেই শেষ হয়ে যেতাম।
>
> খেলনা হাসিত, বলিত, নিজের স্বার্থ না দেখলে চলে ? তুমিই আমার স্বার্থ—কাজেই তোমাকে দেখতে হয়।
>
> দুর্গানাথ হাসিয়া উঠিয়া বলিতেন, ও, তুমি তবে নিজের স্বার্থে সব কর, তুমি এমন স্বার্থপর !
>
> ঘরের কাজ করিতে করিতে মুখ তুলিয়া হাসিমুখে খেলনা বলিতেন, স্বার্থ না দেখে কী করে পরার্থ দেখব ? তুমিই আমার একমাত্র পরার্থ—তোমায় দেখা স্বার্থ দেখায় তফাত কীসের ?

এমনিভাবে শুদ্ধ ও চলতি ভাষা খানিকটা জড়িয়ে দুর্গানাথ ও খেলনার ঘরোয়া জীবনের একটি সরস মধুর চিত্র দিয়ে কালাচাঁদ আমদানি করেছে ধনেশকে

> কিছুদিন একসাথে পড়িয়াছিলেন বলিয়া ধনেশ নামে একজনের সঙ্গে দুর্গানাথের ভাব ছিল। ধনেশ একটি ছাপাখানার অংশীদার ও ম্যানেজার ছিলেন।
>
> পুরাতন বন্ধু যে কীরূপ অর্থপিশাচ হইয়া উঠিয়াছিল এবং ছাপাখানায় লোকেদের সহিত কীরূপ দুর্ব্যবহার করিতেন দুর্গানাথ তাহা জানিতেন না। ধনেশের অনুরোধে প্রকাশককে বলিয়া দুর্গানাথ তাহার বইগুলি ওই ছাপাখানায় ছাপিতে দিতেন এবং প্রুফ দেখিবার জন্য প্রায়ই প্রেসে গিয়া বন্ধুর সহিত গল্প করিতেন। তিনি উপস্থিত থাকিলে ধনেশ ভিজা বিড়ালটির মতো ভালো মানুষ সাজিয়া থাকিত।

ধনদাসের চেহারা এবং তার প্রকৃতির কিছু বর্ণনা আছে।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, কিন্তু ধনদাসের সরু গলা থেকে কটা চোখ পর্যন্ত চেহারার এবং লুকিয়ে কর্মীদের কথাবার্তা শোনা, বাইরের লোকের সামনে দু-একটা সিগারেট ও অন্য সময় বিড়ি টানা পর্যন্ত চালচলনের এমন কয়েকটা বৈশিষ্ট্য কালাচাঁদ বেছে নিয়েছে যে ধনদাসকে যারা জানে বর্ণনাটা পড়তে পড়তে তাদের মানসচোখে ধনদাসই রূপগ্রহণ করবে।

তারপর কালাচাঁদ দরিদ্র কিন্তু সুখী দুর্গানাথের জীবনে বিপদ এনেছে—খেলনার কঠিন অসুখ। তার চিকিৎসার জন্য প্রকাশকদের কাছে ধন্না দিয়ে কিছু পাওনা টাকা এবং নতুন একটা বইয়ের জন্য কিছু আগাম টাকা জোগাড় করে বাড়ি ফেরার পথে দুর্গানাথ ধনেশের প্রেসে যায়। বাড়ি ফেরার জন্য প্রাণ আকুল, কিন্তু দায় না সারলেও উপায় নেই। প্রুফ দেখে ছেড়ে দিলে বইটা তাড়াতাড়ি বাজারে বেরোবে এবং তারও টাকা পাওনা হবে।

একটা সুযোগ সৃষ্টি করিয়ে ধনেশকে দিয়ে দুর্গানাথের ওই টাকাটা কালাচাঁদ চুরি করিয়েছে।

চমৎকার জমেছে গল্পের ক্লাইম্যাক্সটা। ধনদাসের উপর ঘৃণায় সর্বাঙ্গ যেন বিষি করতে থাকে। সুযোগ পেয়ে লোভ সামলাতে না পেরে বন্ধুর মৃতপ্রায় রুগ্না স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য এত কষ্টে সংগ্রহ

করা টাকাটা চুরি করে ধনেশের মধ্যে লোভ ও পাপ করার ভয়ের স্থূল বিরোধ বর্ণনা করে, টাকা খোয়া গেছে জেনে হতভম্ব দুর্গানাথের মুখে খেলনাকে তবে মরতে হবেই উক্তি শুনে—টাকা ঠিক আছে, তোমার সঙ্গে একটু তামাশা করছিলাম বলে অনায়াসে নোটগুলি ফিরিয়ে দেওয়া যায় খেয়াল করে, ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছা জাগলেও পাপীর মনের ভয় আর লোভ, কীভাবে ইচ্ছাটা কার্যে পরিণত করতে ছিল না, তার সহজ সরল বর্ণনা দিয়ে কালাচাঁদ লিখেছে—

> বুকটা ধড়ফড় করিতে থাকে, প্রাণটা আঁকুপাঁকু করিতে থাকে, বন্ধুর গ্রাসকরা টাকাটা উগরাইয়া দিবার জন্য ধনেশের অন্তরে ছটফটানি জাগে। কিন্তু গ্রাসকরা টাকাপয়সা উগরাইয়া দেওয়া তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ। নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে সে কেমন করিয়া যাইবে। চোর ডাকাত খুনিদের কি আর সাধুপুরুষ মহাপুরুষ হইবার সাধ জাগে না? কিন্তু অন্যরূপ সাধ জাগিলে কী হইবে, স্বভাব তাহাদের চুরি করায়, ডাকাতি করায়, খুন করায়।
>
> পরিহাস করিয়াছে বলিয়া চুরিকরা টাকাটা ফেরত দিতে পারে জানিয়াও এবং ফেরত দিতে চাহিয়াও মহেশ বলে, ভাই, তোমরা লেখকরা বড়োই কাছাখোলা লোক। কলকাতার পথেঘাটে হরদম পকেট থেকে টাকা মারা যাচ্ছে জানো না?
>
> বিহ্বল দুর্গানাথ বলে, বাস থেকে নেমে একবার হাত দিয়ে দেখেছিলাম ব্যাগটা ঠিক আছে।
>
> ধনেশের বুকটা কাঁপিয়া ওঠে। দুর্গানাথের সামান্য টাকাটা চুরি করিয়া কী বোকামিই করিয়াছে। এই কথাটাই হয়তো দুর্গানাথের মনে তোলপাড় করিবে যে বাস হইতে নামিয়া পকেটে হাত দিয়া দেখিয়াছিল পকেটে টাকা ঠিক আছে—তার প্রেসে ঢুকিবার পর শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে নোটগুলি।
>
> হয়তো আর তার প্রেসে আসিবে না দুর্গানাথ। হয়তো আর সে তাকে কোনো কাজ দিবে না।
>
> হয়তো সকলের কাছে তাহার নিন্দা করিয়া বেড়াইবে।
>
> এরূপ চিন্তা দুর্গানাথের মনের কোণেও উঁকি মারে নাই। কিন্তু পাপীর মন সর্বদাই ভীত হইয়া থাকে যে, তাহার পাপকর্ম জানিবার বুঝিবার জন্য জগৎ সংসারে সকলেই ওত পাতিয়া আছে।
>
> ধনেশ হাসিয়া বলে, লেখক মানুষ, তোমাদের ব্যাপার আলাদা। বাসে উঠবার আগে না বাস থেকে নেমে পকেটে টাকা ঠিক আছে জেনেছিলে ভাই?
>
> দুর্গানাথ মাথায় ঝাঁকি দিয়া বলে, কী জানি আমার মাথা ঘুরছে।
>
> একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধনেশ বলে, আমারও এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে তোমাকে সাহায্য করার ক্ষমতা নেই। গোটা কুড়ি ধার দিচ্ছি, যখন পারবে শোধ দিয়ো।
>
> বন্ধুর স্ত্রীর চিকিৎসা করার টাকা চুরি করিয়া ধনেশের মাথাও এলোমেলো হইয়া গিয়াছিল।
>
> দুর্গানাথের যে টাকা চুরি করিয়াছিল তাহা হইতেই দুইটি দশ টাকার নোট সে দুর্গানাথকে দেয়।
>
> সব নোটই এক রকম। দুর্গানাথ বুঝিতে পারে না যে, রক্ত জলকরা পরিশ্রমের চুরি যাওয়া মজুরির নোটগুলি হইতেই সে দুটি দশ টাকার নোট বন্ধুর কাছে ঋণ হিসাবে ফেরত পাইয়াছে।

মানব বলে, না, সত্যি লেখক হয়ে উঠেছে কালাচাঁদ। খেলনার জন্য দুশ্চিন্তা, বাড়ি ফেরার জন্য ব্যাকুলতা, প্রুফ দেখার সময় অন্যমনস্কতা—এ সব বর্ণনা না দিলে চরিটা একটু বেখাপ্পা হয়ে যেত।

ধনদাস উমাকান্তকে মহেশের কাগজটার সঙ্গে পাল্লা দেবার কথা বলেছিল। প্রকৃতপক্ষে হরফের সঙ্গে রস সাহিত্যের প্রায় কোনো প্রতিযোগিতা নেই—দুটি একেবারে দু-স্তরের দুরকম পাঠকের জন্য আলাদা রকম মাসিকপত্র। কিন্তু সে কথা ধনদাসকে বলে কোনো লাভ নেই জেনে উমাকান্ত অনর্থক বাক্যব্যয় করেনি। ধনদাসের কাছে মহেশের কাগজ বার করার একমাত্র উদ্দেশ্য হল তার কাগজের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া, তার কাগজকে হটিয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়া।

মহেশের বদলে অন্য কেউ সম্পাদক হয়ে মাসিকটা বার করলে দু-একবছর চলবার পরেও হয়তো ধনদাসের চোখে পড়ত না, চোখে পড়লেও পাতা উলটে দেখার শখ হয়তো জাগত না কোনোদিন।

তার কাগজ থেকে বিতাড়িত মহেশকে কেন্দ্র করে বার হয়েছে বলেই হরফ সম্পর্কে তার এত কৌতূহল। দ্বিতীয় সংখ্যা হরফ বার হবার সময় হলে প্রতিদিন সে স্টলে খোঁজ নেয়, প্রকাশিত হওয়ামাত্র একটা সংখ্যা কিনে নেয় এবং নিজের কাগজটার চেয়েও বেশি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বেশি সময় খরচ করে সেটা মন দিয়ে পড়ে।

এ সংখ্যাতেও কালাচাঁদের হরফ নামে আরেকটি লেখা ছাপা হয়েছে দেখে সর্বাগ্রে সে ওই লেখাটি পড়ে নেয়।

ধনদাসের বুকটা আবার ধড়াস করে ওঠে। প্রথম সংখ্যা হরফ কাগজে কালাচাঁদের প্রথম লেখা হরফ পড়ে যেমন ধড়াস করে উঠেছিল।

এবার আরও স্পষ্ট—আরও সাংঘাতিক আক্রমণ !

দুর্গানাথ অর্থাৎ উমাকান্তের স্ত্রী খেলনা অর্থাৎ পুতুলের কঠিন রোগের চিকিৎসার জন্য অতি কষ্টে সংগ্রহ করা টাকা ধনেশ অর্থাৎ সে চুরি করে বন্ধুর স্ত্রীকে খুন করেছে।

কারও কি বুঝতে বাকি থাকবে কোন ব্যাপার নিয়ে কাকে এ গল্পে ঠোকা হয়েছে ?

কে এই গল্পের লেখক ? স্বয়ং উমাকান্ত কি ? কাউকে ফরমাশ করে টাকা দিয়ে ওটা লিখিয়ে নেওয়া হয়ে থাকলে লেখককে নিয়ে ধনদাস মাথা ঘামাবে না। কিন্তু উমাকান্ত নিজেই যদি ওটা ছদ্মনামে লিখে থাকে, তার মাসিকের মুদ্রাকর হবার সম্মান পেয়েও তাকে এভাবে আঘাত করে যে লেখা ছাপাতে পারে, তাকে শুধু তাড়াবে না—ঘা মেরে ওকে সে কাঁদিয়ে ছাড়বে—চুরমার করে দেবে ! ভালো করে বুঝিয়ে দেবে যে পিঁপড়ের পাখা গজালে ফলটা কী হয়।

সে জন্য এখন মাথা ঘামাবার দরকার নেই। উমাকান্তের মতো একটা মানুষকে জব্দ করার উপায়ের তার অভাব হবে না। আগে জানতে হবে সত্যই উমাকান্ত লেখাটার জন্য দায়ি কি না।

একটু বিরক্তির ভাবও দেখাবে না। এবং সদয় ব্যবহারে উমাকান্তকে নির্ভয় নিশ্চিন্ত করে রাখবে।

আসল ব্যাপারটা নিয়ে একটু মাথা ঘামানো দরকার।

মহেশকে বরখাস্ত করায় এবং উমাকান্তের বইটার কপিরাইট দেড়শো টাকায় কিনে ফেলায় তার যে ভারী বদনাম হয়েছে এটা ভালো করেই ধনদাস টের পেয়েছে।

কিন্তু আজও সে বুঝে উঠতে পারে না তার অপরাধটা কী, কী মারাত্মক দোষটা সে করেছিল !

মহেশ ঠিকমতো সার্ভিস দিতে পারছে না, রস সাহিত্য ঠিকমতো চালাতে পারছে না, তবু মাসে মাসে মাইনে দিয়ে ওকে রেখে তাকে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে ?

মহেশ যে ঠিকমতো চালাতে পারছিল না কাগজটা, উমাকান্তই তো তার জীবন্ত প্রমাণ ! একযুগেরও বেশি সময় ধরে সম্পাদক হয়ে থেকে মহেশ যা পারেনি, কত অল্প সময়ে উমাকান্ত সেটা সম্ভব করেছে—বর্ষার লতার মতো ফনফনিয়ে বেড়ে গেছে রস সাহিত্যের বিক্রি, বিজ্ঞাপন আর লাভ। উমাকান্তকে পুরস্কার না দিয়ে সে পারেনি।

মহেশকে তাড়ানো তবু কেন দোষনীয় ? একজন অকর্মাকে লোকসান দিয়ে দিয়ে পোষাই কি তার কর্ম—তার ধর্ম—তার কর্তব্য ?

উমাকান্তের বেলাতেও সে কী অপরাধ করেছিল ?

বলামাত্র দুশো টাকা দিতে তো সে রাজি হয়েছিল হাতে লেখা দিস্তা কয়েক কাগজের জন্য ! ওই টাকায় তো অনায়াসে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেত পুতুলের !

নিজেকে মস্ত বড়ো মনে করে অহংকারে উমাকান্ত যদি না গ্রহণ করে থাকে তার উদারতা, ব্যাবসাদারের মতোই যদি যাচাই করে আসতে গিয়ে থাকে বাজারটা, কোথাও সুবিধা করতে না পেরে যদি আবার তার কাছেই ফিরে এসে থাকে, তার অসদ্ব্যবহারে চটে গিয়ে সে যদি দুশো টাকার বদলে

দেড়শো টাকায় কিনে নেয় তার বইয়ের কপিরাইট—তাতে উমাকান্তের বউকে মেরে ফেলার দায়টা তার ঘাড়ে চাপে কোন যুক্তিতে ? অন্য যে সব প্রকাশকদের কাছে উমাকান্ত চেষ্টা করতে গিয়েছিল, তারাও সমানভাবে দাযি নয় কেন ?

দুশো টাকা দিতে চেয়েছিল, নগদ নোট গুনে দিতে চেয়েছিল, চটপট ওই টাকাটা নিযে ডাক্তার ডাকিয়ে চিকিৎসা করালে বউটা তার নিশ্চয় বেঁচে যেত।

এ কী রকম পাগলামি যে বউ মরে মরুক তবু আমি সস্তায় কপিবাইট বেচব না ?

বিপদে পড়ে মানুষ কাবুলিওয়ালাব স্মরণ নেয---নগদ শোধ দিতে পাববে না শুধু সুদ গুনে গুনে জীবন কাটানো কবুল করে ফেলে।

বইটা চলবে কি চলবে না, ছাপিয়ে লাভ হবে কি লোকসান যাবে, কিছুই ঠিক নেই। এ অবস্থায় দুশো টাকা নগদ দিয়ে কপিরাইট কেনা অপরাধ হবে কেন তাব ?

কেন তার বদনাম হবে ? কেন হরফ এমন লেখা বার কবার সুযোগ পাবে যা পড়েই উমাকান্তের কপিরাইট বিক্রির ব্যাপার যারা জানে তারা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবে কাকে আঘাত করা হয়েছে ?

আরও কম টাকাতেও সে কপিরাইট কিনেছে, অবশ্য উমাকান্তেব মতো ওই লেখকদেব নাম ছিল না।

মানবের একেবারেই নাম ছিল না, তার প্রথম বইয়ের কপিরাইট কিনেছিল একান্ন টাকায় ! বইটি খুব বিক্রি হযেছে, ইতিমধ্যে পাঁচটা সংস্করণ হয়েছে এবং ওই একখানা বই থেকে মানবেরও নাম ছড়িয়েছে লেখক হিসেবে।

তার কাছে ধনদাস আরেকখানা বই চেয়ে চিঠি লিখেছিল কিন্তু তাব তিন-চাবখানা চিঠিব জবাবও সে দেয়নি। রস সাহিত্যে লিখেও দশ-পনেরো টাকা দক্ষিণা পায়। অন্য কাগজেও লেখে, অন্য প্রকাশক বইও প্রকাশ করেছে কয়েকখানা।

এমনি নেমকহারাম হয় বটে মানুষ ! প্রথম বই সাহস করে ছাপিযে বাজারে ছঁড়িযে নাম করে দিল—এখন তার চিঠির জবাব পর্যন্ত দেয় না !

ভেবে-চিন্তে ধনদাস একদিন সকালে মানবের বাড়িতে গিযে হাজির হয। হাত তুলে নমস্কার কবে অমায়িক হাসির সঙ্গে বলে, কেমন আছেন মানববাবু ? আপনাবা তো আর যাবেন না, নিজেই একবার দেখা কবতে এলাম।

অল্পক্ষণ সাধারণ আলাপের পরেই ধনদাস বলে, আমাকে আব বই দেবেন না ?

মানব জ্বালাভরা হাসিব সঙ্গে বলে, আপনাকে বই ? পঞ্চাশ টাকায কপিরাইট কিনে পাঁচটা এডিশন করেছেন—আপনাকে আবার বই ?

ধনদাস জাঁকিয়ে বসে বলে, অপরাধ করেছিলাম বলতে চান ?

মানব জ্বালার সঙ্গেই বলে, অপরাধ নয় ? লেখককে বাগে পেয়ে ঠকানো কি পুণ্য কাজ ?

ধনদাস বলে, তখন আপনার একখানাও বই বার হয়নি এটা ভুলে যাবেন না দয়া করে। প্রকাশকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছিলেন সেটাও মনে রাখবেন। আমি সাহস করে কপাল ঠুকে বইটা ছেপেছিলাম বলেই আজ নাম করেছেন—লিখে টাকা কামাচ্ছেন।

মানব ব্যঙ্গের সুরে বলে, কপালটা ঠুকে দিয়েছিলেন আমার। ক-টা টাকার জন্য বিপদে না পড়লে কপিরাইট বেচতাম ভেবেছেন ? আপনি এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন কতই দয়া করেছিলেন ! বই আমার ছাপা হত, নামও হতই—দুদিন আগে আর পরে। বই ভালো হলে ছাপা কি আটকে থাকে ? ভালো পাবলিশারও অনেক আছেন যারা ভালো বইয়ের কদর বোঝেন, লেখককেও ঠকান না। সবাই আপনার মতো ডাকাত নয় !

একটু থেমে মানব বলে, দু-একদিনের মধ্যে টাকাটা না চাইলে, বিপাকে পড়েছি টের না পেলে, আপনিই কি পঞ্চাশ টাকায় কপিরাইট চাইতে সাহস পেতেন ? রিস্কের কথাই বা বলছেন কোন মুখে ? ম্যানুস্ক্রিপ্ট দুদিন আপনার কাছে ছিল—বইটা যাচাই করেননি বলতে চান ? ভালো বই জেনেই লেখকের গলা কাটার সুযোগ নিয়েছিলেন। নতুন লেখক তো কী হয়েছে ? সব লেখকই একদিন নতুন থাকেন !

ধনদাস বলে, আমরা ব্যবসায়ী মানুষ—

মানব বলে, এর নাম কি ব্যাবসা ? কায়দায় পেয়ে লেখকের ন্যায্য পাওনা মেরে দেওয়া ? সাধারণভাবে যদি যেতাম, ম্যানুস্ক্রিপ্ট পড়ার সময় দিতাম—নিজে কিছু বুঝুন না বুঝুন, কোনো লেখককে দিয়ে পড়িয়ে তার মত নিয়ে অন্য রকম চুক্তিতে ছাপতেন। নতুন লেখক বলে, রিস্ক আছে বলে, প্রথম এডিশনে রয়ালটির সাধারণ রেটের চেয়ে অবশ্য কিছু কম পেতাম। সেটা হত ব্যাবসা।

মহেশ গোমড়া মুখে বলে, কে জানে মশায়--আপনাদের ন্যায়নীতি যুক্তিতর্ক মাথায় ঢোকে না। হলই বা বই—ব্যাপার তো সেই বেচাকেনার ? বেচার গরজ বেশি হলে সস্তায় মাল ছাড়তেই হয়-- সেটাই তো নিয়ম। দরকার হলে লোকসান দিয়েও ছাড়তে হয়। সবটা লোকসান যাবে—যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকুই তখন লাভ। যে বই একদম কাটছে না সে বই আমরা মোটা কমিশন দিয়ে কাটিয়ে দিই—আদ্দেক দাম পেলে তাই সই, সিকি পেলে তাই সই। তাও না পেলে ওজনদরে ছেড়ে দিই।

মহেশ সখেদে মাথা নাড়ে, না মশায়, আপনাদের যুক্তি একদম মাথায় ঢোকে না। কই, আমাদের তো কেউ বেয়াত করে না !

তার আন্তবিকতা সম্পর্কে এতক্ষণে সচেতন হয়ে মানব প্রথমে বিস্মিত তারপর স্তম্ভিত হয়ে যায়। ধনদাসের আন্তরিকতা ?

আন্তবিকতা বইকী ?

মারাত্মক রকমের আন্তরিকতা। ধনদাস মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে দুনিয়ায় লেনদেন বেচাকেনার নীতিই এই—যেখানে সুবিধা পাবে, যখন যাকে বাগে পাবে !

সবাই ওত পেতে আছে, তাকে বাগে পেলেই তাব ঘাড় ভাঙবে—সুতরাং তারও পরিপূর্ণ অধিকার আছে যাকে যখন যেভাবে বাগে পাবে তারই ঘাড় ভাঙাব !

মানব ভেবে পায় না কী করে আসল কথাটা তাকে বোঝাবে, বিশ্বাস করতে পারে না যে জলের মতো সহজ করে বুঝিয়ে দিলেও সে বুঝবে।

সে বেচাকেনার শুধু লাভ-লোকসানের চলতি হিসাবটা জানে বোঝে। সাহিত্য বলো আর সংস্কৃতি বলো আর সভ্যতা বলো, ও সব কোনো কিছুর ধার সে ধারে না।

মানব খুব নবম সুরে বলে, কথাটা কী জানেন, লেখকেরা ব্যবসায়ী নন, তারা সমাজের সেবক। লেখকরা প্রকাশকের সঙ্গে ব্যাবসা করেন না, লেখকের সঙ্গে পার্টনারশিপে লেখকের বই নিয়ে প্রকাশকেরা ব্যাবসা করেন। প্রকাশকের সঙ্গে ছাপাখানা, কাগজওলা এদের ব্যাবসার সম্পর্ক—লেখকের সঙ্গে সে সম্পর্ক নয়। তাছাড়া, লেখকেরা অনেক ত্যাগস্বীকার করেন। সেই জন্য তারা আপনাদের কাছে সহযোগিতা, সহানুভূতি, ন্যায্য ব্যবহার আশা করেন।

ধনদাস খানিকক্ষণ গুম খেয়ে থেকে বলে, অন্যায্য ব্যবহারটা কী করেছি বুঝিয়ে বলুন না ? বেশ, আপনার কথাই মানছি, আমি না ছাপলেও আপনার বইটা ছাপা হত ! ধরুন আরও দু-তিনবছর ঘোরাফিরা করতেন—তারপর নাম হত। একটু দাঁও মেরে থাকলেও আমি বইটা ছাপিয়ে দিতে চটপট আপনার নাম হয়ে গেল। ওই দু-তিনবছরে পাঁচ ছটা বই লিখে ভালো টাকা পেলেন। বইটা নিয়ে আমি লাভ করেছি—আমি বইটা নিয়েছিলাম বলে আপনিও তো লাভ করেছেন !

মানব এবার বিরক্ত হয়ে বলে, আপনার খালি লাভের হিসাব। লেখক কি শুধু লাভের জন্য লেখেন ? টাকার জন্য লেখেন ?

ধনদাস বিরক্ত হয়ে বলে, লেখার জন্য লেখকরা তবে টাকা চান কেন ? যত বেশি পারেন টাকা আদায়ের চেষ্টা করেন কেন ?

মানব এবার সশব্দে হেসে উঠে বলে, লেখককেও বাঁচতে হবে বলে !

কতকাল আর ধনদাসের কাছে গোপন থাকা সম্ভব যে, হরফের শ্রীহীন উপাধিহীন লেখক কালাচাঁদ তারই প্রেসের কম্পোজিটার ?

লেখকদের ছদ্মনামে লেখার বাসনার খবরটা ধনদাসের অজানা ছিল না। সে ধরে নিয়েছিল যে হরফের শ্রীহীন উপাধিহীন কালাচাঁদ কোনো নামকরা লেখকেব ছদ্মনাম—মহেশ হওয়াও আশ্চর্য নয়, মানব বা খালেক হওয়াও আশ্চর্য নয়। উমাকান্তও হতে পারে।

নানাভাবে ধনদাস জানবাব চেষ্টা করছিল হরফের লেখক কালাচাঁদেব আসল নামটা কী।

লেখাটা নিয়ে যে রকম হইচই তাতে অধিকাংশ লেখকেরই ইতিমধ্যে জেনে যাবার কথা—আসল মানুষটা কে। কিন্তু আশ্চর্য, এই, যাকে জিজ্ঞাসা কবে সে-ই বলে জানে না ! লেখকদের মধ্যে এমন একতা ? এমনভাবে সবাই জোট বেঁধেছে ! তাব কাছে কালাচাঁদেব আসল পরিচয় ফাঁস কবা হবে না !

সুহৃদ চৌধুরী অত্যন্ত বাজে লেখে, কিন্তু ধনদাসের সে স্তাবকের মতো অনুগত। প্রতি সংখ্যা রস সাহিত্যে তার লেখা ছাপা হয় এবং সেই লেখাব জন্য সে সত্যিকাবেব লেখকেব ভালো লেখাব সমান মজুরি পায়। সুহৃদ যা লিখত নিরুপায় মহেশ তাই ছাপিযে দিত।

তার লেখা না ছাপিয়ে উপায় নেই জেনে উমাকান্ত একটু কৌশল খাটিযে তার লেখা কনট্রোলেব ব্যবস্থা করেছে। সুহৃদকে সে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, রস সাহিত্যের রকমফেব হচ্ছে, নানা রকম নতুন লেখা দিতে হচ্ছে, খুব ছোটো ছোটো লেখা না দিলে হয়তো সুহৃদের লেখা সব সংখ্যায় ছাপা যাবে না।

ছোটো লেখা লিখুন না, যত ছোটো পারেন ! ছোটো লেখাতেই আপনার কলম ভালো খোলে। লেখা ছোটো হলেও দক্ষিণা ঠিক থাকবে—সে জন্য ভাববেন না।

কৃতজ্ঞ সুহৃদ ছোটো ছোটো লেখা দেয়, উমাকান্ত সেটা এমন জায়গায় গুঁজে দেয় যে বস সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকারা বাজে লেখাটা অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারে।

ধনদাস একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কতটুকু করে লিখছ সুহৃদ ? ফাঁকেফোকরে তোমার লেখা ছাপা হচ্ছে কেন ?

সুহৃদ বলেছিল, আমার ছোটো লেখাই ভালো জমে। উমাবাবু জায়গামতোই ছাপছেন।

একদিন ধনদাস একটু রাগের ভাব দেখিয়ে সুহৃদকে বলে, এত দিন ধরে বলছি, হরফের ওই কালাচাঁদ লেখকটা কে, খবর জানতে পারলে না ? তুমি কেমন লেখক হে ?

সুহৃদ সবিনয়ে বলে, কী করব বলুন ? অসম্ভব কি সম্ভব করতে পারি ? কারও সাধ্য নেই ওই লেখকের আসল পরিচয় বার করে। ব্যাপারটা বুঝছেন না ? মহেশবাবু কাউকে দিয়ে লেখাচ্ছেন, হাতের লেখা চেনা যাবে বলেও হয়তো কপি করিয়ে প্রেসে দিচ্ছেন।

অকাট্য মনে করলেও যুক্তিটা পছন্দ হয় না ধনদাসের। কেন পছন্দ হয় না সে অবশ্য বুঝতে পারে না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে এ রকম লুকোচুরি জুয়াচুরির ব্যাপার চলে না, লেখকদের মধ্যে যতই মতবিরোধ ঈর্ষা আর বিদ্বেষ থাক, লুকিয়ে থেকে কোনো ব্যক্তিকে ঘা দিয়ে ব্যক্তিগত গায়ের ঝাল ঝাড়ার নীতি সাহিত্যে অচল। জীবনের নীতিকে তুলে ধরাই সাহিত্যের মূলনীতি।

সাহিত্য বিজ্ঞানকেও কনট্রোল করে। হাইড্রোজেন বোমা পর্যন্ত স্বাধীনতার জন্য সাহিত্যের মুখ চেয়ে থাকে !

ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সাহিত্য নয়, ব্যক্তিগত আক্রমণ বাতিল নয়, সাহিত্যে সে আক্রমণ খিস্তিও হতে পারে কিন্তু বেনামিতে চলবে না।

লেখকদের নিজের নাম থাকলে সে কাগজ গরম গরম ব্যাপারে পড়তে না পড়তে বিকিয়ে যাবে। কারণ, সবাই বুঝতে চাইবে রক্তমাংসের মানুষটার বা মানুষগুলির এমন গায়ের জ্বালার কারণ কী।

আত্মগোপন করে ছদ্মনামে লেখাগুলি ছাপালে কাগজটা বিশ-পঁচিশ কপি বিক্রি হবে কি না সন্দেহ।

সবাই ভাববে, কে জানে কোন চোর ছ্যাঁচড় চোরাবাজারি বজ্জাতের মাথায় খিস্তি ছেপে গরিবের পকেট মারার মতলব জেগেছে !

কালাচাঁদও ছদ্মনামে লেখাটা ছাপালে অনেকেই একটু বিস্মিত এবং বিচলিত হয়ে ভাবত এটা কার লেখা, কী রকম লেখা !

গুণীমহলের কাছ থেকে খবর দাবি করত।

কারণ, সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ না রেখে তাদের স্বীকৃতি না পেয়ে কেউ গুণী হয় না— হতেই পারে না।

বিচলিত গুণীমহল, যেমন একজন কম্পোজিটার স্বনামে লেখাটা প্রকাশ করেছে জেনে, এমন লেখা সে কেন লিখেছে জেনে দশজনকে খবরটা জানিয়ে দিয়েছে, কালাচাঁদের নাম পরিচয় গোপন রাখলে সে খবরটাও দশজনকে জানিয়ে দিত।

লেখকের পরিচয় এবং লেখার মানে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ায় হুহু করে বিক্রি হয়ে গেছে হরফের কপিগুলি। অজানা লেখক আড়াল থেকে খামখেয়ালি খিস্তি করছে জানলে গুণীমহল বিচলিত হত না--ওই মহলে সাড়া না জাগায় খবরটাও ছড়িয়ে পড়ত না দশজনের মধ্যে।

এ খবরও সকলেই জানে যে কালাচাঁদের পরিচয় প্রকাশ করা হবে কি হবে না তাই নিয়ে একটা ঝড় বয়ে গিয়েছিল হরফের আপিসে।

মহেশ আর জহর ছিল গোপনতার পক্ষে, মানব ছিল বিরোধী। রাগারাগি তর্কবিতর্কের পর মানব প্রায় স্কুলমাস্টারের মতো গম্ভীর হয়ে ছাত্রদের পড়া শেখানোর মতো তাদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল মূল নীতিটা---এই সোজা কথাটা কেন বুঝতে চাইছেন না আপনারা ? লেখককে বাদ দিয়ে লেখার কোনো মানে হয় না। এ জগতে আজ পর্যন্ত কোনো লেখক নিজেকে আড়ালে লুকিয়ে রেখে খ্যাতিলাভ করতে পারেনি। সেটা অসম্ভব। রক্তমাংসের জানা-চেনা মানুষকেই মানুষ খাতির করে, খ্যাতি দেয়। দশজনের জন্য লেখা। জানতে চাইবে কে এই মহাজন—কেমন ধারা এ মানুষটা, যে এতকাল পরে আমার মনের কথা লিখল ?

ছদ্মনামে লিখে থাকলেও নিজের নামধাম বংশ পরিচয় এবং নিজের রীতিনীতি রুচি প্রকৃতি স্বচ্ছলতা দরিদ্রতা সবকিছু নিয়ে অন্তত সাহিত্যের জগতে সকলের সামনে এসে দাঁড়াতে হবে লেখককে— তবেই সকলে দাম দেবে তার লেখার।

কালাচাঁদ কি একজন বড়ো লেখকের ছদ্মনাম ? এই নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হতে না হতে প্রচারিত হয়ে হয়ে গেল যে কালাচাঁদ লেখকের আসল নাম---অন্যায়-অত্যাচারের দানবীয় প্রতীককে আঘাত হেনে লেখা হলেও লেখক আত্মগোপন করে লুকিয়ে আঘাত হানেননি। নিজের নামেই তিনি লিখেছেন লেখাটা।

একদিন অল্পবয়সি একটি প্রাণোজ্জ্বল তরুণ একেবারে ধনদাসের দপ্তরে গিয়ে হাজির হয়ে চাপা আগ্রহ আর উত্তেজনায় কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করে, আপনিই কি এ প্রেসের মালিক ? আপনারই প্রেসের কম্পোজিটর কালাচাঁদবাবু অদ্ভুত রকম নতুন ধরনের গল্প লিখছেন হরফে ?

ধনদাস চমকায় না, ভড়কায় না, ধাতছাড়া হয়ে যায় না। অদ্ভুত, উদ্ভট এবং বীভৎস ঘটনার সঙ্গে তার প্রায় নিত্যকার পরিচয়।

সে ধীরভাবে বলে, বসুন না, বসে বলুন না কী চাইছেন !

ছেলেটি সংযত হয়ে বসে, ধীরে ধীরে বলে, আমার নাম অমূল্য বসাক, আমিও একজন নতুন লেখক—

ধনদাস বলে, তাই নাকি ! রস সাহিত্যে লেখেন না কেন ?

অমূল্য একটু বিব্রত হয়ে বলে, রস সাহিত্য ? রস সাহিত্যের নাম তো শুনিনি !

ধনদাস হেসে বলে, নামও শোনেননি রস সাহিত্যের ? রস সাহিত্য বলে একটা মাসিক আছে না জেনেই লেখক হয়েছেন ?

অমূল্যও হেসে বলে, বাংলা মাসিকের কথা আর বলবেন না, আনাচকানাচ ঝোপঝাড় থেকে গন্ডায় গন্ডায় মাসিক বেরোয়। কে অত হিসাব রাখে বলুন ?

ধনদাস সায় দিয়ে বলে, ঠিক কথা। কতকাল প্রেস চালাচ্ছি—আমার কি আর জানতে বাকি আছে ! আর কিছু করার নাই—চালাও একটা মাসিক ! যাকগে—কালাচাঁদের কথা কী বলছিলেন ?

ওনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই। একজন কম্পোজিটার এ রকম চমৎকার গল্প লেখেন—ভাবলেও অবাক হয়ে যেতে হয়।

একমুহূর্ত চিন্তা করে ধনদাস কালাচাঁদকে ডেকে পাঠায়।

সে এলে হাই তুলে বলে, এই ভদ্দরলোক তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন কালাচাঁদ ! ইনিও তোমার মতোই নতুন লেখক। তবে কিনা তুমি বিশ বছর ধরে রস সাহিত্যের পাতা কম্পোজ করছ—উনি কাগজটার নামও শোনেননি !

অমূল্য চেয়ার ছেড়ে উঠে কালাচাঁদের হাত চেপে ধরে বলে, আপনিই লিখেছেন হরফের গল্প দুটো ? আপনাকে একদিন আমাদের সঙ্গে যেতে হবে—আমরা আপনাকে মালা দেব আর আপনার সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করব।

নিজের চোখ আর কানকে ধনদাস কোনোদিন অবিশ্বাস করেনি। আজ সন্দেহ জাগে চোখ-কান তার ঠিক আছে তো !

কালাচাঁদদের তাড়াতে নোটিশ লাগে না—সোজা বলে দেওয়া যে কাল থেকে আর খাটতে এসো না !

সঙ্গে সঙ্গে প্রেসের কাজ মন্থর হয়ে আসার সঙ্গে একটা গুঞ্জনধ্বনি ওঠে—কিছুক্ষণের মধ্যে কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়ে সেটা পরিণত হয় কলরবে। হইচই চেঁচামেচি নয়—স্বাভাবিক গলাতেই অনেকের একসঙ্গে কথা বলার আওয়াজ।

সবাই হাত গুটিয়ে নিজের জায়গায় বসে আছে।

উমাকান্ত উঠে গিয়ে কালাচাঁদকে জিজ্ঞাসা করে, কারণটা কী বললেন ?

কালাচাঁদ বলে, কিছু না। জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ তাড়িয়ে দিচ্ছেন কেন বাবু, কী দোষ করলাম ? জবাব দিলেন, তুমি বড়ো পাজি লোক, তোমায় রাখব না।

উমাকান্ত ভেবে-চিন্তে ধনদাসের কামরায় গিয়ে বলে, একটা কথা বলব ভাবছিলাম—কিন্তু বললেই তো আপনি চটে যাবেন।

কালাচাঁদকে বরখাস্তের হুকুম দেবার পরেই সমস্ত প্রেস মুখরিত হয়ে ওঠায় ধনদাস প্রমাদ গুনছিল।

ধনদাস মিষ্টিসুরে বলে, না না, চটব না। আপনার কথা শুনে কোনোদিন চটেছি উমাবাবু ? আমি জানি, আপনি আমার পক্ষ টেনে কথা বলবেন, আমার ভুলচুক দেখিয়ে দেবেন।

উমাকান্ত বলে, কালাচাঁদকে এ রকম হঠাৎ তাড়ানো উচিত হবে না। মহেশবাবুকে ছাড়িয়ে দিয়ে আপনার বড়ো বদনাম হয়েছে।

ধনদাস কিছুক্ষণ একদৃষ্টে উমাকান্তের মুখের দিকে চেয়ে থাকে, তারপর শান্তকণ্ঠে বলে, আমি কি কালাচাঁদকে তাড়াতে চাই ? সবাইকে তাড়ালে কাজ চালাব কাদের নিয়ে ! তবে কিনা, আমার এখানে কাজ করবে, লেখা ছাপাবে হরফে ! কেন, আমার একটা কাগজ বেরোয় না ? সে কাগজে লিখতে দোষ আছে কিছু ?

উমাকান্ত কথা বলে না। একটা সস্তা চুরুট ধরিয়ে খানিকক্ষণ নীরবে ধোঁয়া টেনে ধনদাস বলে, কে এটা সহ্য করবে বলুন ? আমার কাছে খেটে পয়সা লুটবে, লিখবে শত্রুর কাগজে !

শত্রুর কাগজ ?

না তো কী ? মহেশবাবু এত দিন আমার কাগজের সম্পাদক ছিলেন, ছেড়ে গিয়ে নতুন কাগজ বার করলেন। তার মানে কি আমার কাগজের সঙ্গে শত্রুতা করতে নামা নয় ?

বলতে বলতে বিষম কাশি আসে ধনদাসের। চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে কাশির ধমক সামলায়।

যাকগে, যাকগে। কালাচাঁদকে রইয়ে-সইয়ে তাড়াতে বলছেন ? তাই হোক। আরও দু-একমাস কাজ করুক। হরফের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবে না কথা দিলে যেমন কাজ করছে তেমনি করে যাবে।

উমাকান্তের ওকালতির ফলে কালাচাঁদের কাজটা টিকে যায়। খবরটা শুনে কিন্তু তার মুখে কোনো রকম ভাবপরিবর্তন দেখা যায় না।

সম্প্রতি যে একটা অদ্ভুত কাঠিন্যের ছাপ সর্বদাই তার মুখে দেখা যাচ্ছিল সেটা তেমনি বজায় থাকে।

সে শুধু বলে, তাড়ালে তাড়াতেন ! প্রাণপাত করে কাজ শিখেছি, খেটে খাই—মোদের কি কাজের অভাব ঘটে মানুবাবু ?

ধনদাস ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেনি যে কালাচাঁদের লেখার তাৎপর্য সে টের পেয়েছে। সে জানে তাকে ব্যঙ্গ করে আঘাত দিয়ে গল্প লিখেছে বলে একটু বিচলিত হওয়াও বোকামি হবে, রাগারাগি করার তো প্রশ্নই ওঠে না।

শত্রুর কাগজে লেখার জন্য তেড়েমেড়ে যাকে দূর করার হুকুম দিয়েছিল কয়েকদিন পরে তারই সঙ্গে ধনদাসকে সদয়ভাবে উদারভাবে কথা বলতে দেখে উমাকান্ত আশ্চর্য হয়ে যায়।

পুরো প্রায় পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধনদাস কালাচাঁদের সঙ্গে কথা বলে। কিছুই যেন তার জানা ছিল না এমনিভাবে তার বউয়ের রোগ ও মৃত্যুর খবর জিজ্ঞাসা করে, সহানুভূতি জানায়—ছেলেমেয়ে ক-টি, কে এখন তার সংসার চালাচ্ছে এ সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে।

ভাবতে ভাবতে সুহৃদের এ রহস্যের সমাধান হঠাৎ পেয়ে যায় উমাকান্ত—রস সাহিত্যের শেষ ফর্মার প্রুফ দেখতে দেখতে শেষ পাতার নীচে মোটা একটা সরাসরি টানা লাইনের তলে সম্পাদক হিসাবে ছাপা তার নামের পরেই মুদ্রাকর হিসাবে কালাচাঁদের নামটা দেখতে পেয়ে।

তাই বটে। সম্পাদক মহেশের নামের সঙ্গে মুদ্রাকর কালাচাঁদের নামটা ছাপা হয়ে আসছিল কাগজটার প্রথম সংখ্যা থেকে। সুহৃদের বদলে এবার কালাচাঁদের নাম ছাপা হয়েছে। মুদ্রাকর বলে নাম ছাপা হওয়া কতবড়ো সম্মান—সামান্য একজন কম্পোজিটার, রস সাহিত্যের মুদ্রাকর !

কালাচাঁদের পক্ষ নিয়ে তার ওকালতির যুক্তি সত্যই ভড়কে দিয়েছে ধনদাসকে।

মহেশকে তাড়িয়ে সৎ ও গুণীলোকের মহলে তার যে বদনাম রটেছে উমাকান্তের মুখ থেকে না শুনলে ধনদাস হয়তো কোনোদিন খেয়ালও করত না, একটা মাসিক সাহিত্যপত্রিকা চালালে যে এ রকম সুনাম দুর্নামের হিসাব রাখতে হয় এটাও কস্মিনকালে তার মাথায় আসত না।

খেয়াল করে টনক নড়েছে। এতকালের সম্পাদককে তাড়িয়ে জুটেছে বদনাম। এতকালের মুদ্রাকরকেও তাড়িয়েছে জানাজানি হলে বদনাম আরও বেড়ে যাবে নিশ্চয় !

তার কাগজের মুদ্রাকর কালাচাঁদ যে তাকেই খোঁচা দিয়ে হরফে লেখা ছাপায় এটাও অনেকে কল্পনা করতে পারবে না—ভাববে ওগুলি বানানো গল্প। এদিক থেকেও কালাচাঁদকে রেখে লাভ আছে।

হিসাবনিকাশ তাই পালটে দিয়েছে ধনদাস। কালাচাঁদ তার ছাপাখানায় কাজ করে তার শত্রুর কাগজে লিখুক—সে আর তাকিয়েও দেখবে না। কালাচাঁদকে তাড়ানোর ইচ্ছা তার নেই—মুদ্রাকর হিসাবে ওর নামটাই সে রস সাহিত্যের শেষ পাতায় ছাপিয়ে যেতে চায় !

বোনের তিনটি ছেলেমেয়ের দায় নিয়ে মুকুল নাকি পুতুলদির অভাবটা সামলে নেবে। বড়ো হয়ে কেমন হয়েছে অন্তত একবার চোখে দেখে আসা উচিত। কিন্তু হরফের কাজের উপরে বড়ো একটা লেখা নিয়ে মশগুল হয়ে মানব উচিত কাজটা ক্রমাগতই পিছিয়ে দিতে থাকে।

কয়েকদিন পরে হরফের জন্য উমাকান্তের কাছে একটা লেখা আনতে গিয়ে মানব মুকুলকে দেখে আসে। লেখার জন্য লোক পাঠালেই চলত—মুকুলকে দেখার জন্য মানব নিজেই যায়।

উমাকান্ত একমনে কলম পিষছিল। পুতুলের গয়না বাঁধা রেখে তার সেই নতুন কেনা কলমটা !

পুতুলের সঙ্গে শেষ কলহের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে কলমটা তার তুলে রাখার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু আরেকটা কলম না কিনলে সেটা তো আর সম্ভব নয় !

লিখতে লিখতে পুরানো হয়ে ক্ষয়ে গিয়ে শেষ হয়ে যাবার পর স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে তুলে রাখতে হবে। উপায় কী ?

মানবকে সে বলে, তোমার লেখাটাতে একটু চোখ বুলিয়ে দেব—ভেতরে বসে ওদের সঙ্গে গল্প করো গিয়ে।

মুকুলের মা-কে বিধবার বেশে সে এই প্রথম দেখল, কিন্তু পুতুলের মতো দেখতে মুকুলের দিকেই সে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

মুকুল বলে, এতদিনে বুঝি সময় হল দেখা করতে আসার ?

মানব আরও অভিভূত হয়ে লক্ষ করে যে পুতুলের মতোই মুকুলেরও মুক্তার মতো দাঁতগুলি ঝকঝক করছে।

মুকুলের মা মানবকে আদর করে বসিয়ে বলে, বই লিখে খুব নাম করেছ শুনেছি। তোমার চেয়ে ঢের বেশি বই লিখে কতজনে তোমার মতো নাম করতে পারেনি। প্রতি চিঠিতে তোমার পুতুলদি তোমার কথা লিখত।

মুকুলের মা আঁচল দিয়ে চোখ মোছে।

তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মানব বারবার মুকুলের দিকে তাকাচ্ছিল, হঠাৎ নিজের মনে সে খাপছাড়া মন্তব্য করে বসে—কিন্তু যমজও তো নয় !

লিখে নাম করলেও তার চেহারা যে খুব খারাপ হয়ে গেছে—মা-র এই কথার মাঝখানে তার মন্তব্য শুনে মুকুল একটু হেসে বলে, কীসের যমজ নয় ?

মানব বলে, অবিকল পুতুলদির মতো দেখতে, কথা থেকে হাসিটা পর্যন্ত। পুতুলদির চেয়ে তুমি পাঁচ ছবছরের ছোটো। ওই তফাতটাই শুধু ধরা যায়—বয়সে কাঁচা।

মুকুলের মা বলে, যমজ না হলে কি বোনে বোনে মিল থাকে না ? মিলটাই তোমরা দেখছ—তফাতও অনেক আছে। কয়েকবার যাওয়া আসা করো, নজর পড়বে। প্রথম দেখে উমাও বলেছিল, অবিকল বিয়ের সময়কার পুতুল। এখন আর বলে না।

সুধাকে উমাকান্ত শক্ত হতে বলেছিল, সুধা কীভাবে শক্ত হয়েছে কী করেছে সেই জানে। ধনদাস আর উমাকান্তকে টানাটানি করে না।

সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার এই যে ধনদাসকে অসন্তুষ্ট মনে হয়নি। জালজাল শাড়ি পরে পরিবেশন করে তাকে খাইয়ে সভ্যজগতের ভদ্রবেশ ধরে নির্জন ঘরে তার সঙ্গে গল্প করতে এলে, সুধাকে সে গল্পচ্ছলেই সাংঘাতিক বিদ্রোহের উপদেশ দিয়ে এসেছিল—সেদিন ভাবতেও পারেনি ফলাফল কী হবে। একেবারেই কোনো ফল হবে কি না।

দু-চারদিন একটু গম্ভীর ও চিন্তিত মনে হয়েছিল ধনদাসকে।

কিন্তু রাগের ভাব প্রকাশ পাওয়ার বদলে একটু যেন শ্রদ্ধার ভাবই প্রকাশ পেয়েছিল তার কথা ও ব্যবহার।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেও ফেলেছিল- আপনারা লেখকেরা আশ্চর্য মানুষ। এদিকে এমন উদাসীন ভাবুক মনে হয়, ঠিক যেন স্বপ্নরাজ্যে বাস করেন, অথচ আসল কথাটা চট করে ধরতে পারেন। আমরা হাজার মাথা ঘামিয়েও কূলকিনারা পাই না।

সুধার কী গতি হল জানবার জন্য মাঝে মাঝে উমাকান্তের জোরালো কৌতূহল জাগে কিন্তু মুখ ফুটে তার সম্পর্কে ধনদাসকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পায় না।

এমনি চুপচাপ আছে কিন্তু সে যেচে সুধার কথা তুললে হয়তো একেবারে বিয়ের প্রস্তাব করে বসবে।

প্রায় দুমাস কেটে গেছে কিন্তু আবার নিমন্ত্রণ পাওয়ার আশঙ্কা উমাকান্তের একেবারে ঘুচে যায়নি। ধনদাস যে কোনো একটা ব্যবস্থা করার জন্য পাগল হয়ে ওঠেনি এটাই তার অদ্ভুত মনে হয়।

তবে কি কোনো জঘন্য উপায়ে বিপদ কাটিয়ে সমস্যার সমাধান করে ধনদাস নিশ্চিত হয়েছে?

হঠাৎ একদিন কিন্তু আবার উমাকান্ত নিমন্ত্রণ পায়। একেবারে সুধার বিয়েতে ভোজ খাবার নিমন্ত্রণ।

ধনদাস বলে, ছেলেটি যে আমার খুব বেশি পছন্দ হয়েছে তা নয়—তবে কিনা জানাশোনার মধ্যে। দেখা যাক মেয়েটার অদৃষ্টে কী আছে।

উমাকান্ত পরম স্বস্তিবোধ করে। একটা কথা ভেবে সে খুশিও হয়। ধনদাস বলেছে ছেলেটি জানাশোনা—তাহলে এ নিশ্চয় সুধার চেনা সেই জোয়ান ছেলেটি।

ওই দিন আরেকটা বিয়ের ভোজেও তার নিমন্ত্রণ ছিল—নিজে না লিখলেও লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাহিত্যরসিক একজন বড়ো সরকারি চাকুরের বাড়িতে।

সুধার বিয়ের ভোজ খেতে যাওয়াই উমাকান্ত ঠিক করে—অন্য নিমন্ত্রণে শুধু হাজিরা দিতে যাবে।

ছেলেটিকে দেখবার আগ্রহে একটু সকাল সকাল ধনদাসের বাড়ি গিয়ে উমাকান্ত বিয়ের আসরে বসে আছে, একটি ছেলে এসে জানায় যে তাকে একবার অন্দরে যেতে হবে।

তাকে অন্দরে ডেকেছে? উমাকান্ত একটু আশ্চর্য হয়েই ভিতরে যায়। সেদিন দুপুরে নিমন্ত্রণ খাইয়ে যে ঘরে তাকে বিশ্রাম করতে দেওয়া হয়েছিল ছেলেটি সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে বসায়। খানিক পরেই কনের সাজে সুধা এসে হাঁটু পেতে বসে, তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে।

উমাকান্ত হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে, সুধা, পাত্র তোমার সেই জোয়ান মানুষটিই তো?

সুধা মৃদুস্বরে বলে, হ্যাঁ। আপনিই আমায় বাঁচিয়ে দিলেন, আপনার ঋণ জীবনে ভুলব না।

আমার ঋণ? আমি তো কিছুই করিনি।

আপনিই সব দিক রক্ষা করেছেন। আপনি যদি সেদিন আমায় না বোঝাতেন, শক্ত হবার বুদ্ধি না দিতেন—কে জানে আমার কী দশা হত। হয়তো সুইসাইড করা ছাড়া উপায় থাকত না।

আজও সেদিনের মতো সুইসাইড কথাটা সে স্পষ্ট উচ্চারণ করে।

উমাকান্ত প্রশ্ন করে, কীভাবে শক্ত হয়েছিলে ? কী করেছিলে ?

সুধার কাছ থেকে কী মারাত্মক জবাব পাবে জানা থাকলে এমন অনায়াসে সহজভাবে প্রশ্নটা উচ্চারণ করতে উমাকান্ত ভরসা পেত না ! সুধা খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে থেকে ধীরে ধীরে বলে, না, আপনার কাছে লুকোব না, আপনাকে লজ্জা করব না। কথাটা আগেও ভেবেছিলাম কিন্তু সাহস পাইনি। কে জানে রাঙাদাদু কী কাণ্ড করবেন, আমাদের হয়তো মেরেই ফেলবেন।

ধনদাসের বিশ্রী রকম ফরসা রঙের কথা উমাকান্তের মনে পড়ে যায়। সুধার রাঙাদাদু যে কে—জিজ্ঞাসা করা দরকার হয় না।

সুধা বলে, আপনার কথা শুনে মনটা শক্ত করলাম, ওই জোয়ানটাকে রাঙাদাদুর কাছে পাঠিয়ে দিলাম—আমার অবস্থা বলবে, তাড়াতাড়ি আমাদের বিয়ে ঠিক করতে বলবে।

উমাকান্ত শুধু বলে, ও !

সুধা বলে, একেবারে উল্টো রকম বুঝে মিছিমিছি ভেবে মরছিলাম—রাঙাদাদু খেপে যাবে ! রাঙাদাদু বেঁচে গেছে। আপনি না বললে কোনোদিন মনটা শক্ত করতে পারতাম না।

অন্য বিয়েবাড়িতে মানবেরও নিমন্ত্রণ ছিল। ধনদাসের বাড়ি থেকে উমাকান্ত যখন সেখানে পৌঁছায়, মানব সবে ফেলে ছড়িয়ে খেয়ে উঠেছে। খানিকক্ষণ বসে মানব আর উমাকান্ত একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তার বাসার দিকে চলে। তার বাড়ির কাছাকাছি মোড় থেকে মানব বাস ধরবে।

উমাকান্তের কাছে সুধার ব্যাপার শুনে মানব বলে, কতকাল ধরে গল্প-উপন্যাসে কতভাবেই যে এই জটিলতা হাজির করা হয়েছে ! শুরু সেই পুরাণে কিংবা তারও আগে। মহাভারতের কুন্তীদেবীকেই ধরুন। দেবতা মানুষ হয়ে এলেন, উপায় নেই, কুমারী কুন্তীর কর্ণকে জন্ম দিতে হল। মোট কথাটা সবক্ষেত্রে এক—মেয়েরা অসহায়, নিরুপায়। কাহিনি যেমন হোক, মূল সূত্রটা হল ওই। ক্ষমতাবান পুরুষ, নিরুপায় মেয়ে, অসামাজিকভাবে তার মা হবার বিপদ বা সমস্যা।

উমাকান্ত বলে, সুধা কিন্তু মা হবে ওর স্বামীর সন্তানের।

মানব বলে, জানাই ছিল। ধনদাসের ক্ষমতা আছে কোনো মেয়েকে মা করবার ?

তুমি বড়ো ভালগার মানব।

জগতের কত বৈজ্ঞানিককে ভালগার বললে খেয়াল করেছেন—উমাদা ? সুধার ব্যাপার থেকে আপনি যদি প্লট বানিয়ে গল্প-উপন্যাস লেখেন—লোকে বলবে রাম রাম, উমাবাবু শেষে সেই পচা পুরোনো একঘেয়ে গল্প লিখলেন ?—উমাবাবুর হয়ে এসেছে ! আমি লিখলে কিন্তু লোকে প্রশংসা করবে—বলবে, পুরানো পচা ব্যাপারটাকে নতুনভাবে তুলে ধরেছে বটে !

কী রকম !

মানব একটা ঢেঁকুর তোলে। বলে, খাওয়াটা বেশি হয়ে গেল মনে হচ্ছে। ম্যালেরিয়ায় কাবু করে দিয়েছে শরীরটা, খেতে পারি না।

একটা বড়ি খেয়ে যাও, ঠিক হয়ে যাবে।

বাড়ির দরজায় পৌঁছে কড়া নাড়তে হয় না, মুকুল দরজা খুলে দেয়।

মুকুল আর মা-কে রেখে পুতুলের দাদা অন্য সকলকে নিয়ে পাটনা ফিরে গেছে। উমাকান্তের বাড়ি ফেরার পথে সে যে চোখ পেতে রেখেছিল বিবাহিতা সতীসাধ্বী স্ত্রীর মতো—এটা উমাকান্তের সাথি মানবকে জানতে দিতে তার যেন আপত্তি নেই, লজ্জা নেই !

উমাকান্ত বলে, আমরা একটা গুরুতর ব্যাপার নিয়ে এ ঘরে বসে কথাবার্তা চালাব—ও সব কথা তোমার শোনা উচিত হবে না।

ফোঁস করে ওঠার জন্যই মুখ তুলেছিল মুকুল কিন্তু মানবের চোখের ইশারা নজরে পড়ায় সে ফুলে ওঠার বদলে মুখ বাঁকিয়ে বলে, আমার কী গরজ পড়েছে তোমাদের গুরুতর কথা শোনার ! ভোজ খেয়ে রাতদুপুরে বাড়ি ফিরলেন, ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে না ?

গটগট করে ও ঘরে চলে গিয়ে এঁটো বাসনপত্রে ইচ্ছা করে হোঁচট খেয়ে বনবন আওয়াজ তুলে যেন একেবারে ভেঙে ফেলতে চায়, এমনি জোরের সঙ্গে ও দিকের দরজা-জানালা বন্ধ করে সে আলো নিভিয়ে দেয়।

মানব উমাকান্তের কানে কানে বলে, ঠিক পুতুলদির মতো না ?

অবিকল !

শুয়ে পড়েনি। পুতুলদির মতো দরজার আড়ালে কান পেতে দাঁড়িয়ে আছে। একটু লজ্জা দেব উমাদা ?

থাক না ! যা বলছিলে বলো।

কিন্তু মানব কি তা পারে ? সে গলা চড়িয়ে বলে, অয়ি দরজার আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়ানো মুকুলদি—এক গেলাস জল দেবে ?

কোনো সাড়াশব্দ আসে না। মানব নিজে ও ঘরে গিয়ে আলো জ্বালায়। মুকুল ঘরে নেই। দরজার আড়ালেও নেই, মশারির তলে বিছানাতেও নেই।

মুকুলের মা গোটাকয়েক আলু-বেগুন-কাঁচকলা সিদ্ধ, আর ছটাক খানেক দুধ দিয়ে সবে একথালা পচাটে আতপ চালের ভাত গিলতে বসেছিল। মুখের কাছে নেওয়া গ্লাসটা নামিয়ে সে যেন একটু রাগতভাবেই বলে, মুকুল কলঘরে গেছে। ওর পেট ভালো না, সারাদিন কিছু খায়নি। তুমি বাবা এবার আমাদের পাটনা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা কর। এখানকার জলহাওয়া মেয়েটার সইছে না।

ভিজে কাপড়ে মুকুল এসে দাঁড়ায়, রেগে বলে, এত বাজে কথা কেন বলো মা ? বিশ্রী স্বভাব তোমার আবোল-তাবোল কথা বলার। পাটনাতেই বরং রোজ মাথা ধরত, এখানে এসে মাথা-টাথা ধরে না, বেশ ভালোই তো আছি !

উমাকান্তের লেখার ঘরে ফিরে গিয়ে মানব বলে, না, সব ব্যাপার ঠিক পুতুলদির মতো নয়। আমারই ভুল হয়েছিল।

উমাকান্ত বলে, পুতুলদির মতো নয় মানে ? তোমার পুতুলদিও ঠিক এ রকম করত। আমায় খোঁচা দিয়ে কেউ কিছু বললে সইতে পারত না—বাপ-মা আত্মীয়বন্ধু যেই বলুক। নিজে আমায় নিন্দা করত কিন্তু অন্যে আমার নামে কিছু বললে রাগে ফেটে পড়ত।

একটু রোগা ছিল মুকুল—ক-মাসে শরীরটা ফিরেছে। পুতুলের সঙ্গে চেহারার ওই তফাতটুকুই বোধ হয় ছিল, সেটাও ঘুচে গেছে।

বিদায় নেবার সময় সদর দরজায় দাঁড়িয়ে মানব বলে, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, খ্রিস্টের মতো, আরেক নতুন অবতার হতে পারবেন না—হয়ে দরকারও নেই। নিজেকে রক্তমাংসের লড়ায়ে মানুষ বলে ভাবুন না ? দেখছেন তো পুতুলদিকে খুন করেও ব্যাটারা আপনাকে উদাসী সন্ন্যাসী করতে পারে না। মুকুলদি এসে পুতুলদির স্থান পূর্ণ করে।

হে মহামানব, রাতদুপুরে উপদেশ ঝেড়ো না।

১৩

বছর খানেক অপর্ণার কোনো পাত্তা ছিল না। সুদূর দিল্লিতে একটা চাকরি বাগিয়ে চন্দ্রাদের স্কুলের মাস্টারি ছেড়ে দিয়ে আচমকা সে উধাও হয়ে গিয়েছিল।

আপনজনের কাছেও চিঠিপত্র সে লিখেছে খুব কম। ছোটোবড়ো কয়েকটা কাগজে তাব লেখা কিন্তু বেরিয়েছে অনেক। পড়েই বোঝা যায় লেখার ধরন সে একেবারে পালটে দিয়েছে।

বেশির ভাগ লেখাই বাংলার মেয়েদের সামাজিক অবস্থা আর ঘর-সংসারের ব্যাপার নিয়ে—যৌন বিষয়ে যে ক-টা প্রবন্ধ লিখেছে তাব মধ্যে সহজ বৈজ্ঞানিক সরলতার বদলে, রম্যতা ও সরসতা আনার দিকে ঝোঁক পড়েছে বেশি।

মহেশের সম্পাদনায় নূতন কাগজ বাব হয়েছে খবর শুনেই মহেশকে একটি পত্রাঘাত করে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে একটি লেখা পাঠিয়ে দেয। লেখাটির নাম সব মেয়ে পরাধীন।

মানব লেখাটা চেপে দেয়।

অপর্ণাকে মিষ্টি করে একখানা চিঠি লেখে। সোজাসুজি মিথ্যা কথা লিখে দেয় যে তার লেখাটি দু-একজন সাহিত্যিক বন্ধুকে পড়তে দেওয়ার ফলে এক উদ্ভট অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, লেখাটি নিয়ে লেখক-লেখিকা মহলে প্রচণ্ড একটা তর্কবিতর্কের সাড়া পড়ে গিয়েছে—চারিদিকে বিষম উত্তেজনা !

অপর্ণার লেখাটা পড়েই মানব তার মানসিক অবস্থা টের পেয়েছিল।

এক্ষেত্রে মিথ্যা কথা লেখায় দোষ হয় না। বানানো গল্প শুনিয়ে অসুস্থ শিশুব মন ভোলানোর মতো এ ক্ষেত্রেও লেখাটা ফেরত দেবার আঘাত হানার বদলে, বানানো কথা লিখে অপর্ণাকে খুশি করা অত্যন্ত উচিত কাজ। মহেশের কাগজ থেকে লেখা ফেরত যাবার অপমানটুকুই হয়তো চূড়ান্ত বিকারের মারাত্মক অবস্থায় ঠেলে দেবে অপর্ণাকে। কিছুই বলা যায় না। মিথ্যা হলেও মিষ্টিকথায় মন ভুলিযে কয়েক মাস কাটিযে দেওয়া যাবে। সেই অবসরে খোঁজখবব নিয়ে জানাও হযতো সম্ভব হবে যে অপর্ণার কী হয়েছে।

হরফের কাজে দিন কেটে যায়। সন্ধ্যার আগে সময় হয় না। অপর্ণার স্বামী প্রিয়নাথেব বাড়িতে পৌঁছতে রাত আটটা বেজে যায়।

বড়ো চাকুরে নয়, কিন্তু উপরি আয় প্রচুর। তাকে কিছু পাইয়ে দিয়ে নিজে কিছু পাবার জন্য এত লোক তার বাড়িতে যাতায়াত করে যে বড়ো বড়ো পদস্থ মানুষদের মতো সে ছাপানো স্লিপের ব্যবস্থা চালু করেছে—নাম লিখে চাকবকে দিযে ভেতরে পাঠিয়ে তাব সঙ্গে দেখা করতে হয়।

মানবের স্লিপ পেয়েই প্রিয়নাথ স্বয়ং নেমে এসে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তাকে ভেতবে নিযে যায়।

অপর্ণাব সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল, কিন্তু তার স্বামীর বাড়িতে মানবেব এই প্রথম পদার্পণ—ভুল করে যে স্বামীর সঙ্গে কয়েক বছরের জন্য বিচ্ছেদ ঘটেছিল অপর্ণার—এবং নিজের ভুল বুঝতে পেরে ভুল সংশোধন করে বছর দুই যে স্বামীর সঙ্গে বসবাস করে হঠাৎ অপর্ণা দিল্লিতে উধাও হয়ে গেছে।

সেকেলে দোতলা বাড়ি। মানুষ যেন গিজগিজ করছে বাড়িতে। দোতলায় উঠতে উঠতেই মানব টের পায় যে বাড়িতে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করা মানুষের ভিড়। প্রিয়নাথের ঘরে খাট আছে, সিন্দুক আছে, ভারী আলমারি থেকে শ্বেতপাথরের একটা ছোটোখাটো ডাইনিং টেবিলও আছ।

ওই টেবিলে সাজানো হচ্ছিল তার রাত্রির আহার—সাজাচ্ছিল একটি বিশ-বাইশবছরের বিধবা মেয়ে।

হৃষ্টপুষ্ট রম্যকান্তি প্রিয়নাথ বলে, খিদের সময় খেতে না পেলে শরীর বিগড়ে যায় ভাই। বড়ো ব্যাপারে এসেছেন নিশ্চয়, নইলে কি আর এই বাজে মুখ্যু লোকের ঘরে আপনার মতো নামকরা লেখকের পায়ের ধুলো পড়ে ! একসঙ্গে বসে যাই আসুন। খেতে খেতে কথাবার্তা চালিয়ে যাব।

মানব একটু দ্বিধার সঙ্গে বলে, হঠাৎ খাওয়ার সময় এলাম, খেলে টান পড়বে তো—আবার মেয়েদের রাঁধতে হবে। বাড়িতে সব তৈরি আছে, ফিরে গিয়েই খাবখন।

প্রিয়নাথ সশব্দে হেসে ওঠে !

খাবারের টান পড়বে ? চার গন্ডা বড়োমানুষ আর সাড়ে চার গন্ডা ছেলেপুলেব খ্যাট দুবেলা এ বাড়িতে তৈবি হয়। আপনি একটা মানুষ খেলেই টান পড়বে ? পাশে রুটি-মাংসেব দোকান নেই ?

মানব হেসে বলে, তবে বসি। বাড়িতে কখনও আসিনি বটে কিন্তু আপনি তো আর অজানা অচেনা মানুষ নন !

আমার খাওয়া দেখে কিছু মনে করবেন না কিন্তু। আপনারা খাওয়ার সুখ ছেড়ে লেখার সুখে মজেছেন। দুটো ভালো সন্দেশ খেলে আপনাদের চোঁয়া ঢেকুর ওঠে।

এক টেবিলে সামনাসামনি বসে গোড়ার দিকে প্রিয়নাথেব তুলনায় নিজের খাওয়া মিলিয়ে সত্যই মানব লজ্জা বোধ করে। লজ্জা তার কেটে যায় প্রিয়নাথের খাওযার বহর দেখে। প্রচুর তেল-ঘি দিয়ে রাঁধা কত রকমের ব্যঞ্জন, কত রকমের আমিষ আর কত রকমের মিষ্টান্নই যে, সে প্রায় রসে গিয়ে [illegible] গিয়ে পেটে বোঝাই দেয় !

প্রথম দিকে থালায় যা পৌঁছেছিল তাই ভেঙে খেয়েই মানবেব পেট ভরে গিয়েছিল। আর কিছু খাওয়া মানেই আত্মনির্যাতন।

তার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করেই নতুন নতুন খাদ্য তাব পাতে দেওয়া হয়—সে খুঁটে খুঁটে শুধু চেখে দ্যাখে। প্রিয়নাথ গোগ্রাসে চালিযে যায় তাব রাত্রির আহাব।

হৃষ্টপুষ্ট ভুঁড়িমোটা প্রিযনাথকে দেখে, তার খাওয়াব রকম দেখে একটা চাকরি বাগিয়েই অপর্ণার দিল্লি উধাও হওয়া এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেব নামে আবোল-তাবোল রম্যবচনা লিখে যাওয়াব ব্যাপাবে কিছুই আর বুঝতে বাকি ছিল না মানবের।

আঁচিয়েই সে বলে, এবার আমি যাই !

প্রিয়নাথ ব্যস্ত হয়ে বলে, পাঁচ মিনিট বসুন না— আসল কথা কী বলতে এসেছিলেন বলে যান !

মানব বলে, আসল কথা গুরুতব কিছু নয়। অনেক দিন অপর্ণাদিব খোঁজখবর পাই না, তাই জানতে এসেছিলাম ব্যাপার কী। অপর্ণাদি হঠাৎ দিল্লি পালিয়ে গেলেন কেন ?

প্রিযনাথও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, আমার ভয়ে।

আপনাদেব না সমস্ত ভুল বোঝার মীমাংসা হয়েছিল ? সমস্ত অমিল দূব হয়ে নাকি মিল হয়েছিল ?

কচুপোড়া হয়েছিল ! অত বেশি রকম মিল না হলেই বরং ভালো ছিল। নিজেব ভাবেই গদগদ, এমন ভাব করলেন যেন উনিই মস্ত ভুল করেছিলেন, সব ঝঞ্ঝাটেব দায় ওনার। তাই নিয়ে কাগজে আর্টিকেল পর্যন্ত লিখে ফেললেন। আমি ভাবলাম তাই বুঝি বা হবে--সাদাসিধে মুখ্যু মানুষ, আমি কি অত মনস্তত্ত্ব বুঝি ? ওনারই মত অনুসারে চলতে চেষ্টা করছিলাম—ও বাবা, তার কী রেজাল্ট! তলে তলে চেষ্টা করে দিল্লির চাকরিটা বাগিয়েই তল্পিতল্পা গুছিয়ে বিদায় নিলেন, যাবার সময় বলে গেলেন—তুমি একটা পশু, তোমার সঙ্গে ভদ্র মেয়ের ঘর করা পোষায় না।

প্রিয়নাথ হোহো করে হাসে।

হাকিমের কেমন বিচার দেখুন। নিজে রায় দিলেন, আমি বেচারা প্রাণপণে চেষ্টা করলাম সেই রায় মানতে—আর যাতে না ভুল হয়, আর যাতে না অমিল ঘটে। হাকিমের হুকুম মানতে গিয়ে হাকিমের কাছেই আমি হলাম পশু !

মুখখানা গম্ভীর ও বিষণ্ণ করে প্রিয়নাথ বলে, আরে ভাই, কত পুরুষ ধরে শিক্ষা পেয়ে এসেছি সংযম সেরা ধর্ম—রক্তে মিশে গেছে। উনি একেবারে কাগজে আর্টিকল লিখে ঘোষণা করলেন, ও সব ভুল ধারণা। আমিও ভাবলাম, তাই বুঝি হবে, উনি বুঝি আমার কাছে একটু অসংযম চান। সেটাই হয়ে গেল বোকামি—মেয়েদের কথা কি ব্যাটাছেলের কানে তুলতে আছে ? মেয়েলোকেরা মুখে এক রকম কাজে এক রকম।

প্রিয়নাথের আহারের দৃশ্য স্মরণ করে মানব মনে মনে ভাবে, এ মানুষটাও সংযমের গুণ গায় !

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কয়েকদিন মনটা বিষণ্ণ হয়ে থাকে মানবের, মেজাজটাও বিগড়ে যায়।

বেনাবনে মুক্তা ছড়ানোর এ কী উদ্ভট সাধ অপর্ণাদিদির ?

যে ক্ষেত্রে আপস ছাড়া গতি নেই, ছোটোবড়ো অনেক অমিল যে ক্ষেত্রে একেবারে স্বকীয়তায় নিহিত এবং অপরিহার্য—সে ক্ষেত্রে পরম প্রেমের চরম মিল ঘটানোর অসাধ্যসাধনের চেষ্টা করার কোনো মানে হয় ?

আগেই তার জানা উচিত ছিল এটা। পাঠশালার পড়ুয়ার মতোই জীবন যেন নিত্য নতুন পাঠ শেখাচ্ছে তাকে।

যতই বিকার আর বীভৎস বিভ্রান্তি থাক—চিরদিনের মতো আজও রক্তমাংসের দেহসর্বস্ব মানবতা শুদ্ধ ও পবিত্র। এই বিশ্বাস এই চেতনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হবার জন্যই সে ঘরে ফিরে স্নান করে দেহটাকে শুদ্ধ ও শীতল করে নেয়। কিন্তু এক লাইন লিখতে পারে না।

মাস খানেক আগে শুরু করা একটা গল্প শেষ করার জোরালো সংকল্প নিয়ে ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে কলম হাতে নিয়ে বসে সে শুধু চিন্তা করে যায় চেনা মানুষদের কথা—তার গল্পে ফাঁদা চাষির বউটি যেন কিছুতেই রক্তমাংসের জীব হয়ে কল্পনার রূপ নিতে চায় না !

কেন এত অনিয়ম ? কোন নিয়মে তার জানা চেনা জগতে এত অনিয়ম ঘটে চলেছে, কীভাবে কোন পথে তার প্রতিকার সম্ভব ?

নিজের ঘরের রান্না বেলাবেলি শেষ করে, মানব ঘরে ফিরলে, আত্তি তার রান্না শুরু করে।

তাকে চিন্তামগ্ন দেখে আত্তি মুখ বুজে থাকে। ভাত নামিয়ে তরকারি দেওয়া মাছের ঝোল রেঁধে সে প্রথম মুখ খোলে—ডিম সেদ্ধ করব একটা ? না মামলেট ভাজব ?

না, খিদে নেই।

আত্তি উঠে এসে বলে, কী হয়েছে শুনি ? ক-দিন ধরে কাগজে একটা আঁচড় কাটছ না, কলমটি হাতে ধরে চুপচাপ শুধু ভেবেই চলেছ ?

মানব একটু হেসে বলে, জোয়ান বয়েস, একলাটি আছি, কাজে মন বসছে না তো কী করব !

আত্তি হাসে না।—কই একলাটি আছ ? দোকলাই তো আছ দেখতে পাচ্ছি। না, আমি মানুষ নই ?

একটা জোয়ান মানুষের সঙ্গে এভাবে কথা বলিস, একদিন বিপদে পড়ে যাবি আত্তি !

আত্তি অত বিপদকে ডরায় না !

যেমন আচমকা নতুন চাকরি নিয়ে দিল্লি চলে গিয়েছিল তেমনই আচমকাই সে যে আবার চাকরি খুইয়ে দেশে ফিরে আসবে কেউ ভাবতে পারেনি।

এ কথাও কেউ ভাবতে পারেনি যে প্রিয়নাথের বাড়িতে না উঠে সে মহেশের বাড়িতে এসে আশ্রয় নেবে।

এই শহরেই তার ভাইয়ের বাসা আছে। ভাইয়ের বউয়ের খুব অসুখ—আজ মবে কাল মরে অবস্থা।

দিল্লি থেকে এসে সরাসরি ওখানে উঠলে লোকে অনায়াসে মনে করতে পারত যে গন্ডগোল কিছুই হয়নি—ভাইয়ের বিপদের সময় বোন সরাসরি ভাইয়ের কাছে গেছে।

কোনো খবর না দিয়ে মালপত্র নিয়ে একেবারে মহেশের বাড়িতে এসে ডেরা বাঁধা !

বলে কয়েই অবশ্য উঠেছে। কিন্তু বলা কওয়ার কী ধরন !

মালপত্র সমেত ট্যাক্সি বাড়ির সামনে থামিয়ে নিজে নেমে ভেতরে এসে বলে, কয়েকদিন থাকব ভেবে এলাম। আপনাদের আবস্থাও সুবিধের নয় জানি—দু-একদিনের বেশি বিনা খরচায় রাখতে চাইলে কিন্তু কেটে পড়ব। ছাঁটাই হয়েই এসেছি কিন্তু হাতে কিছু জমেছে—খরচপত্র নিতে হবে।

মন্দ্রা রেগে বলে, গেট আউট—এখুনি আপনি গেট আউট অপর্ণাদি। আপনি জানেন না যদ্দিন ইচ্ছা এ বাড়িতে থাকতে পারেন, আমরা খুশিই হব ? বাড়িতে ঢুকে এভাবে কথা কইছেন !

কী ভাগ্য যে মানব সে সময় হাজির ছিল ! মহেশের কোমরে চোট লাগার ব্যথাটা বাতের বেদনায় পরিণত হয়েছে, মাঝে মাঝে দু-একদিন সে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না এবং হরফের কাজের জন্য মানবকে তার বাড়িতে এসে অনেকক্ষণ কাটাতে হয়।

মানব না থাকলে মন্দ্রাই হয়তো অপর্ণাকে অপমান করে রাগিয়ে হোটেলে চালান করে দিত।

মানব প্রায় ধমকের সুরে বলে, সব ব্যাপারে ছেলেমানুষের ছ্যাবলামি করা উচিত নয় মন্দ্রা। উনি তো ঠিক কথাই বলেছেন ! সে সব দিনকাল কি আর আছে ! এ রকম সেকেলে ছেলেমানুষি করার জন্যই আজকাল আত্মীয়বন্ধুর মধ্যে ক্রমাগত বিচ্ছেদ ঘটছে দেখতে পাও না ?

অপর্ণা যেন প্রাণ ফিরে পায়। খুশি হয়ে বলে, শুনুন তো মেয়ের কথা ! আমি তিন-চারমাস থাকব বলে এসেছি, মহেশবাবুর এতকালেব চাকরিটা গেছে জানি, খবচ নেবেন কি না স্পষ্টাস্পষ্টি কথা না কয়ে আমি উঠতে পারি ওনার বাড়িতে ? খরচ নেবার কথা বলে আমি যেন ওদের অপমান করেছি !

মন্দ্রা কেঁদে ফেলতেই অপর্ণা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে—কাঁদিস নে। তিন মাস কেন, হয়তো ছ-মাস এক বছরও থেকে যেতে পারি।

পথের বেশ ছেড়ে একেবারে নেয়ে এসে মলয়ার নিরামিষ সস্তা ঘিয়ে ভাজা গরম গরম লুচি বেগুন ভাজা দিয়ে খেতে খেতে অপর্ণা নিজে থেকেই তার ব্যাপার বলে, পার্মানেন্ট পোস্ট, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ! একবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলে কাজ থেকে তাড়ানো কঠিন ব্যাপার। বড়ো বড়ো কয়েকজনের কথার ভাবে বুঝলাম, আমার মতো শিক্ষিতা নামকরা লেখিকা পাওয়াই যায় না—ঠিকমতো কাজ করে গেলে হয়তো একদিন আমার হাজার টাকা মাইনে হবে, ডিপার্টমেন্টটা আমিই চালাব। কয়েকটা মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে পট করে খেদিয়ে দিলে !

মানব বেগুন ভাজা বাতিল করে কয়েক চামচ ডাল দিয়ে মোটে দুখানা লুচি খেয়ে হাত গুটিয়ে বসেছিল।

অপর্ণার বলার ভঙ্গিতে সে সশব্দে হেসে ওঠে।

কাজের অভাব ঠেকা দেবাব জন্যই রস সাহিত্য ছাপা। কেমন যেন এলোমেলো উলটো-পালটা ভাব এসেছে এ মাসেব রস সাহিত্যের হরফ সাজিয়ে ছাপানোর ব্যাপারে। প্রেসের এখন সব চেয়ে খারাপ সময়—একটা ছাপার কাজ পেলে প্রেস যেন বর্তে যায়। বস সাহিত্যের কাজটাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু কী যেন একটা ব্যাপার চলছে তলায় তলায়।

সমস্ত হরফ সাজিয়েদের কেমন যেন রকমসকম।

উমাকান্ত ব্যাপাবটা ঠিক বুঝতে পারে না, ধরতে পাবে না, প্রেসেব কাজ দেখা আর সম্পাদকীয় দায়িত্ব নিয়ে চেয়ারে বসে তার অস্বস্তির সীমা থাকে না।

যথানিয়মে প্রথমে শুধু লাইন আর ফাঁক ঠিক রেখে সাজানো হরফের লম্বা লম্বা গেলি প্রুফ তৈরি হয়। ওই প্রুফ সংশোধন করা শেষ হলে তৈরি হয় পাতায় পাতায় ভাগ কবা মেকআপ · নাম পৃষ্ঠাসংখ্যা ইত্যাদি যোগ হয়। মেকআপ, প্রুফ সংশোধন শেষ হলে তবেই সাজানো সিসার হবফগুলি মেশিনে ওঠে।

কাগজের এক পৃষ্ঠায় ছাপা আরম্ভ হতেই একটা শিট চলে যায় উমাকান্তের কাছে। সে চোখ বুলিয়ে দেখতে থাকে যদি কোনো মারাত্মক ভুল চোখ এড়িয়ে গিয়ে থাকে, যদি কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি ঘটে থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে মেশিন বন্ধ করে সেটা সংশোধন করে ফেলা হবে।

শিটগুলির অন্য পৃষ্ঠা ছাপাবার বেলাতেও একই নিয়ম। মেশিনে চড়া রস সাহিতোব ছাপা পাতার নমুনা পরীক্ষা করে উমাকান্ত দ্যাখে যে সব ঠিকই আছে।

তবু তার মন খুঁতখুঁত করে। তবু তাব সন্দেহ ঘনীভূত হয়।

শুধু রস সাহিত্যের ফর্মাগুলি মেশিনে ওঠা আর ছাপা হওয়ার ব্যাপাবে কেমন যেন একটা অভিনবত্ব এসে গিয়েছে।

ফাঁকে ফাঁকে রস সাহিত্য ছাপিয়ে নেবার নিয়মের গোলমালটাকে কেন্দ্র করেই যেন প্রেসেব সমস্ত কাজের নিযম-শৃঙ্খলায় একটা অদ্ভুত রকম এলোমেলো ভাব দেখা দিয়েছে।

উমাকান্ত উদ্‌বেগের সঙ্গে বলে, ব্যাপার কী কালাচাঁদ ?

কালাচাঁদ ধীরভাবে বলে, গোলমাল তো কিছুই হচ্ছে না বাবু !

শঙ্করবাবুর অঙ্কের বইয়ের ফর্মাটা মেশিনে না তুলে মাসিকের ফর্মা ছাপছ কেন ?

শঙ্করবাবুর ফর্মাটা ছাপা যাবে না, অনেক ভুল রয়ে গেছে।

উমাকান্ত আশ্চর্য হযে বলে, সে কী ! উনি নিজে এসে প্রুফ দেখে প্রিন্ট অর্ডাব দিযে গেলেন না ?

কালাচাঁদ ডাকতেই প্রুফটা নিয়ে এসে ভুবন বলে, প্রিন্ট অর্ডার তো দিয়ে গেলেন। কিন্তু এত ভুল নিয়ে ছাপলে উনিই আবার গোলমাল করবেন—প্রেসেব বদনাম হবে। বলেন তো যেমন আছে ছেপে দিতে পারি।

উমাকান্ত এক মুহূর্তের জন্য ভোলে না যে তাদের প্রতিটি কথা ধনদাস কান পেতে শুনছে। প্রেসের সুনামের জন্য ভুবন ও কালাচাঁদের দরদ থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয—প্রেসের বদনাম হলে, কাজ না পেলে তাদেরই খেটে খাওয়ার পথ বন্ধ হবে !

তবু সমস্ত ব্যাপারটা তার অস্বাভাবিক মনে হয়।

ভুবন প্রুফের কয়েকটা ভুল দেখিয়ে দিলে তার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। এই ভুলগুলি শঙ্করবাবুর চোখ এড়িয়ে গেল ?

অথচ এটা যে তারই দেখা প্রুফ তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। প্রুফের মাথায় ইংরাজিতে সযত্নে 'সংশোধন করে ছাপো' লিখে তলায় শঙ্কর নাম স্বাক্ষর করেছে।

উমাকান্ত অগত্যা বলে, তাইতো দেখছি। না, ওঁকে একবার না দেখিয়ে এটা ছাপা যায় না।

প্রুফটা আগাগোড়া পড়ে উমাকান্ত প্রায় হতভম্ব হয়ে যায়। শিক্ষক মানুষ, পণ্ডিত ব্যক্তি, এই নাকি তার নিজের লেখা সংশোধন করার নমুনা ? এই সহজ সাধারণ ভুলগুলি তার নজর এড়িয়ে গেল ?

স্কুলের ছুটির পর টিউশনি করতে যাবার পথে শঙ্কর প্রেসে আসে।

উমাকান্তের কথা শুনে এবং প্রুফে ভুলের নমুনা দেখে সেও খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকে। তারপর নিশ্বাস ফেলে বলে, তা আর আশ্চর্য কী। দিনরাত যে খাটুনি চলছে, পাগল যে হয়ে যাইনি তাই ঢের।

আবার সযত্নে প্রুফটা সংশোধন করে শঙ্কর চলে যাবার পর সংশোধনগুলি দেখতে দেখতে হঠাৎ যেন উমাকান্তের চমক ভাঙে। সে হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না।

একবার খেয়াল করার পর পরীক্ষা করে দেখে ব্যাপার বুঝতে আর দেরি হয় না। যে ভুলগুলির জন্য ফর্মাটা মেশিনে আঁটা যায়নি, তার প্রত্যেকটি শঙ্করের দেখা প্রুফে প্রেসের সৃষ্টি করা ভুল।

সোজা ব্যাপার।

সুবিধামতো স্থানে আলগা হরফের ছাপ দিয়ে শুদ্ধ শব্দকে অশুদ্ধ করা হয়েছে,- এখন কে 'ত্রিখনা' করতে দরকার শুধু গোড়ায় আর শেষে ই কার ও আকারের ছাপ লাগিয়ে দেওয়া। প্যারার শেষে ছোটো লাইনের দাড়িটা একটা হরফে পরিণত করে একটি বাড়তি ও অনাবশ্যক শব্দের ছাপ দেওয়াও কঠিন নয়।

কিন্তু মানে কী এ ব্যাপারের ? কী উদ্দেশ্য, মেশিনে আঁটা বন্ধ রাখার অজুহাত সৃষ্টি করতে, সংশোধিত প্রুফে ভুল সৃষ্টি করার ? সকলে মিলে পরামর্শ করে না করলে তো এ কাজ সম্ভব নয়।

ওদিকে ঘটাং ঘটাং শব্দে চলেছে মুদ্রাযন্ত্র, এদিকে মানুষগুলি নিঃশব্দে সাজিয়ে বা সংশোধন করে চলেছে হরফ।

উমাকান্তের মনে হয় কী একটা রহস্য যেন তাকে ঘিরে আছে। সমস্ত কাজের হিসাব তার জানা, তবু তার মনে হয় তার অগোচরে অতিরিক্ত একটা কাজ চালিয়ে, বেশি রকম ব্যস্ত আর মনোযোগী হয়ে উঠেছে প্রেসের মানুষগুলি।

চারিদিকে একটু চোখ বুলিয়ে আসার উদ্দেশ্যে উমাকান্ত ওঠে, একে ওকে দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে, মেশিনঘরে গিয়ে বস সাহিত্যের একখানা ছাপা শিট তুলে নিয়ে চেয়ারে ফিরে আসে।

খেয়ালের বশে নয়, কিছু ভেবেও নয়। গতবার বস সাহিত্যের দুটি ফর্মা ছাপতে ছাপতে শেষের দিকে কালির গোলমালে ছাপা ভালো হয়নি।

ওই দোষটা ঘটছে কি না দেখবার জন্যই সে ছাপা শিটটা হাতে তুলে নিয়েছিল, লেখার দিকে এক নজর তাকিয়েই নিঃশব্দে নিজের চেয়ারে ফিরে এসেছে। শঙ্করের এই ভুল সৃষ্টি করার চেয়ে সাংঘাতিক আরেকটা ভৌতিক ব্যাপারের নমুনা দেখবার জন্য।

একনজর তাকিয়েই সে টের পেয়েছে যে এটা তার সংশোধিত এবং অনুমোদিত বস সাহিত্যের ফর্মা নয়।

চেয়ারে ফিরে এসে সে আগাগোড়া ফর্মাটা পড়ে। নামকরা লেখকদের একটা উপন্যাসের অংশ, একটা ছোটো গল্প এবং নামকরা কবিদের তিনটে কবিতা যাওয়ার কথা এই ফর্মায়।

একটা লেখাও নেই।

রস সাহিত্যের নাম, মাস, বছর ও পৃষ্ঠা-সংখ্যাটাই শুধু বজায় আছে, অন্য লেখা ছাপা হয়েছে অজানা লেখকের ! এবং যা ছাপা হয়েছে সেগুলি ভয়ংকর।

উমাকান্ত ভাবে এবং আরেকবার ফর্মাটা পড়ে।

সে টের পায় যে সমস্ত প্রেসটা প্রায় শ্বাসরোধ করে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সে আরেকবার মেশিনঘরে যায়।

ঘটাংঘটাং শব্দে মেশিন চলছে ঠিকই—কিন্তু কাগজ আর জোগান দেওয়া হচ্ছে না যন্ত্রটায়। ধনদাসের কানে আওয়াজ দেওয়া হচ্ছে যে যন্ত্র ঠিকই চলছে।

ছাপা বন্ধ হয়েছে তার জন্য। তার সম্পাদিত রস সাহিত্যের পালটিয়ে দেওয়া ফর্মা সে নিয়ে গেছে, পড়ে দেখে এখন সে কী বলে কী করে !

উমাকান্ত দ্বিধা করে না, শান্তকণ্ঠে বলে উঠে, মিছিমিছি চালাচ্ছ কেন মেশিনটা ? ছাপিয়ে যাও না ?

সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রে কাগজ দেওয়া শুরু হয়। ছাপা কাগজ বেরিয়ে এসে জমতে থাকে।

শুধু অন্য রকম পরিবর্তন হয়, কালাচাঁদের মধ্যে যে একটা শান্ত নির্ভয় মরিয়া ভাব এসেছে, তারও নানা লক্ষণ প্রকাশ পায়।

আত্তি অনুযোগ দিয়ে বলে, বাবার ব্যাপারটা কী ? লেখক করতে চেয়ে বাবাকে পাগল করে দিতে চাইছ নাকি মানুবাবু ?

মানব বলে, ওর ভাব-সাব আমারও যেন কেমন কেমন লাগছে আত্তি। রাত্রিতে আমার এখানে এসে পড়ছে না, সকালে নিজের ল্যাম্প জেলে লিখছে না। কেমন একটা গুমগুম ভাব।

বিড়ির দোকানের মন্টার সাথে মোকে লটকে দেবার ফিকিরে ছিল। গাঁজা চরস খেয়ে ব্যাটার যক্ষ্মা কাশি হবে। সোজা বললাম, বেরিয়ে যাব। গালে চড় যা একটা কষিয়ে দিলে মানুবাবু—

চড়ের দাগ পড়েছে গালে। একটু ফুলেছে গালটা।

হাসিটা অদ্ভুত দেখায় আত্তির। বাপের এমন চড় খেয়েও সে যে হাসতে পারে সেটাও অদ্ভুত ব্যাপার বইকী !

যার তার সাথে লটকে দেবার কথা কিন্তু বলছে না আর।

মানব বলে, ভাবিস কেন, বাজে লোকের কাছে দিতে চাইলে আমিই তোকে বিয়ে করে ফেলব। কিছু রোজগার করছি, তোকে খাইয়ে পরিয়ে পুষতে পারব।

মাথা প্রায় মেঝের কাছে নত করে স্থির গলায় আত্তি আবার বলে, প্রাণ থেকে যদি চেয়েই থাকো মোকে, দুমাস, এক বছর নিয়ে নাও। সাধ মিটিয়ে ছেড়ে দিয়ো।

মানব বলে, তোর একটা গালে কালশিটে পড়েছে, তোর বাপের চেয়ে বড়ো চাপড়ে এ গালটার কালশিটে ফুটিয়ে দিই ?

দাও। তুমিও তো বাবার মতোই অবুঝ !

কুঞ্জর মা-র ভাইঝি পদ্মার বয়স চোদ্দো হলেও হতে পারে। কাজ সেরে ঘরে ফিরে কালচাঁদ আত্তির সেঁকা রুটি খেয়ে মানবের ঘরে আধঘণ্টা পড়া চালিয়ে কুঞ্জর মা-র কুঁড়েয় যায়।

একখানা ঘর কুঞ্জর মা-র। দাওয়ায় একটু বসেই কালাচাঁদ প্রকাশ্যভাবে ঘরে যায়। সারারাত ওই ঘরেই থাকে। কুঞ্জর মা রোয়াকে কাঁথা বিছিয়ে শুয়ে খানিকক্ষণ মশার কামড়ে ছটফট করেও অচেতন হয়ে ঘুমায়।

মশার কামড় অবশ্য ঘরেই বেশি। তিন বাড়ি ঝি খেটে এসে কুঞ্জর মা চিরদিনই দাওয়ায় শোয়।

প্রাণটা জ্বলে যায় মানবের, মেয়েরা কেন এত সস্তা এ দেশে ? প্রাণের জ্বালা বাড়তে বাড়তে একসময় লেখা শুরু করে দেয় চাষি বউয়ের গল্পটা।

আত্তি এসে বলে, খাবে ?

সে মুখ না তুলেই বলে, না।

রাত গভীর হয়ে আসে। পাড়া নিঝুম হয়ে গেছে বহুক্ষণ। মাঝে মাঝে চিৎকার খনখনিয়ে উঠছে খেঁকি কুকুরগুলির। আত্তি আবার একটু ভয়ে ভয়ে বলে, এবার খাও ? এবার শুয়ে পড়ো ? সকাল থেকে খাটছ তো ! কাগজ থেকে মুখ না তুলেই মানব বলে, একটু দাঁড়া।

লেখা পৃষ্ঠায় এক-বার চোখ বুলিয়ে, ডগা থেকে তলা পর্যন্ত কলমের আঁচড় চেনে সবটা বাতিল করে দিয়ে মুখ তুলে মানব বলে, এবার টের পেয়েছি। খেটেখুটে বেশ কিছু পয়সা কামাচ্ছি বলেই তো এত দরদ ?

আত্তি বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলে, দোষটা কী হয়েছে তাতে ? মেয়েরা কি রোজগেরে ? নিজেদের ভাতকাপড় কি তারা কামায় ?

যে পুরুষ রোজগার করে, তাকে দরদ করেই মেয়েরা ভাতকাপড় কামায়।

শুধু দরদ ?

বাবারে বাবা -এমন ছেলেমানুষ কি জগতে গজায় ? বলেই তো দিয়েছি শুধু দরদে সাধ না মেটে, দু-এক ঘা মারলেও সয়ে যাব। সবাই সইছে না ? মোর বেলা কি অন্য নিয়ম হবে ! তবে কি না, কথাটা কী—

আত্তি মাথা নিচু করে একটু হেসে বলে, শখ মিটলে ছেড়ে দিয়ো, তিতো করে দিয়ো না। ছাড়তে হবে বলে সম্পোর্কটা বিচ্ছিরি করে তুলো না।

আমায় এমন ছোটোলোক ভাবতে পারিস আত্তি ?

ভদ্দর ঘরের ছেলে কি না তাই জন্যেই ভয়। ঝোঁকের মাথায় ছোটোলোকের মধ্যি এসে দিন কাটাচ্ছ। মোরা ছোটোলোকেরাও নিয়মকানুন মেনে চলি তো এক রকমের ? তোমাদের ঝোঁকের জন্য তাই তোমাদের ভয় পাই। এত রাতে খেতে বলতে দরদ দেখাতে এয়েছি ছোটোলোক মেয়েলোক— কিছু না বুঝেই কি এয়েছি ?

সকালবেলা কালাচাঁদ তার তিন নম্বর গল্পটি মানবের হাতে তুলে দেয়। এ গল্পের নামও হবফ।

মানব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে, কখন লিখলে ? ভোরবাত্রে আলো তো জ্বলতে দেখি না তোমার ?

কালাচাঁদ মাথা নেড়ে বলে, ভোরবাত্রে উঠি না আর—ভোরেই উঠি। অত নিয়ম করে মোদের লেখা পোষায় না মানুবাবু। ফাঁকফোকরে লেখাই মোদের সুবিধে। রবির দোকানে চা খেতে গিয়ে বসলাম, আধঘণ্টা লিখে ফেললাম—

আশুর মা মারা যাবার পর কালাচাঁদের মধ্যে যে অদ্ভুত রকম পরিবর্তন ঘটছে টের পাওয়া যাচ্ছিল, এখন অনেক বেশি স্পষ্ট হয়েছে।

মরিয়া ভাব এসেছে সত্যই কিন্তু তার চেয়েও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একটা কঠোর নির্বিকার ভাব। ঠিক শোক বা বৈরাগ্য নয়, সব ব্যাপারে তার একটা কঠিন সংকল্পগত উদাসীনতা—সে যেন ইচ্ছা করে চেষ্টা করে সব কিছু অগ্রাহ্য করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে। শুধু কথাবার্তা বলার ধরন আর চালচলন থেকেই ধরা পড়ে না, তার মুখেও একটা কঠিন আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ পড়েছে।

বলে, ফুটপাতে ভিড়ের মধ্যে বসে আমি লিখতে পারি।

এমন সহজ দৃঢ়তার সঙ্গেই সে কথাটা বলে যে, মানব সত্যই আশ্চর্য হয়ে যায়।

মানব বলে, তুমি এমন লেখক হয়ে উঠেছ কালাচাঁদ ?

কালাচাঁদ সগর্বে বলে, আপনারাই তালিম দিয়ে তৈরি করেছেন।

আরও কয়েকটা কথার পর মানব তাকে জিজ্ঞাসা করে, আত্তির বিষয় কী ভাবছ কালাচাঁদ ?

কিছুই ভাবছি না মানুবাবু ! আমার ভাবার দরকার নেই।

বাপ হয়ে এ কথা বলতে পারলে ? একটা হিল্লে তো করে দিতে হবে—না এভাবে তোমার ভাত রেঁধে জীবন কাটিয়ে দেবে ?

কালাচাঁদ শান্তভাবে বলে, যা করার নিজেই করে নেবে। বড়ো বেশি সেয়ানা হয়ে গেছে, স্বাধীন হয়ে গেছে। যা করতে যাব তাতেই মন্দ হবে—তার চেয়ে মোর কিছু না ভাবা, না করা ভালো।

তুমি না একদিন আমাকে ওর সঙ্গে বেশি কথাবার্তা কইতে বারণ করেছিলে ?

সেদিন কি আর আছে মানুবাবু ? টের পেয়েছি সেয়ানা মেয়ে, নিজের ভালো মোর চেয়ে ঢের বেশি বুঝবে। যেমন-তেমন একটা বিয়ে দিয়েই বা কী হবে বলুন ? একটা রোগে ধরবে আর মায়ের মতো বিনা চিকিচ্ছেয় পটল তুলবে। বিয়ে বসতে চায় বিয়ে দেব— না বসতে চায় দেব না। এমনি কারও সাথে থাকতে চায় থাকবে—বারণ করব না। ছোটো থাকলে কথা ছিল, এখন ওর ভালো, ওর চাইতে কেউ ভালো বুঝবে না-- ওর বাপও না !

কী দাঁড়িয়েছে সেই কালাচাঁদের চিন্তা করা কথা বলার ধরন !

পদ্মর সর্বাঙ্গে মাতৃত্বের ছাপ মানবেরও চোখে পড়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, নিজেদের মধ্যে কানাকানি করা বা টিটকারি দেওয়া দূরে থাক—তেমনভাবে হাসাহাসিও কেউ করছে না। এ যেন সাধারণ স্বাভাবিক ব্যাপার।

খুব খারাপ লাগছে আত্তি ?

না না, খারাপ লাগবে কেন ? মেয়েটা বোকাসোকা—কিন্তু ভালো। সৎমা হয়ে এলে কী আসবে যাবে মোর ? মোকে না খেদিয়ে ওকে ধরে আনবে না গোঁ ধরেছে কিনা, সেটাই হয়েছে মুশকিল !

মানব কলম রাখে। আত্তির সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে গম্ভীর সুরে বলে, চিরকাল বাপের ঘাড়ে থাকবি ভেবেছিস নাকি ? এবার চটপট তোকে খেদাতেই হবে।

ঘাড়ে নেবার জন্য কতজন পাগল। কিন্তু পছন্দমতো একজনার ঘাড়ে চাপব তো ? বাবা চাইছে বুড়ো ভোলানাথের খপ্পরে সঁপে দিতে।

বুঝেছি। তোকে নেবে ভোলানাথ, পদ্মকে নেবে কালাচাঁদ। তা পদ্ম তো একটা বাচ্চা বিইয়ে কালাচাঁদের ঘরে আসছে—তুইও একটা বাচ্চার মা হয়ে ভোলানাথের ঘরে যা !

সর্বাঙ্গ টান হয়ে যায় আত্তির।

বিয়ে না করে মা করার সাহস আছে নাকি ব্যাটাছেলে তোমাদের ? তোমাদের শুধু আলগা আদর, গা বাঁচিয়ে চলা !

মানব নীরবে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

আত্তির সম্পর্কেই একটা চাঞ্চল্যকর প্রশ্ন মনে জেগেছে।

সত্যই কি তার সঙ্গে দু-একবছর বসবাস করার সাধ জেগেছে আত্তির ? হিসাবনিকাশ করে সে কী দেখেছে যে, প্রাণের সাধটা কোনো কিছুর খাতিরে অপূর্ণ রাখা বোকামি ? চিরকাল বইবার দায় মানবের ঘাড়ে চাপানো যায় না, অনেক দিক দিয়েই সেটা অসম্ভব।

অসম্ভবের খাতিরে সম্ভবটুকু বিসর্জন দিয়ে লাভ কী ?

আত্তি জানে মানব তাকে চায়—চিরজীবনের সাথি হিসাবে নয়, কোনো রকম বাধ্যবাধকতার মধ্যে নয়, কিন্তু তাকে চায়। চিরকালের জীবনসঙ্গিনী করতে পারবে না বলেই, বাধ্যবাধকতা

স্বীকার করা যাবে না বলেই সেদিন সর্দিজ্বরের সময় আদা-চা দিতে এলে, ঝোঁকের মাথায় তাকে জড়িয়ে ধরে তার কাছে থেকে মৌখিক একটু প্রতিবাদ পর্যন্ত না পেলেও, নিজেই তাকে ছেড়ে দিয়েছিল।

সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরে তার কাছে ক্ষমা পর্যন্ত চেয়েছিল !

আভাষে ইঙ্গিতে এবং ব্যবহারেই শুধু নয়, আত্তি প্রায় স্পষ্ট ভাষায় মুখ ফুটেই তাকে জানিয়ে দিয়েছে . চিরজীবনেব জন্য নয় গো নয়, সাধ হলে দু-একবছরের জন্যই আমায় নাও—খুশি হলেই ছেড়ে যেয়ো !

আত্তির হিসাব মানব বোঝে। অতি সহজ আর বাস্তব হিসাব। গতি তার একটা হবেই। কালাচাঁদ মরিয়া হয়ে যার-তার হাতে তাকে সঁপে দিলে যে গতি হবে, মানবের সঙ্গে কিছুদিন বসবাস করার পরের গতিটা তার চেয়ে মোটেই কিছু মন্দ হবে না। তাছাড়া অনেকেই ধরেই নিয়েছে যে মানবের সঙ্গে সে নষ্ট হয়েই গেছে। প্রকাশ্যে একসাথে বসবাস করলে ক্ষতিটা কী হবে ? এই বাড়িরই একটা ঘবে সাত বছর ওভাবে বসবাস করছে না, বটুক আর গঙ্গা ?

পদ্মকে যথাবিধি ঘরে আনা জরুরি হয়ে পড়েছে। কালাচাঁদ কবে তাকে গায়ের জোরে কার সঙ্গে লটকে দেয় ঠিক নেই।

মানবের সঙ্গে এখন নষ্ট হলেই সব দিক দিয়ে মঙ্গল আত্তির। মানব কিন্তু আঁকড়ে আছে তার নীতিজ্ঞান। আত্তিকে নষ্ট করার ঝোঁক আছে জোরালো, কিন্তু সাহস নেই।

সে যে ভাবী অন্যায় কাজ হবে ! বিয়ে করতে না চাইলে, আজীবন নিজের ভোগ দখলের খাস তালুকেব মতো নিতে না পারলে, কোনো মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকানোই যে যুবকের পক্ষে মহাপাপ !

আত্তি তাই সোজাসুজি মুখের ওপর তাকে ভীরু কাপুরুষ বলে গাল দিয়েছে।

পদ্ম মা হবে। তবু সবাই নিশ্চিন্ত যে আতুড়ে যাবার দু-চাবদিন আগেও অন্তত কালাচাঁদ তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে, সামাজিকভাবে বউ করে ফেলার ব্যবস্থা করে ফেলবে।

আত্তি তাকে প্রায় স্পষ্ট ভাষায় অভয় দিয়েছে যে মা হতেও সে পিছপা নয়, সে মা হলেও মানবের কোনো দায় নেই। বিনা শর্তে সে পিরিত করতে রাজি, মা হবার ঝুঁকি নিতেও রাজি—পিরিত করার সাধ নিয়েও তাকে এড়িয়ে চলা ভীরুতা, কাপুরুষতা !

সন্ধ্যার পর ঘরে ফিবে মানব দ্যাখে, তার ঘবটুকুতে ঝাঁট পড়েনি, বাঁশের খাটিয়ার তার বিছানাটা পাতা হয়নি, কুঁজোতে জল তুলে রাখা হয়নি, ছোট্ট তোলা উনুনটিতে আঁচ পড়েনি।

তার বালিশের তলা থেকে তারই পযসা নিয়ে কয়েকটা আলু, পেঁয়াজ, একজোড়া ডিম, ছটাক খানেক তেল, ছোটো একটা পাউরুটি—এ সবও কেউ এনে রাখেনি।

বাতিটাতে তেল ভরা হয়নি। ঘণ্টা খানেকের বেশি জ্বলবে না। বোতলে তেল নেই।

জামাকাপড় ছেড়ে নারকেল-দড়ি বেঁধে ঝুলানো বাঁশের আলনায় সেগুলি রেখে মানব লুঙ্গি পরে ভাবছে আগে সওদা করতে যাবে না আগে বালতিতে তোলা জলে কাকস্নানের বিলাসিতাটা চুকিয়ে নেবে—

বালতির দিকে তাকিয়ে দ্যাখে এক-আঁটা জলও নেই !

রোজের মতো কলতলায় ঝগড়াঝাঁটি মারামারি করে এক বালতি জলও কেউ আজ তার জন্য তুলে রাখেনি।

এটা আত্তির স্পষ্টতম বিদ্রোহাত্মক ঘোষণা : আর চলবে না টালবাহানা ! এতকাল আমি তো সত্যিকারের দাসীগিরি করিনি—করব না আর কাজ ! দাওনি এক পয়সা। গা বাঁচিয়ে অত খাতির আব চলবে না !

মানব বিচলিত হয় না, মনে মনে হাসেও না। শাড়িজামা কিনে এনে সে ফেলে রাখে তার খাটিয়ায়—তার জিনিসপত্র আনতে তাকে জিজ্ঞাসা না করে বালিশের তলা থেকে টাকাপয়সা নেওয়ার মতো শাড়িজামাও আত্তি তুলে নিয়ে যায়। কিনে নিয়ে আসে দু-চারসের বাড়তি চাল। চালের ঠোঙাও আত্তি জিজ্ঞাসা না করেই তুলে নিয়ে যায়।

মানবকে তার বলাই আছে যে নিজের দরকারে দু-চার আনা দু-একটাকা সে নেবে—তবে মাসে চার-পাঁচটাকার বেশি যাতে না হয় সেটা খেয়াল রাখবে।

আজ আত্তি জানিয়ে দিয়েছে, এও তো এক রকম মাইনে নিয়ে ঝি-গিরি করা ! ঝিয়ের কাজ সে করবে না মানবের। শুধু এইটুকু দায় নিয়ে আর চলবে না। এবার তাকে আশ্রয়, খাওয়াপরা, সব কিছু দিতে হবে, নইলে চুকে যাক এই ফাঁকির সম্পর্ক !

মানব ভেবে-চিন্তে একবার উমাকান্তের বাড়িতে যায়। উদ্দেশ্য —কালাচাঁদের মরিয়া একরোখা ভাবটার জন্য কোনো লক্ষণ তার নজরে পড়েছে কি না জেনে আসা।

উমাকান্ত বলে, কালাচাঁদ ? ওর ভাবসাব সাংঘাতিক ! যা কাণ্ড আরম্ভ করেছে বলার নয়।

মানব গম্ভীর হয়ে বলে, তাই নাকি ! কী রকম ব্যাপার ?

তোমায় বলে আবার ব্যাপার কী দাঁড়াবে কে জানে !

আমায় ও রকম চ্যাংড়া ভাবেন ?

চ্যাংড়া তোমায় কোনোদিন ভাবিনি, মিছে কথা বোলো না। মুশকিল হল কী জানো ? তুমি হৃদয়টাকে মানো না—প্রাণের আবেগে কেউ কিছু কাণ্ড করে নিজের ক্ষতি করতে চাইলে প্রাণপণে সামাল দেবার চেষ্টা করো। কালাচাঁদকেও হয়তো বাঁচাবার চেষ্টা করবে !

মানব জাঁকিয়ে বসে। পুতুলকে যেভাবে ডাকত তেমনিভাবে গলা চড়িয়ে মুকুলকে ডেকে বলে, মুকুলদি, চা দিয়ে যাও। ব্যাপার তবে সত্যি গুরুতর ? তাহলে অবশ্য ব্যাপার না জেনে উঠব না।

কালাচাঁদের ভাবান্তর, নিজের মেয়ের সম্পর্কে তার বেপরোয়া উদাসীনভাব, তার তিন নম্বর হরফ গল্প লেখা—কালাচাঁদ সম্পর্কে এ সব বিবরণ সে ধীরে ধীরে উমাকান্তকে শুনিয়ে যায়।

মুকুল চা এনে দিয়ে বলে, এ সব কী শুনছি ? বস্তির মেয়েদের সঙ্গে নাকি খুব ভাব জমেছে ?

মানব বলে, বাস করব বস্তিতে—তোমার সঙ্গে ভাব করতে আসব নাকি মুকুলদি ?

আপনি আমায় মুকুলদি বলবেন না তো ! আপনার চেয়ে আমি আট-দশবছরের ছোটো।

ছোটো হলে কী হবে ? বুড়ো বাপ দশ বছরের সৎমা ঘরে আনলে ত্রিশ বছরের ছেলে তাকে মা বলবে না ? একদিন তো মুকুলদি বলতেই হবে—এখন থেকে অভ্যাস করে রাখছি।

মুকুল প্রায় ছুটে পালিয়ে যায়।

উমাকান্ত আশ্চর্য হয়ে বলে, তোমার তো সাংঘাতিক অনুমান শক্তি ! কেউ যা জানে না, ঘুণাক্ষরে যা প্রকাশ করা হয়নি, তুমি দিব্যি তা অনুমান করে ফেললে !

মানব সস্মিতভাবে বলে, চল্লিশে পা দিলে কী হবে—আপনি এখনও ছেলেমানুষ রয়ে গেছেন। এই সোজা ব্যাপারটা অনুমান করা কি কঠিন হয় কারও পক্ষে ? শুধু মা আর মুকুলদিকে আপনার কাছে রেখে মনোহরবাবু সবাইকে নিয়ে পাটনা ফিরে গেলেন। আপনি অনুমতি না দিলে এটা সম্ভব হত ?

উমাকান্ত একটু ভেবে বলে, যাকগে, তোমার কাছে গোপন করব না। কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেছে, আমিই শুধু ছ-মাস আট মাস দেরি করে অনুষ্ঠানটা করতে বলেছি। বউ মরার এক বছরের মধ্যে আমার বিয়ে করলে লোকে নিন্দে করে।

এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে মানব বলে, কালাচাঁদের ব্যাপারটা বলুন !

উমাকান্ত তার দিকে একটু ঝুঁকে নিচু গলায় বলে, ধনদাসের ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়বার জন্য কালাচাঁদ ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে।

ষড়যন্ত্র !

রীতিমতো ষড়যন্ত্র। প্রেসের অন্য লোকেরাও ওর সঙ্গে আছে। আমি যে টের পেয়েছি এটা সবাই জানে। চুপ করে আছি দেখে ওরাও কিছু বলছে না। ধরে নিয়েছে যে আমি জেনেও কিছু বলব না।

মানব চুপ করে শুনে যায়। এ সব ভূমিকা না করে আগে আসল ব্যাপারটা বলে নিলে কথাগুলির মানে বোঝা যে তার পক্ষে সহজ হত—উমাকান্তকে সেটা জানিয়ে কোনো লাভ নেই। এটাই হল তাব গল্প-উপন্যাস লেখারও কায়দা ! আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়ে আগে সে কৌতূহল সৃষ্টি করে নেয়, তারপর আসল ঘটনার বিবরণ দাখিল করে।

উমাকান্ত ধীবে ধীরে বলে যায়, এ মতলব কী কবে ওর মাথায় এল। কীভাবে প্রেসের অন্য লোকদের দলে টানল, ভেবে পাই না। কী কাণ্ড করছে জানো ? এই সংখ্যার রস সাহিত্যের জন্য যে সব লেখা বেছে দিচ্ছি সেগুলি কম্পোজ করছে ঠিকমতো, প্রিন্ট অর্ডার দিলে মেশিনে প্রথম ছাপা ফর্মাও দেখাচ্ছে ঠিকমতো—কিন্তু চল্লিশ-পঞ্চাশ শিটের বেশি ওই ম্যাটারটা আর ছাপছে না। ওটা নামিয়ে মেশিনে অন্য ম্যাটার ছাপিয়ে বাকি শিটগুলি ছাপছে।

মানব তাজ্জব বনে বলে, এ যে রীতিমতো রহস্যময় ব্যাপার !

উমাকান্ত বলে, শুধু রহস্যময় ? সাংঘাতিক ব্যাপার, রোমাঞ্চকব ব্যাপার। বাছাই বাছাই দু-একটা লেখা বেখে ধনদাসের মুণ্ডপাত করা লেখা ছাপিয়ে যাচ্ছে। কে যে ও সব লিখল, কখন যে কম্পোজ করল টেরও পাইনি। এবাবের বস সাহিত্য বাজারে বেরোলে যে কী কাণ্ড হবে—

কী ছাপছে দেখেছেন ?

দেখেছি বইকী ! নমুনাও এনে রাখছি। সেই জন্যই তো বলছিলাম, আমি যে ব্যাপার জানি সেটা ওরা টের পেয়ে গেছে।

একটা নমুনা দেখাবেন ?

চাবিবদ্ধ ড্রয়ার খুলে উমাকান্ত পরের মাসের রস সাহিত্যের প্রথম ফর্মাটা বার করে মানবের হাতে দেয়।

প্রথম পাতায় পাইকা হরফে খালেকের কবিতা—দুর্জনেবে আঘাত হানো।

মানব মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করে কবিতাটা আপনার দেওয়া না ওবা জোগাড় করে এনেছে ?

ওটা আমার দেওয়া। তুমিই তো এনে দিলে আমাকে ?

মানব পাতা ওলটায়। পবের পাতায় ছাপা হয়েছে গল্প—সন্তানের মা ইস্তিরি না কপিরাইট ?

মানব মুখ তুলে বলে, পরে পড়ব—ব্যাপারটা আগে সব শুনেনি। এ গল্পের বিষয় কী ?

আত্তির মা-কে খুন করা। নাম-টাম সব বজায় রেখেছে। হরফ গল্পের কায়দায় নয়—সোজাসুজি ধনদাসের মুণ্ডপাত করা। লেখকের নামও গোপন করেনি—কালাচাঁদ নিজের নাম দিয়েছে।

একবার তাকিয়ে দেখে মানব বলে, তাহলে ষড়যন্ত্র নয়। ফলাফলের জন্য কালাচাঁদ তৈরিই আছে।

উমাকান্ত বলে, শুধু কালাচাঁদ নয়, প্রেসের আরও দু-তিনজন নিজের নামে ধনদাসের কেচ্ছা লিখেছে। এখনও দুফর্মা ছাপা বাকি কিন্তু ধনদাসের কেচ্ছা গাওয়ার রীতিটা বুঝতে পেরেছি। পুতুলের ব্যাপার নিয়ে আরম্ভ হল—ওর বাপ-ঠাকুদ্দার কয়েকটা কীর্তির কথা বলে ধনদাস পনেরো-ষোলোবছর ধরে কত কী কাণ্ড করেছে তার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

মানব অনেকক্ষণ গুম খেয়ে থেকে প্রথম ফর্মাটা আগাগোড়া পড়ে বলে, এটা উচিত হচ্ছে না। কালাচাঁদ বিষম ভুল করছে। একজন মানুষকে ঘা দিয়ে কী লাভ হবে ? ধনদাস লজ্জা পেলেই সব অন্যায় অব্যবস্থা শেষ হয়ে যাবে ?

উমাকান্ত ফুঁসে ওঠে, তুমি যদি এ ব্যাপারে নাক গলাও মানব—

আমি কেন নাক গলাতে যাব ?

হ্যাঁ, নাক গলিও না। তোমার উচিত-অনুচিতের উপদেশ পরে শুনব, পরে বুঝব। আমি যা করতে চেয়ে চাকরিটা নিয়ে করতে পারিনি, কালাচাঁদ তাই করছে। একটা ঘা তো অন্তত দেবে !

মানব জোর গলায় বলে, কথা কইলেই ভয় পান কেন ? কে কোথায় কাকে ঘা দেবাব প্ল্যান কষছে, তার মধ্যে নাক গলানো কি আমার পেশা ? আমি শুধু বলছিলাম এ রকম এলোমোলা ঘা দিয়ে কোনো লাভ হয় না। জগৎটা নিয়মে চলে।

পৈতৃক পুরানো টেবিলটাতে একটা ঘুঁষি মেরে উমাকান্ত বলে, আমরা নিয়মেই ঘা হানছি।

ঘরে ফিরে মানব কালাচাঁদকে বলে, তোমায় একটা কথা বলব বলব ভাবছিলাম—কেবল ভুলে যাই। রস সাহিত্যে তোমার নাম মুদ্রাকর হিসাবে ছাপা হয়, তোমাব দায়িত্ব কী জানো তো ? আপত্তিকর কিছু ছাপা হলে তুমি দায়ি হবে। তেমন মারাত্মক কিছু ছাপা হলে তোমার জেলও হতে পারে !

কালাচাঁদ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকায় কিন্তু নির্বিকার কণ্ঠেই বলে, নিজের দায়িত্ব জানি বইকী !

জানা থাকলেও এ দিকটা যে তার একেবারেই খেয়াল ছিল না কাগজ দেখে খেপে গিয়ে ধনদাস তাকে এবং আরও কয়েকজনকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে এইটুকুই সে যে শুধু ভেবেছিল, পরদিনই তার প্রমাণ পাওযা যায়।

আত্তি এসে জানায় দুদিন পরেই পদ্মর সঙ্গে কালাচাঁদের বিয়ে হবে। সব ঠিক হযে গেছে।

এ মাসের রস সাহিত্য বার হবে দু-তিনদিনের মধ্যে—বিয়েটা চুকিয়ে দিতে আব দেরি কবা উচিত নয়। পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে কালাচাঁদকে যদি তাবা জেলে ঠেকে দেয় কয়েক মাসের জন্য, একেবারে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।

বিয়ে হবেই জেনে সবাই চুপ করে আছে, বিয়ের দু-চারমাসের মধ্যে বাচ্চা বিয়োক পদ্ম, স্বামীর সন্তানই বিয়োবে। কিন্তু কোনো কারণে বিয়ের অনুষ্ঠানটা ছাড়াই যদি পদ্মকে মা হতে হয়—সবাই ছিছি করবে।

পদ্মকেও করবে, কালাচাঁদকেও করবে।

এতদিন গড়িমসি করে এসে হঠাৎ বিয়েটা সেরে ফেলার জন্য কালাচাঁদের ব্যগ্রতা দেখে সকলেই আশ্চর্য হয়ে যায়।

আত্তি মানবকে বলে, বাবার মাথা বেঠিক হয়ে গেছে। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ লাফিয়ে উঠল—লাগাও পরশু দিন বিয়ে !

মানব হেসে বলে, মাথা বেঠিক হয়নি, কারণ আছে। কালাচাঁদ একটা মানুষকে খুন করবে। খুন করলে ফাঁসি না হোক জেল হবে তো ? বিয়েটা তাই সেরে ফেলছে।

তামাশা কোরো না, মানুবাবু। সত্যি বলো না কারণটা কী ?

বলিস না কাউকে—প্রেসে বোধ হয় হাঙ্গামা হবে।

আত্তির মুখ ছোটো হয়ে যায়।—তবেই সেরেছে ! বাবা যা একগুঁয়ে রাগী মানুষ !

মানব বলে, ডরাস কেন এত ? পুবুষ মানুষ লড়াই-টড়াই করবে না একটু ? শুধু সয়েই যাবে ?

আত্তি ঝংকার দিয়ে বলে, আহা, লড়াই যেন পুরুষ মানুষের একচেটিয়া কাববার, মোরা যেন লড়তে জানি না। সে কথা বলছি নাকি ? বলছি যে বাবার বড়ো মাথা গরম, বড্ড বেশি গোঁ—কী করতে কী করে বসে !

মানব বলে, তুই ভুল বুঝেছিস নিজের বাপকে। কালাচাঁদ খুব হিসেবি লোক, ওর অনেক ধৈর্য।

বিনা সমারোহে বিয়ে হয়ে গেল কালাচাঁদের

বিনা নিমন্ত্রণে অযাচিতভাবে এসে গাঁটের পয়সা খরচ করে বস্তির জন ত্রিশেক মেয়ে-পুরুষ আর কালাচাঁদের অধিকাংশ সহকর্মীরা অবশ্য হইচই করে যায় অনেক, কিন্তু সেটাকে কি আর বিয়ের সমারোহ বলা যায় ?

মানব পদ্মকে দিল একটা অভিনব উপহার—নন্তু গোয়ালার টিপসই দেওয়া কয়েকখানা স্লিপ।

বিয়েতে কাগজের টুকরো উপহার ? সবাই বলে, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন মানুবাবু ?

মানব বলে, ব্যাপার খুব সোজা। নন্তু গোয়ালা ছ-মাস আধপো করে দুধ দেবে—হিসেব করে টাকা জমা দিয়ে দিয়েছি। আত্তিকে বলে দিয়েছি, দুধটুকু যাতে সমস্তটা সৎমার পেটে যায় সে দিকে নজর রাখবে।

একজন বলে, আগেই গয়লাকে ছ-মাসের টাকা বুঝিয়ে দিয়েছ ? দুধ দেবে না পাউডার গোলা ফিকে জল দেবে ঠিক নেই—দুদিন দিয়ে হয়তো তাও বন্ধ করে দেবে।

মানব হেসে বলে, আমার পয়সা হজম করতে পারবে ? গয়লাকে বোঝাবারও কায়দা আছে। মানুষকে অত হাবা ভাবতে নেই। নন্তু কি জানে না আধপো দুধে জল আর পাউডার মিশিয়ে কত লাভ করা যায় ? ওইটুকু লাভের জন্য সবার কাছে হীন হবার ঝুঁকি নেবে, ও কি এতই বেহিসেবি বোকা ? আর কেউ না পাক, পদ্ম ঠিক খাঁটি দুধ পাবে।

প্রুফ রিডার ভুবনও এসেছিল। খানিকক্ষণ মনে মনে হিসাব কষে সে প্রায় লাফিয়ে উঠে বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলে, এ যে প্রায় অ্যারিস্টোক্রেটিক উপহার হল ! আমি ভেবেছিলাম, রোজ আধ পো দুধে কী হয় ? তার চেয়ে একটা ছ-সাতটাকা দামের শাড়ি দিলে বেশ মানাত ! রোজ আধ পো দুধের ছ-মাসের দাম হিসেব করতে গিয়ে দেখি, ও বাবা, এ তো ছ-সাতটাকার ব্যাপার নয়। আধপো দুধের দাম দুআনা। তিরিশ দিনে মাস ধরলে ষাট আনা—ছ-মাসে মোটমাট সাড়ে বাইশ টাকা।

মানব বলে, নন্তুকে সাড়ে বাইশ টাকা নয়, বিশ টাকা দিয়েছি। সোজাসুজি বললাম যে ধার দিলে টাকায় মাসে মাসে দুপয়সা সুদ কষতে হয়—ছ-মাসের দাম আগাম দিলে কিছু ছাড় পাব না ? নন্তু কী বলেছিল জানো ? আপনি তো আসল হিসেব বড়োই বোঝেন বাবু—একটা কারবার দিলে তো রাজা হয়ে যেতেন !

বস্তিবাসী উদ্‌বাস্তু বাঙাল মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে, আপনে জবাবে কী কইলেন ?

মানব জবাব দেয়, আমি কইলাম, রা. গো যখন মরণ দশা, রাজা হইয়া করুম কী ?

তার খাঁটি বাঙাল উচ্চারণে কথা বলায় সবাই আশ্চর্য হয়ে হেসে ওঠে।

রস সাহিত্যের এই সংখ্যাটি বাজারে আত্মপ্রকাশ করার পরেও সাত সাত রাত্রি কালাচাঁদ পদ্মকে নিয়ে ঘর করার সুযোগ পায়।

ছাপা বাঁধাই শেষ হওয়ামাত্র রস সাহিত্যের যে কপিটা ধনদাসকে দেওয়া হয় দুদিন পরে শুধু পাতা উলটিয়ে চোখ বুলিয়ে দেখে সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল--সব ঠিক আছে।

উমাকান্ত সত্যিই পাল্লা দিতে কোমর বেঁধেছে হরফের সঙ্গে।

প্রচ্ছদপটটা কী সুন্দর করেছে এবার উমাকান্ত ! কতজন নামকরা লেখকের লেখা এবার ছাপিয়েছে। তার রস সাহিত্যের সঙ্গে পাল্লা দেবে হরফ—ইস !

আত্মীয়বন্ধু বা কেউ কেউ এসে জানতে চায় এবারের রস সাহিত্য এ রকম করলেন কেন ?

হরফ পত্রিকা ঘাঁটতে ঘাঁটতে, কালাচাঁদের তিন নম্বর গল্প পড়তে পড়তে ধনদাস মৃদুস্বরে বলে, রস সাহিত্য পছন্দ না হয়, অন্য মাসিক কিনে পড়ুন। হরফ কিনে পড়ুন।

ধনদাসের বুড়ো বাপ হরকান্ত বছর দশেক সংসার নিয়ে মাথা ঘামানো প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। এক সাধুর আশ্রমেই দিন কাটায়, দু-একমাস অন্তর দু-একদিনের জন্য সে শুধু হালচালটা বুঝে যায়, শুধু জেনে যায় মোটামুটি সব ঠিক আছে কি না।

বাড়ির বাঁধা ডাক্তারের মাঝে মাঝে এসে জন্ম-রোগীর নাড়ি পরীক্ষা করে যাওয়ার মতো !

কাঁপতে কাঁপতে হরকান্ত প্রেসে এসে ধনদাসের টেবিলের সামনে দাঁড়ায়। এমনিতেই দেহ আজকাল কাঁপে, এখন কিন্তু সর্বাঙ্গ তার কাঁপছে রাগে।

হ্যাঁ রে, এ তোর কী মতিগতি হয়েছে ? নিজেকে ডাকাত গুন্ডা নচ্ছার বলে ঘোষণা করে, বাপ-পিতেমোর কেচ্ছা রটিয়ে তুই উঠতে চাস ? তোর মতলবটা কী ?

ধনদাস উঠে দাঁড়িয়েছিল, সে ধীর কণ্ঠেই বলে, হরফের কথা বলছ তো ? শত্রুতা করছে। আমিও দেখিয়ে দেব, শোধ নেব।

হরকান্তের রাগ আরও চড়ে যায়।—হরফ কী, হরফ ? নিজের কাগজে নিজেকে গাল দিয়ে, বাপঠাকুর্দার জোয়ান বয়সের কেচ্ছা লিখে এ কী কাণ্ড শুরু করেছিস ? তুই উচ্ছন্ন যাবি, তিলে তিলে জ্বলে জ্বলে, পুড়ে পুড়ে, তুই মরবি !

হরকান্ত হাতে করেই এনেছিল রস সাহিত্যের দুমড়ানো মুচড়ানো বর্তমান সংখ্যাটা, ধনদাসের মুখের উপর সেটা ছুঁড়ে দিয়ে সে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে যায়।

হতভম্ব ধনদাস কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে আনমনে পাতা ওলটাতে ওলটাতেই হঠাৎ খেয়াল করে যে এ তো তার রস সাহিত্য কাগজ নয় !

এক ঘণ্টা পরে উমাকান্তকে ডেকে সে বলে, কাগজটার এ মাসের ফাইল কপিটা আমায় একটু দিন তো উমাবাবু ?

আরও এক ঘণ্টা পরে সে প্রেস থেকে বেরিয়ে মোড়ে মাধবের বুকস্টলটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তিন কপি রস সাহিত্য অবশিষ্ট ছিল। একখানা তুলে নিয়ে সে পাতা ওলটায়।

মাধব বলে, আপনার এ মাসের কাগজ নিয়ে হইচই পড়ে গেছে। দশ কপি পড়তে পেল না। বারোটা নাগাদ আরও পঁচিশ কপি আনলাম—মোটে তিনখানা বাকি আছে। আমাকে আরও পঁচিশ কপি দিতে হবে কিন্তু !

ধনদাস নীরবে তার রস সাহিত্যের পাতা উলটে যায়।

শেষরাত্রে মারতে মারতে ধরে নিয়ে যায় কালাচাঁদকে।

টাইপ চুরি করা থেকে আপত্তিকর গোপন ইস্তাহার ছাপিয়ে পয়সা রোজগার ইত্যাদি কয়েক দফা অপরাধে।

বস্তি আর ঘুমায় না। উত্তেজনা ঝিমিয়ে আসতে আসতে ভোর হয়ে যায়। কাজের মানুষ যায় কাজে, বেকার মানুষ যায় কাজের খোঁজে, ঘরের মানুষ লেগে যায় ঘরের কাজে।

মানব ঠায় বসেছিল কালাচাঁদের দাওয়ায়। মাথা হেঁট করে বসে মৃদু এবং মিহি সুরে পদ্ম একটানা কেঁদে চলেছিল। খুঁটিতে ঠেস দিয়ে আত্তি বসেছিল চুপচাপ।

ঘরের চালে সোনালি রোদ এসে পড়েছে খেয়াল করে মানব যেন চেতনা ফিরে পায়। পদ্মকে বলে, কাঁদছ কেন ? প্রাণের জ্বালা জুড়োতে গেছে, ফিরে তো আসবে মানুষটা ! কেঁদো না।

আত্তিকে বলে, আমি বলি কী আত্তি, মিছিমিছি কেন ঘরেব ভাড়া গুনবি ? দুজায়গায় দুবার করে রাঁধবি ? আমার ওখানেই তোর আর সৎমা-টার খ্যাঁট একসঙ্গেই রেঁধে নিস। বড়ো একটা ভাতের হাঁড়ি কিনতে হবে, না ?

আত্তি বলে, আহা, তিনটে পেটের জন্য বড়ো ভাতের হাঁড়ি ! নিজে তো খাও একমুঠো ভাত।

মানব বলে, বড়ো একটা খাটিয়া কিন্তু আনতে হবে, নইলে মেঝেতে বিছানা পাততে হবে। ওইটুকু খাটিয়ায় দুজনে শোয়া যায় না। কুঞ্জর মা-কে জানিয়ো পদ্ম, এমনি ঘরে থাকবে না, ভাড়ার একটা ভাগও তুমি দেবে। কালাচাঁদের মালপত্রও কিছু থাকবে তো ওখানে !

আত্তি প্রশ্ন করে, একেবারে ছেড়ে দেবে ঘরটা ? বাবা ফিরে এলে তখন ?

পদ্মর কান্না থেমেছিল। এবারে সে মুখ খোলে।—ঘর বুঝি আর মিলবে না ?

মানব হেসে আত্তিকে বলে, ঘর না মেলে, আমাদেব ঘরটা ছেড়ে দেব। তুই আর আমি একটু বেড়িয়ে আসব এদিক-ওদিক—কতকাল বেবোইনি, মন কেমন করছে।

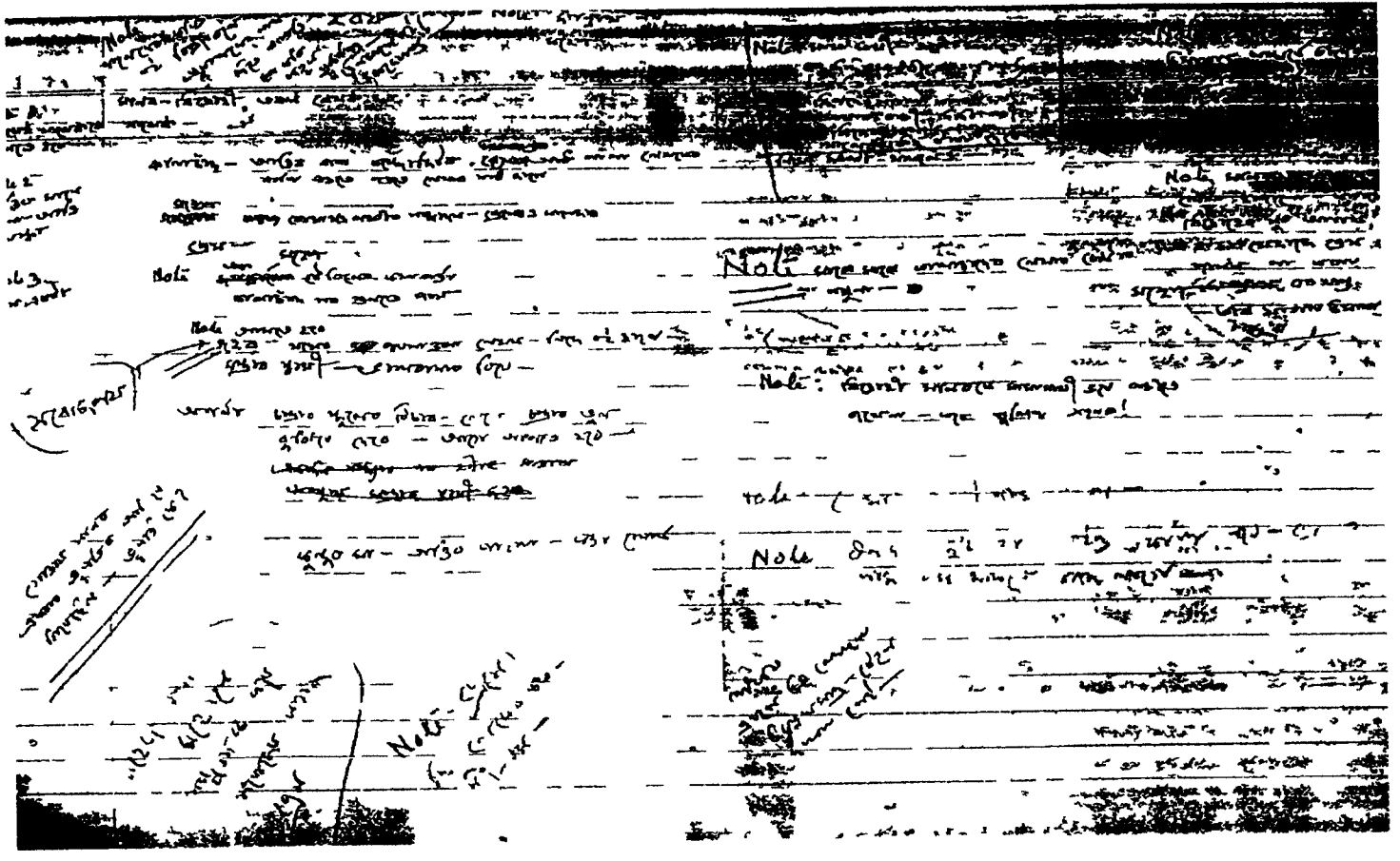

হুবহু উপন্যাসের খসড়া